আনন্দ বাগচী

আর্ট ইউনিয়ন

প্রথম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৬৪

প্রকাশক :
আর্ট ইউনিয়ন
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থ ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ, বাঁধাই :
আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক :
রিপ্রোডাকসন সিনডিকেট

পরিবেশক :
দি কাল্‌চার

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

'চকখড়ি' রচনার সূত্রপাত দীর্ঘ তিন বছর আগে।

দৈনন্দিন আঁচড় কাটতে কাটতে একদিন মনে হল, থাক, আর না। সব কিছু জীবনে যা ঘটে, যা দেখা দেয়, যা ভালো লাগে, সেই 'আমার ভালো লাগা' টুকু উপন্যাসের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে তখনই, ব্যক্তি থেকে জিনিসটা যখন নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তীর্ণ হয়,—তা আমি জানি। কিন্তু অনেক কিছু বলতে পারার, এবং হুবহু বলতে পারার লোভ সংবরণ করা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য ব্যাপার, চেষ্টা করলেও কতটুকু যে পেরেছি বলা সহজ নয়, বিশেষ করে লেখকের পক্ষে।

এটি আমার প্রথম উপন্যাস এবং প্রথম বয়সের উপন্যাস। সুতরাং এর পরিকল্পনায়, এর গাঁথুনিতে হয়ত কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, কিন্তু উপন্যাসের কথা আর গাঁথুনির পিছনে যে আর একটি বস্তু আছে, সেটি যদি পাঠককে মুগ্ধ করে তাহলে আমার ক্ষোভের কিছু থাকবে না।

এই জাতীয় একনায়কতন্ত্রের উপন্যাসে উপকাহিনী-শাখাকাহিনীর বিন্যাস সম্ভব হয় না, বলতে গেলে সব মিলে একটিই কাহিনী মোটা রেখায় এগিয়ে চলে। তার রাস্তাটা একমুখী, ইচ্ছে মত কলমটাকে ঘোরাবার উপায় নেই। তাই শুরু এবং শেষের মধ্যে হয়ত কোন মসৃণ সামঞ্জস্য রাখা হয়নি, বরং রুক্ষ, অসমান, অসমতল প্রতিবিন্যাসের দ্বারা একটি যৌগিক একাগ্রতাকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র কাহিনীর ফলশ্রুতিতে গিয়ে তবেই সেটি বোঝা যাবে।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৪। —আনন্দ বাগচী

লেখকের অন্য বই

স্বগত সন্ধ্যা

কাগজের ফুল

মা-কে

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের ঘটনাকাল কাল্পনিক
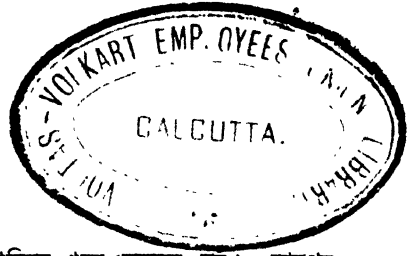
শিয়রের জানালাটা শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে খুলে ফেললো হর্ষ। তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে ঠাণ্ডা গরাদের ওপর মুখখানা বাড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা শীতল বিদ্যুৎ যেন মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটি আশ্চর্য ঝংকার তুলে ছুটে গেল। আর অমনি আরেক শীতভোরের কথা মনে পড়লো হর্ষর। এমনি আকাশে কুয়াশা ছিল সেদিন। গাছের পাতা থেকে, টিনের চাল থেকে মাটিতে নীহার পড়ছিল বড়ো বড়ো ফোঁটায়। আমের বোলের গন্ধে একটি কোকিল সহসা ডেকে উঠলো ঘনপাতার আড়ালে। দুটো শালিক উড়ে গেল উঠোন থেকে।

সারাটা বাড়ি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। চোখ-মোছা ভোরে ধড়মড়িয়ে ওঠে যে পারুলপিসী, সেও সেদিন লেপের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে অচেতন। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে যে নিকেল-রঙ আলোর রেখাটা পিসীর খোঁপা-ভাঙা বালিশের বুকে এসে বিঁধেছে, তারই ম্লান আভায় পারুলপিসীর ঘুমন্ত মুখখানা দেখতে পেল। ফোলা ফোলা চোখ, পাতলা হাসিতে ফাঁক করা ঠোঁট দুখানা। ঘুমোলে মানুষের চেহারা কেমন যেন একটু পাল্টে যায়।

আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে অনিচ্ছা ছিল না হর্ষর। কিন্তু পিসীর নরম নিশ্বাস পাখির পালকের মত সুড়সুড়ি দিচ্ছিল ওর নাকে-মুখে। তাড়াতাড়ি পিসীর শিথিল হাতের তলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে খাট থেকে নেমে পড়লো।

ভিতর উঠোনে গোবর জলের ছড়া দেওয়ার শব্দ কানে এলো। মা উঠেছেন। ভোর রাত আর মা একসঙ্গে বিছানা ছাড়েন। ঘড়ির কাঁটার নড়চড় হতে পারে, মার হবে না। তারপর সারাদিনের চরকায় কাপাসতুলোর মত মার ঘোরার বিরাম নেই। দশের সংসারে দশের ইচ্ছা একপাকে মিলিয়ে দিতে হবে, তবেই লোকে বলবে মিহি সুতো। ঘরে বাইরে লক্ষ্মী বৌ অত সহজে বলে না। শীত, সখ আর সুখ, এই তিনকে একবস্ত্রে অস্বীকার করতে হয়েছে পাঁচ বছর বয়স থেকে। পরানের মেজাজই আলাদা, তা একাল আর সেকাল। ছোট-বেলায় বাপ মাকে হারালে অনেক কিছুই হারাতে হয়। মার মুখেই সব শুনেছে হর্ষ, একদিনে নয়, একটু একটু করে।

মাকে কেমন করুণ আর আবছা মনে হয় হর্ষর। ছাপা অক্ষরের বোবা চাউনির মত। পৌষ শেষের কুয়াশার মত, আমের বোল ফোটার বেদনা ও

সুরভি দুই-ই রয়েছে তার মধ্যে ছড়ানো। কত সুখ দুঃখের আঁকাবাঁকা গলি পথ বেয়ে যে চৌমাথাটায় মা এসে পৌঁছেছেন, সারারাত্রির গল্পের মত সেখানে শুরুও নেই, শেষও নেই।

কত ভয়, কত হতাশা, কত অপমান পথের দুপাশে ভিড় করে এসেছে, মার মনে হয়েছে দম বন্ধ মৃত্যু ছাড়া আর বুঝি পথ নেই। কোনদিন বুঝি আর উদ্ধার নেই, অন্ধকারের শেষ বোধ হয় অন্ধকারেই। কিন্তু না, আবার পথ মিলেছে। যাত্রার দিক বদল হয়েছে, ফিকে হয়ে এসেছে গাঢ় অন্ধকার। আলোও দেখা দিয়েছে অবশেষে। সময়ের অনেক যোজন পথ পিছনে ফেলে রেখে, ফেলে রেখে চোখের জলে ভেজা মাটি।

নিঃস্বপু শশুরবাড়ির একখানা খোড়ো ঘর মাত্র সম্বল করে মার নিরুদ্দেশ-যাত্রা সুরু হয়েছিল। অনেক অভাব অনেক অনটনের হিসেব মেলাতে মেলাতে দিন চলে গেছে। তারপর সংসারের হাল বদল হয়েছে, হবফ বদলেছে, কিন্তু মা তাতে বদলেছেন কতটুকু! পনের বছরের যে রাঙাটুকটুকে বউটি দুরুদুরু বুকে পাল্কী থেকে নেমেছিলেন এবাড়ির উঠোনে, তাঁর সেদিনের মনটা অনেক আঘাতে হয়ত শক্ত হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে আর মুগ্ধতা নেই, রূপের ভাঁড়ার শূন্য হয়েছে অনিবার্যভাবে, আরো অনেক বাঙালী বধূর মত। ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না টুকু তবু অতীতের সাক্ষ্য দেয়। ঢেঁকিঘরে আর চুলোর ধোঁয়ায় যে অবিলাসী যৌবনের রীতিমত অপব্যয় হয়েছে তার ছায়াটা এখনো শরীরে জড়ানো।

হর্ষর কেবলি মনে হয়, আজ সংসারের এই সুখের পাতায়ও মা তেমনিই জলছবি হয়ে রয়েছেন, হাতে আঁকা নয়, বাইরে থেকে কেটে এনে লাগানো। কেউ বোঝেনি মাকে, মা সত্যি করে কি, কেউ তা বুঝতে চায়নি কোন দিন। বাবাও বোধ হয় না।

খাট থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি জুতো মোজা পরে নিল হর্ষ। পারুল পিসী টের পেলনা, জানতে পারলো না পাশের খাটের মন্দিরা। গরম জামার ওপর আলোয়ানটা জড়াতে জড়াতে দরজা খুলে সদর বারন্দায় এসে দাঁড়ালো। কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে আকাশ, মাঠ, গাছ। চাল থেকে টপ্‌টপ্ করে কুয়াশা জল হয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে। দুটি ঘুঘু ধান খুঁটে খাচ্ছে ভিজে ভিজে ধুলোর ভিতর থেকে। ওদিকে ছোটঠাকুর্দার রাত জাগা চটির আওয়াজ কখন ভোরের আলোয় মরে গেছে উঠোনের কোণে। প্রাতঃস্নান শেষ করে এখন তিনি কুশাসনে বসে জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ শুরু করেছেন অনুচ্চ কণ্ঠে। অস্পষ্ট মন্ত্রের মত উঠোনের অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসছে তার অস্ফুট ছন্দ।

কোঁচার কাপড়ে নাকমুখ জড়িয়ে ভুঁইমালী এলো উঠোন ঝাঁড় দিতে। পাছদুয়োরের ছড়াঝাঁট শেষ করে মা এতক্ষণে পুজোর বাসনকোসন নিয়ে বসেছেন

কুয়োতলায়। রান্নাঘরের পিছনের অতিকায় তেঁতুল গাছটার সিঁথি-চূড়ায় পব আকাশের সিঁদুরে আলো সব প্রথম পিছলে পড়লো একটুখানি। ঘুঘুর ডাক উঠলো আকাশে কেঁপে কেঁপে।

কুয়াশার ঘোর কেটে গেছে। হর্ষ বারবাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘোষেদের পুকুর পার হয়ে রোদ এখানে সকলের আগে পৌঁছায়, বাঁদিকে পশ্চিমের বিলটাও নজরে পড়ে নির্জলা মাঠের মত। এত বড়ো আর দিগন্ত বিস্তৃত যে, তেপান্তরের মাঠের কথাই মনে হয় উপমা দিতে গিয়ে।

রোদ অবশ্য তখনও পৌঁছায় নি ভালো করে। ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল হর্ষ, কলকাতায় এই শীতের অনুমান পর্যন্ত পৌঁছায় না। নাকের ডগাটা মনে হয় টিকটিকির লেজের মত টুক করে খসে পড়ে যাবে। হাতের আঙুল গুলো পকেটের মধ্যে প্রায় মরে রয়েছে। করতাল বাজছে দাঁতে দাঁতে।

পায়ে পায়ে মাঠের পথে অনেকটা এগিয়ে আসতে খেয়াল হল হর্ষর। কখন যে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে লক্ষ্য করেনি। একেবারে জটিবুড়ীর কুল গাছটার কাছে এসে সম্বিত হল। রাত্রে এই জায়গাটা ভয়ের। একটু দূরে জটিবুড়ীর কুঁড়ে ঘরখানা গাছপালায় প্রায় ঢাকা। জটিবুড়ীর আসল নাম ডাকের মা। বড় বড় জট, বিড় বিড় করে সব সময় কি সব বকে। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে শুকনো আমের খোসার মত, জট সাদা। বয়স কত কেউ জানে না। আগে আগে দিনের আলোতেও বুড়ীকে দেখলে ভয় করতো। আজকাল করেনা। তবে মাঝরাতে যখন ঐ তেল-সিঁদুর দেওয়া কড়িগাছটার তলায় বসে কান্নার সুরে মন্ত্র ছোঁড়ে আকাশে, তখন অন্ধকার বিছানায় লেপের নিচেও বুকটা হিম হয়ে যেতে বাকি থাকে না। মন্ত্র পড়ে কড়িগাছের তলাকার আসনে ভূত প্রেত নামায় জটিবুড়ী, কি বিকট তার মন্ত্র। গাজনাব বিলের ওপর দিয়ে তার প্রতিধ্বনি ভেসে যায় দূরে বহুদূরে। হঠাৎ ডেকে ওঠা শেয়ালগুলো পর্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় তা শুনে। হর্ষ পিসীকে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে।

ঠিক কুলতলায় দাঁড়ালো না, গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে। রোদ পোহাতে আর কুল কুড়োতে। সকলেই প্রায় গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে। শীতের তাড়নায় ঘরের বার হয়েছে, গায়ে প্রায় সকলেরই একটা করে আধময়লা চাদর বা ছেঁড়া শাড়ি।

আকাশের সমস্ত রোদ যেন ঢেলে পড়েছে কুলতলায়। রঙ বে-রঙের পাখির ঝটাপটিতে আর উত্তুরে হাওয়ায় টুপটাপ করে পাকা কুল ঝরে পড়ছে গাছ তলায়। সবাই মহা উৎসাহে কুড়োচ্ছে আর নুন-লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে খাচ্ছে।

হর্ষর লোভ হল, কিন্তু মার বারণ, সরস্বতী পূজোর আগে কুল খেতে নেই। খেলে বিদ্যে হয় না। হর্ষর খুব বিদ্যে হবে? কে জানে হতেও তো পারে। ছোট

বেলায়, অনেক ছোটবেলায় তার নাকি ভীষণ স্মরণ শক্তি ছিল। পড়াশুনায় এত এগিয়ে গিয়েছিল যে বাড়ির সকলে আনন্দে আটখানা, শুধু বাবা ছাড়া। সকলেরই ধারণা, এছেলে চোদ্দবছরে ম্যাট্রিক পাশ না করে যায় না।

বয়সের হিসাবে উঁচু ক্লাশেই ভর্তি হয়েছিল সে, কিন্তু ছ-মাস না যেতেই ছুটির দরখাস্ত পড়লো। পিসীর বিয়ে, দেশের বাড়িতে তাদের যেতে হবে। পিসীকে, পারুলপিসীকে সেই প্রথম দেখবে হর্ষ। এর আগে কখনো দেখেনি তাকে, দেখলেও মনে নেই ছোট বেলার কথা। এক মাসের জন্য দেশে এসেছিল হর্ষরা, কিন্তু একবছর পার হয়ে গেল, কলকাতা ফেরা আর হল না। পারুল পিসীর প্রথম সম্বন্ধ ভেঙে গেল কি কারণে, আর তাই মা কাকারা উঠে পড়ে লাগলেন পিসীর বিয়ের জন্য। বিয়ে না দিয়ে কলকাতায় ফেরা চলতে পারে না। অভিভাবক বলতে তো তাঁরাই। পিসীর মা মারা গেছেন কবে। তার বাবা মানে ছোটঠাকুর্দা, তিনি উদাসীন গোছের মানুষ, পূজোআচ্ছা আর পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটান। মেয়ে আছে, থাকলো, অমনি তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে এই বা কেমনতর কথা। তাছাড়া আঠার বছর বয়স যে পার হয়নি সে তো ছেলেমানুষ।

কিন্তু ছোটঠাকুর্দার ধারণা নিয়ে তো গাঁয়ের সমাজ চলে না। মা কাকারা তাই নিশ্চিন্ত থাকলেন না। বিশেষ করে মণিকাকা, পারুলপিসীর দাদা।

পিসীর বিয়ে অবশ্য বছরখানেক পরেই হয়ে গেল। মা কলকাতায় ফিরবো ফিরবো করছেন এমন সময় হর্ষ অসুখে পড়লো। ঘোর টাইফয়েড। মাসখানেক একটানা বিছানায়। যখনই সজ্ঞানে চোখ মেলেছে, মা কিংবা মণি কাকা একজনকে দেখেছে মাথার কাছে বসে। কখনো জল ঢালছেন, কখনো পাখা করছেন। সেই অন্ধকার, গুমোট, দুর্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনো মাথা ঘোরে হর্ষর। আর সেই থেকে মাথায় যে কি হল তার!

হর্ষর স্মরণশক্তি ভোঁতা করে রেখে চলে গেল গেঁয়ার অসুখটা। তাতেই বাড়ির সকলে খুশী, মা জনকেশ্বরীর কাছে জোড়া পাঁঠা বলি পড়লো। কিন্তু পড়াশুনো হর্ষর অসহ্য হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে। কিছু মনে থাকে না, কিছু মুখস্থ হয় না। দিনের মধ্যে একটা কথা কতবার যে ভুল হয় তার ইয়ত্তা নেই। কোন একটা জিনিস হয়তো খুঁজতে এসেছে ঘরে কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে একসময় বেমালুম ভুলে গিয়েছে আসলে সে কি খুঁজছে। নয়ত চোখের সামনে পাঁচবার জিনিসটা দেখে গেল, হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে গেল অথচ চিনতে পারলো না যে এটিই সে খুঁজছে। এমন মাঝে মাঝেই হয়।

তারপর কলকাতায় ফিরে গেল। ভর্তি হল পুরনো ক্লাশে। কিন্তু বেশি দিন না। যুদ্ধ বাধলো। বোমার ভয়ে পালিয়ে এল আবার দেশের বাড়িতে।

বাবা আর ছোটকাকা শুধু থাকলেন কলকাতায়। কিছুদিন পরে বাবা একা। ছোটকাকা সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় চলে গেলেন, কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ঠিকানা ছাড়া একখানা চিঠি শুধু পাওয়া গিয়েছিল ছোটকাকার। ব্যস।

কান্না পেত ছোটকাকার জন্য। কেঁদে ফেলতো, যখন মাকে কাঁদতে দেখতো। ছোটকাকাকে প্রায় কোলে করে মানুষ করেছিলেন মা। ছোট ভাইয়ের মত।

যুদ্ধ, কলকাতা আর ছোটকাকার কথা মনে পড়তেই আর একজনের কথা বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। তিনি বাবা। কেমন একটা মন-খারাপ মন-খারাপ ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো অমনি। বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্মব্যথা চিনচিন করতে লাগলো.যেই মনে হলো বাবা কলকাতায় একা আছেন। তাদের সেই প্রকাণ্ড বাড়িটায় একা। অন্ধকার ঘরগুলো রাত্তিরে ভূতের মত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বাবার ভয় করে নিশ্চয়ই। কিন্তু হর্ষ নেই, মন্দিরা নেই, বাবার নিশ্চয়ই মন কেমন করে সারাদিন। নিশ্চয়ই একা একা খুব খারাপ লাগে, কান্না পায়। রাতদিন কার সঙ্গে কথা বলবেন? গল্প শোনাবেন কাদের? হর্ষ নেই, মন্দিরা নেই।

তাদের দুজনকে বাবা কত ভালবাসতেন। রেলের চাকরি। দুদিন বাড়িতে, দুদিন বাইরে। বাইরের দুদিন আর কাটতে চাইত না বাবার। কতবার নিজেই বলেছেন সেকথা।

কিন্তু সবচেয়ে ভালবাসতেন বাবা মন্দিরাকে। একমুঠো জ্যোৎস্নার মত ছিপছিপে মন্দিরা সব সময় বাবার গায়ে গায়ে ছায়ার মত লেগে থাকতো। বাবা মন্দিরার নাম রেখেছিলেন বামী।

প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তাবে, "কী হয়েছে বামী।"
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

রবিঠাকুরের এই কবিতাটা বাবার খুবই প্রিয় ছিল, পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলতেন বাবা। ঠিক কান্না নয়, চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়তো। দমবন্ধ হাসি হাসতে হাসতে চশমা আর চোখ মুছতেন। একটু করুণ কবিতা হলেই বাবার অমনি হতো আর মন্দিরা চিৎকার করে উঠতো, বাবা, তুমি আর পড়ো না।

অদ্ভুত খেয়ালী ছিলেন বাবা, এখন সে খেয়াল কি করে মেটাচ্ছেন? এক-দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে হর্ষর। সিগারেট ধরিয়ে বাবার কি খেয়াল হল। মন্দিরাকে বললেন, খাবি?

মন্দিরা ত তৎক্ষণাৎ হুঁ। বাবার প্রত্যেক কথাতেই সে নেচে উঠবে খঞ্জন পাখির মত।

বললো, দাও না খেয়ে দেবো।

বাবা সত্যি সত্যি সিগারেট সুদ্ধু হাতখানা মন্দিরার গোলাপী ঠোঁট দুখানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সিগারেট টানলে যে ধোঁয়া বেরোয় সে রহস্য ও তখনো ভেদ করেনি। ধোঁয়ার সঙ্গে ফুঁয়ের একটা সম্পর্ক আছে বটে। মাকে তো স্পষ্টই দেখেছে, যেই উনুনে ফুঁ দেন অমনি গবগবিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। মন্দিরা দুগাল ফুলিয়ে ফুঁ দেয় সিগারেটে।

হর্ষ হি হি করে হেসে উঠেছিল অমনি, হাততালিও দিয়েছিল বোধ করি। বাবা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে মন্দিরাকে কায়দা শেখাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মা এসে পড়লেন। বাবা চোখের পলকে সামনের নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে পা দোলাতে লাগলেন একমনে। কিন্তু মা দেখে ফেলেছিলেন আগেই। তাই আবার হুলস্থূল বাধলো।

এমন বেধেছে কত কত দিন। ছেলেমেয়েকে নিয়ে এইভাবে লোফালুফি খেলাটা মা দুচক্ষে দেখতে পারেন না। ছোটদের শাসনে রাখতে হয়। নইলে মানবে কেন। পাড়ার দ্বিতীয় কোন লোকটা তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, মা জানতে চান। বাবা চুপ করে থাকেন।

তা বন্ধুত্ব বৈকি। মা একটুও বাড়িয়ে বলেননি কথাটা। হর্ষ ভেবে দেখলো। মা ভুরু কোঁচকালে, তাঁর কঠিন-হওয়া মুখখানার দিকে তাকাতে তাদের ভয় করে বৈকি। কিন্তু বাবার বেলায়? বাবা ভুরু কোঁচকাবেনই না। একটা সত্যিকারের ধমক পর্যন্ত না, গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাক। অথচ মা প্রয়োজন হলেই পাখার উলটো দিকটা অনায়াসে ব্যবহার করে থাকেন।

এই যে বাবাকে 'তুমি' বলা, এটাও বাবারই প্ররোচনা। ছেলেমেয়ে তাদের বাবাকে 'আপনি' ডাকবে, এতটা দূরত্বে থাকতে বাবা রাজী নন। মা প্রবল আপত্তি করেছিলেন আগে আগে, হর্ষ প্রথম প্রথম তাই মায়ের সামনে বাবাকে আপনি বলতো, আর মন্দিরা অমনি হেসে উঠতো খিল খিল করে।

হর্ষর ওপর তখন পাঠ্য কেতাবের জুলুম জারি হয়ে গেছে। সকালে সন্ধ্যায় ঘড়ি ধরে অনেকটা সময় পড়াশুনা করার নির্দেশ আছে মার। মার নিজের পড়াশুনা পাঠশালার বেশি এগোয় নি তাই ছেলের প্রতি বেশিমাত্রায় সজাগ। হর্ষ অবশ্য রুটিন পালন করে চলে, তবে যে দুদিন বাবা বাড়িতে থাকেন সেই দুদিনই যা গোলমাল।

বাবা বাড়িতে থাকলে রাতগুলো অবশ্যই আলোর মুখ দেখে না। শোবার ঘরের অন্ধকারে ঢালা বিছানায় গল্পের পটভূমি তৈরি হয়। এই ঘরে তখন তিনটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই, মা থাকেন রান্নাঘরের কাজে।

জানালা খোলা। বাইরে কালির মত অন্ধকার। নারকেল গাছটার মাথা হঠাৎ হাওয়ায় শিউরে ওঠে মধ্যে মধ্যে। তার শিরশিরানি হর্ষর রক্তের মধ্যে মিশে গেছে কত রাত্রে।

সিনবাদ নাবিক তখন সেই অজানা দ্বীপে গাছের মাথায় চড়ে রুদ্ধশ্বাস। সেই সামুদ্রিক রাত্রির রোমাঞ্চিত প্রহরে নাগরাজ বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে, মাথায় জ্বলছে রত্ন-প্রদীপ মণি। অন্ধকারের মধ্যে বাবার গলার স্বর শুধু শোনা যায়। দুপাশ থেকে হর্ষ আর মন্দিরা বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

এই অন্ধকার ঘরের মধ্যেই রাতের পর রাত আসে সকলে। আবছা স্টেজের ওপর যেন এসে দাঁড়ায় অভিনেতারা। ফেডলাইট ক্রমে প্রখর হবে, কিন্তু এখন চারপাশে যেন কোনই দৃশ্যপট নেই এক অন্ধকার ছাড়া। সেই অন্ধকারের কি বিচিত্র রূপ। কখনো সাদা, কখনো লাল, কখনো তা মরুভূমির মত জ্বলে, কখনো জ্বলে ফসফরাস মাখা সমুদ্রের মত।

আসে সমুদ্রবিলাসী রবিনসনক্রুসো, আসে লিলিপুটের দেশের গালিভার। জিন্‌ভলজিনের জেল হয়ে যায় সামান্য রুটি চুরির অপরাধে। বার্ণারের বন এগিয়ে আসছে, ম্যাকবেথের মুখে ভয়ের অন্ধকার। যদ্দুর মনে পড়ে এই অন্ধকারের মধ্যেই ইহুদি শাইলক ছুরি শানিয়েছে অ্যাণ্টোনিয়র বুকের মাংস কাটবে বলে আর নেপোলিয়ান ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠেই থেকে থেকে ঘুমিয়ে নিয়েছেন সুবিধা মত।

নারকেলের ভূতুড়ে পাতাগুলো হয়ত খরখর করে ওঠে আচমকা, হর্ষ চমকে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধিত পাষাণের খিলানে খিলানে আছড়ে পড়ে ভোরের আর্তনাদ : সব ঝুটা হ্যায়! সব ঝুটা হ্যায়!

—বড় বৌমা কোথায়? একবার ওঘরে আসতে বলতো তাড়াতাড়ি—ছোটঠাকুর্দা একেবারে জানালার নিচে এসে দাঁড়িয়েছেন, মহিম যেন কেমন করছে।

কথাটা শেষ করেই ছোটঠাকুর্দা উদ্বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। জানালার ঠাণ্ডা গরাদের ওপরে মুখ রেখে আকাশ পাতাল ভাবছিল হর্ষ, ভাবছিল অতীতের নানারঙের দিনগুলোর কথা, তাদের অপলাতক রঙিন ছবিগুলো এখনো মনের অ্যালবামে আঁটা রয়েছে। এমন সময় রসভঙ্গ।

ব্যস্তসামস্ত হয়ে মুখখানা টেনে নিয়ে উঠে বসতেই পিছন থেকে হর্ষর মা কথা বললেন, ছোটকাকা ডেকে গেলেন না?

হর্ষ করুণভাবে ঘাড় কাত করলো।

—মহিমের বুঝি—মা শেষ করলেন না কথাটা।

মন্দিরা লেপের তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো, কি মা ?

মা কানে নিলেন না কথাটা। গায়ের মাথার কাপড় ঠিক করতে করতে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার মখে একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে কাঁপা গলায় বলে গেলেন, তোর কাকীমাকে ডাক দে, হর্ষ।

হর্ষর চোখের সামনে থেকে সব সরে যাচ্ছিল। কেমন একটা আচ্ছন্নের মত বোবা হয়ে বসে ছিল কয়েক সেকেণ্ড।

তারপরেই একটা তীক্ষ্ণ কান্নার আবর্ত উঠলো ছোটঠাকুর্দার কৃপণ ঘরখানার বুকের ভেতর থেকে।

বাড়ির এপাশ ওপাশ থেকে প্রতিবেশীদের ভীরু কৌতূহল উঁকি মারলো এক আধবার। দুচার জন সোজা চলে এলো চোখ মুছতে মুছতে। শান্তি পিসী সকলের আগে। ঘর লেপছিল, সেই হাতেই। কোমরে তখনও কাপড় জড়ানো। বেতের পাতার মত থর থর করে কাঁপছিল তার সুন্দর ঠোঁট দুখানা। এত কাঁপছিল যে মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে চেপে ধরছিল নিচের ঠোঁটটিকে। হর্ষ তখন যন্ত্রচালিতের মত বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বড়কাকা ধড়মড়িয়ে বেরিয়েছেন ওপাশের ঘর থেকে। কাকীমাও।

তারপর বেলা বাড়লো। গলা চড়ালো দাঁড়কাকের দল তেঁতুল গাছের মাথায়। খাঁ-খাঁ। মণিকাকার বিছানার চার পাশের কান্নাটা আরো করুণ হলো, কখনো নেতিয়ে কখনো ঢেউ খেয়ে বয়ে চললো থেকে থেকে। আর ছোটঠাকুর্দার শুঁড়তোলা চটির ভোঁতা শব্দ আগাগোড়া হেঁটে বেড়ালো উঠোনময়।

তেঁতুল গাছতলা দিয়ে যে সরু পথটা এঁকেবেঁকে তিন মাইল দূরের কোন এক নদীর পিঠছোঁয়া শ্মশানে গিয়ে ঠেকেছে, তার অনেকটাই দেখা যায় বার-বাড়ির উঠোন থেকে। গাজনার বিলের শুকনো বুকের ওপর দিয়ে একটা খড়ির দাগ যেন ধীরে ধীরে দিগন্তের দিকে মিলিয়ে গিয়েছে। কখনো কখনো হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়লে হর্ষ আর চোখ ফেরাতে পারে না। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। পথটাকে জীবন্ত মনে হয়। একটু এগিয়ে গিয়ে সেই নির্জন মুহূর্তে তেঁতুল তলার বুনো পথটা পা দিয়ে ছোঁবার দঃসাহস তার হবে না। চোখের আড়ালে শ্মশানটা থাকলেও মনে হবে ঠিক এই মুহূর্তে সে কাপালিকের মত উঠে বসে তার মন্ত্রপুত কঙ্কাল-হাতটা পথের রূপ ধরে হর্ষদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে।

কেন দিয়েছে তাও অস্পষ্ট নয়। মণিকাকা নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে শ্মশান থেকে। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না বটে কিন্তু হর্ষর কান এড়ায়নি তার কষ্টে টানা নিশ্বাস। মনে হবে তেঁতুল পাতার শব্দ কিন্তু আসলে তা নয়। হর্ষর গায়ে কাঁটা দিল।

পঁচিশ বছর বয়সে মণিকাকা নিশ্চয়ই মরে যেতে চায়নি এই পৃথিবী থেকে, এই সাগতা গ্রাম থেকে, সকলের মাঝখান থেকে। বরং মণিকাকা বেশী করে বাঁচতে চেয়েছিল, দিনের আলোর মত স্পষ্ট সে কথা।

মধ্য প্রদেশের কোন বন বিভাগে ঠিক কিসের চাকরি মণিকাকা করতো তা আর জানা হয়ে ওঠেনি তার। বোমার ভয়ে দেশে পালিয়ে আসার প্রায় বছর দুই পরে মণিকাকা দেশে ফিরে এলো। অনেকদিন চিঠিপত্র নেই, কিছু নেই, তারপর হঠাৎ আবির্ভাব। সে চেনা যায় না।

একটা টোললা ধান যখন ঢেঁকির গড়ের মধ্যে থেকে চিঁড়ে হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কি তাকে চেনা যায়? ভাবা যায় একদিন সে কি নিটোল, কি উজ্জ্বল রোদ্দুর রঙের ধান ছিল? যায় না। আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি যদি ত্রিশে এসে ঠেকে, মুখের হাসি যদি ক্লান্তির মত সমস্ত মুখভরে ছড়িয়ে থাকে, বড় বড় চোখ দুটো কপালের আধইঞ্চি নিচু গর্তের ভেতর থেকে জ্বলতে থাকে তবে সে মহিমই হোক আর মণিকাকাই হোক প্রথম দর্শনে চেনা যায় না।

বাড়ির সবাই মণিকাকার সর্বনাশ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো, তার বুকের একখানা প্রকাণ্ড ছবি। কালো সাদা মেশানো বুকের কখানা হাড়

পাঁজরের ছবি-ধরা সেই নেগেটিভখানা হর্ষ একবার মাত্র উঁকি মেরে দেখেছিল। দেখে কিছুই বুঝতে পারেনি বলে অস্বস্তি বোধ করেছে।

রাত্রে জ্বর, ঘুসঘুসে কাসি, অবসাদ। অনেকদিন মনের জোরে অবহেলা করেছিল মণিকাকা। সহকর্মীরা ডাক্তারের কাছে যেতে বলেছে। বলেছে সময় থাকতে সাবধান হতে। মণিকাকা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপরে একেবারে যখন অবিশ্বাস করতে পারেনি তখন বড়ই দেরি হয়ে গেছে।

তারপর কাজে ইস্তফা দিয়ে সুদূর দেশের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

সহরের হাসপাতালে যায় নি, কারণ মনে হয়েছিল সত্যি সত্যিই এই রাজরোগ তার হয়নি। পণ্ডিতেরও মতিভ্রম হয়, ডাক্তারের হবে না! এমন তো কত কত শোনা গেছে, কিছুর মধ্যে কিছু না, মাঝখান থেকে রক্ত জল করে রোজগার করা টাকা পাঁচ খেয়ালে জলের মত খরচ করা হল। এক্সরে, ওষুধ, পথ্য, ডাক্তার, দুশ্চিন্তা। তারপর সর্বস্বান্ত। এবং তারও পরে এই সিদ্ধান্ত যে কিছুই হয়নি।

তারও হয়ত এমনিই হয়েছে। বাংলা দেশের উত্তুরে জলবায়ুতে, সোঁদা মাটির গন্ধে মানুষ। শাকলতার ছায়ায় নিশ্বাস নেওয়া অভ্যেস। সহ্য হয়নি মধ্য প্রদেশের জীবন যাত্রা। কিছুদিন ঘরের দাওয়ায় বসে প্রচুর ভিটামিন যুক্ত খাবার খেলেই সেরে যাবে সব। তা নয় যাবে হাসপাতালে! সেখানে কি মানুষ ফিরে আসবার জন্যে যায়?

ছোটঠাকুর্দার নিজের বিশ্বাস, কিছুই হয়নি। নিয়মমাফিক উপোস দিলেই সেরে যাবে সব। আজকালকার ছেলেরা যদি একবেলাও···যাক ওদের বলে আর কি হবে। নইলে তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কবার শয্যাশায়ী হতে হয়েছে বলুক দেখি কেউ?

রক্ত না ওঠা পর্যন্ত মণিকাকারও বিশ্বাস ছিল একদিন ঠিক ভাল হয়ে উঠবেই। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবে ক্লান্তি নেই। দুঃস্বপ্নের মত সব অস্বাস্থ্য রাত্রির নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেছে।

কিন্তু মা বলেছিলেন, ঠিক মরবার আগে ওর রক্ত পড়বে।

আজ দীর্ঘ দুটি বছর ধরে হর্ষ মণিকাকার প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত খরচ হয়ে যেতে দেখেছে।

মহাভারতে ব্যাসদেবের যে ছবি দেখেছে হর্ষ ঠিক তেমনি পারুলপিসীর নিজে হাতে লাগানো ছোট্ট আম গাছটার তলায় মোড়া পেতে বসে থাকতো মণিকাকা। তামাটে রঙ শরীরের। মুখে দাড়ি। শুকনো কাঠের মত চেহারা। ভর দুপুর বসে আছে আমগাছের ঠাণ্ডা ছায়ায়—

মাঝে মাঝে মণিকাকা তাকে কাছে ডেকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতো কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে দিত না কাছে।

কোন দিন হয়ত শুধু একটা মাত্র কথা বলে কেমন উদাস হয়ে চুপ করে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে শান্তিপিসীর কথা জিজ্ঞেস করতো।

—কাকু।

—কি?

হর্ষকে মণিকাকা কাকু বলে ডাকতো আদর করে। কখনো নাম ধরে ডেকেছে বলে মনে পড়ে না তার।

—আমি ঠিক ভাল হয়ে যাবো কি বলিস?

হর্ষ কথায় বলতে পারতো না, ঘাড় নেড়ে জানাত, হ্যাঁ।

শান্তিপিসীও একদিন ওর হাত ধরে এই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল ঠিক মন্দিরার মত অসহায় গলায়। হর্ষ সেদিন বলতে পেরেছিল, মণিকাকা আর ভাল হবে না। ধীরে ধীরে—

মণিকাকা রাতদিন কি ভাবতো। লেখাপড়া নেই, খেলানো বেড়ানো নেই, শুধু বসে থাকা। কিন্তু চুপ করে কি আর বসে থাকা যায়।

সেদিনও আমগাছতলা থেকে হাততালির শব্দ শুনে হর্ষ এগিয়ে গেল। গলার স্বর হঠাৎ বসে যাওয়ায় দূরের লোককে আজকাল মণিকাকা এইভাবে ডাকে।

কাছে যেতেই বসতে ইসারা করলো মণিকাকা। হর্ষ বসলো। মণিকাকা কোন কথা না বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। নির্জন নীল দুপুর। দূরের বাঁশঝাড়ে কাঠঠোকরা মাঝে মাঝে কট্ কট্ কট্টাস্ করে শব্দ তুলছে। একটা ঘুঘু ডাকছে কোথায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আলবোলা টানার শব্দের মত। জঙ্গলের ভিজে ছায়ায় যেন অম্বুরি তামাকের আবছা গন্ধ লেগে আছে। হর্ষ ঘ্রাণ নেয়।

—কাকু? মণিকাকা যেন সচেতন হয়ে উঠলো।

—কি?

ঘ্যাসঘেঁসে কষ্টকর স্বর ফুটিয়ে মণিকাকা কথা বললো। ক্ষয়ে আসা খড়িটা দুআঙুলে খুব চেপে ধরে শ্লেটের ওপরে যখন লেখে হর্ষ তখন যেমন শব্দ হয়। ঠিক তেমনি গলার স্বরটা যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে।

—তুই রোদ্দুরের শব্দ শুনতে পাস কাকু? ঝিম্‌ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্। আস্তে, খুব আস্তে।

—এই দুপুর বেলায় পাই, মণিকাকু।

—পাস? মণিকাকা উৎসাহে ঘাড় লম্বা করলো, আমিও পাই।

একটু থেমে আবার বললো, আমার তাহলে অসুখ করে নি, কি বলিস?

অসুখ বলতে মণিকাকা যে কোন অসুখ বোঝাতে চাইছে হর্ষ তা বুঝলো। তাই কোন উত্তর করলো না।

এর এক সপ্তাহ পরেই রক্তবমি হলো মণিকাকার। সে কি রক্ত! আম গাছ তলাটা রক্তে ভেসে গেল। মা জনকেশ্বরীর ভিটের পাঁঠা বলির পরে যেমন হয়।

সেইদিন রাত্রেই মণিকাকা হাততালি দিয়ে হর্ষকে ডাকলো। হর্ষ পড়তে বসেছিল। লণ্ঠনটা কমিয়ে রেখে মণিকাকার কাছে উঠে গেল। মণিকাকা তাদের ঘরের বারান্দায় শুয়ে ছিল। ইসারায় মাথাটা এগিয়ে আনতে বললো।

—কাকু, আমি আর বাঁচলাম না রে।

কান্না পেল হর্ষর। সেতারের কানের মত বুকের ভেতরটায় মোচড় লাগলো। হর্ষর মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে মণিকাকা ছোটছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। হর্ষ নিশ্বাস বন্ধ করে কতক্ষণ তার বুকের ওপর পড়ে রইল। নিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই এ রোগ ছড়ায়।

মণিকাকা বোধ হয় টের পেয়েছিল, কিংবা পায় নি। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল হর্ষকে। হর্ষ লজ্জা পেয়েছিল কিন্তু সরে দাঁড়িয়েছিল সাবধানে। পচা দুর্গন্ধ নাকে এলো কোথা থেকে। হয়ত মণিকাকার বুকের ভেতর থেকে। হর্ষ আর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়ালো।

হাঁপিয়ে পড়েছিল মণিকাকা। একটু দম নিল। তারপর শুয়ে শুয়েই মাথার বালিশের তলা থেকে কি একটা জিনিস বার করলো। আবছা অন্ধকার জিনিসটা সঠিক ঠাহর হলো না, মনে হলো একটা পুরু সাদা খাম।

মণিকাকা আবার কাছে ডেকে ফিসফিসে গলায় বললো, আমি যখন থাকবো না—একবারের জন্যে মনে হলো গলাটা কান্নায় ডুবে এলো, কিন্তু সামলে নিল চট করে। ফিসফিস করে, কিন্তু মনে হলো এবার মণিকাকা চিৎকার করে কথা বলছে, তখন—তখন এটা শান্তিকে দিবি। কিন্তু তার আগে না। আর—একটু হাঁপালো—আর এটা খুলবি না, কাউকে দেখাবি না, লুকিয়ে রাখবি।

হর্ষ যন্ত্র চালিতের মত হাত বাড়িয়ে খামটা নিতেই মণিকাকা নির্জীবের মত পাশ ফিরে শুলো।

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, তাইত খামখানার কথা একদম মনে ছিল না। খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ভয়ে ভয়ে ঝুপসি তেঁতুল গাছটার দিকে তাকালো হর্ষ।

—দাদা, এখানে তুই একা দাঁড়িয়ে কি করছিস রে?

মন্দিরা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায় নি। আর একটু হলেই চমকে চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কি?

—এমনি। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথাও না।—পান খাওয়া ঠোঁটটা উল্টে একবার দেখবার চেষ্টা করে বললো, চল না মা তোমাকে ডাকছে!

কিছু অন্যায় না করলে মার কাছে সহজে তার ডাক পড়েনা, অথবা নতুন কিছু খাবার তৈরী না হলে। এই ভর দুপুরে অবশ্য খাবারের কথাটা তার একদম মাথায় এলো না, খুব সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি। তারপর ভয়ে ভয়ে বললো, কেনরে?

—গিয়েই দ্যাখোনা একবার। ভুরু কুঁচকে এমন গম্ভীর গলায় মন্দিরা কথাটা বললো যে, দৃশ্যখানা চোখের সামনে অনায়াসে ভেসে উঠলো। বেশী দেরীও করা যায় না, মা তা হলে আরো চটে যাবেন। চাইকি নিজেই চলে আসবেন এখানে। হর্ষ ভাবি ভারি পা দুখানা টেনে নিয়ে চললো। মন্দিরাও সঙ্গে সঙ্গে।

মন্দিরাটা আজকাল কেমন একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে যেন। কতই বা ওর বয়স, এরই মধ্যে যখন তখন দিব্যি গম্ভীর হয়ে যায়, অনেকটা পারুল পিসীর মত। তখন আর কিছুই ঠাহর করতে পারে না, মনে মনে ও কি ভাবছে। আসলে হয়ত কিছুই ভাবছে না, তবু বড় কষ্ট হয় এই সময়টা।

অথচ কারো মনের একটা অক্ষরও কারো কাছে গোপন ছিল না এই সেদিন পর্যন্ত। যতদিন না পারুলপিসী তাদের মধ্যস্থ হয়েছে কিংবা অন্য কারো ছায়া এসে পড়েছে তাদের মাঝখানে। কলকাতার বাসায় তারা যেন রাম লক্ষ্মণ ঘুরে বেড়াতো দুপুর বেলায়। মা যখন কাজের অভাবে ঘুমিয়ে পড়তেন পাতাখোলা রামায়ণের ওপরে মাথা রেখে।

ছেলে সাজবার একটা প্রবল বাসনা ছিল মন্দিরার। দাদার জামা প্যাণ্ট পরে সেই ইচ্ছা সে পূরণ করত মাঝে মাঝেই।

—দাদা, আমি বেশ তোর ভাই?

—মিছিমিছি?

—ন্ না! শক্ত করে মাথা ঝাঁকিয়ে মন্দিরা প্রতিবাদ জানাতো।

—বেশ, তা হলে খুব মজা হয়।

হাতের চুড়ি আর বেলফুলের মত ছোট্ট দুল জোড়াটা খুলে রেখে একদিন দেখা গেল মন্দিরা হর্ষর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছে। হাফ প্যাণ্ট পরণে। রোগা, নরম, পাখির ছানার মত দুর্বল মন্দিরার হাত দুটো ফুলসার্টের আবরণে চাপা পড়েছে। বব্ করা চুল ছদ্মবেশটা ধরিয়ে দেয় না, যতক্ষণ না ও কথা বলে।

—কি খোঁকাবাবুরা বেরাতে যাইতেছ?—রাস্তার হিন্দুস্থানী পুলিশটা বাঁ হাতের তালুতে অদৃশ্য খৈনির পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ওদের লক্ষ্য করে বলে।

মন্দিরা কি বলতে যাচ্ছিল বুঝতে পারে হর্ষ, পুলিশটা ঠিক কুম্ভকর্ণের মত দেখতে। তাড়াতাড়ি হাতে চিমটি কেটে চুপ করিয়ে দেয় মন্দিরাকে।

পুলিশটার কাছে ওর ছদ্মবেশ ধরা পড়ায় বিশেষ আপত্তি আছে তার। মন্দিরার গলার স্বর এত তরল যে শোনা মাত্র বোঝা যায়।

—কোথায় রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরিস আজকাল। দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসিস না—মার অনুযোগে হর্ষর তাল কেটে গেল, এই ম্যালেরিয়া থেকে ভুগে উঠলি। নাঃ ইস্কুল আর তোর ভাগ্যে নেই।

—তেঁতুল তলায় একা একা দাঁড়িয়ে ছিল, মা। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

বলতে বলতে মার পাশে চৌকির ওপরে ধপ্ করে বসে পড়লো মন্দিরা। হর্ষর যা রাগ হলো।

মা শুয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, ওমা।

মাথার চুল চূড়োর মত রাশ করে তোলা, একটি গিঁট দিয়ে ঠিক মুকুটের মত। ঘোমটা নেই। জানালার ফাঁক দিয়ে সজনে পাতার ছাপ কাটা চিকন রোদ মার মুখের ওপর শির শির করছে। অবাক হয়ে চমকে গেল হর্ষ। এ যেন তার মা নয়। কেউ নয়। রূপকথার এক দুঃখিনী রাজকন্যা। ভীষণ ভাল লাগলো কথাটা ভাবতে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করলো। গায়ে কাঁটা দিল। মাকে দেখলে এক এক সময় ভয় করে তার, অদ্ভুত একটা ভয়।

—ওকি অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে, এদিকে আয়।

কাছে টেনে তাড়াতাড়ি আপাদমস্তক হাত বুলিয়ে দিলেন মা। মনে হলো মনে মনে যেন মন্ত্র বলছেন।

অনেকক্ষণ মার পাশে বসে অপেক্ষা করে থাকলো হর্ষ। মা কেন ডেকেছেন সেটা না জানা পর্যন্ত অস্বস্তির শেষ হচ্ছিল না।

অবশেষে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতেই মা বললেন, কলকাতায় আর একখানা চিঠি লিখে দেতো, বাবা। বুঝতে পারছিনে কি হলো।

ব্যথায় মার ঠোঁট দুখানা কেঁপে উঠলো। হর্ষ অন্যদিকে চোখ সরালো। একই রকম পা দোলাতে থাকলো মন্দিরা চৌকির কিনারে বসে।

হর্ষর বাবার চিঠি আসচে না অনেক দিন। আজকাল আগের মত ঘন ঘন তিনি অবশ্য চিঠি লেখেন না কিন্তু এত দেরী তো হয় না কখনও। এদিকে কলকাতার কোন খবরও এসে পৌঁছায় না। এত বেশী পাড়াগাঁ যে খবরের কাগজের মুখ দেখে না আশপাশের বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে কেউ। গুজব অবশ্য মাঝে মাঝেই রটে যায়, এই শেষ হয়ে এলো। কলকাতার আর কিছু নেই। তার কদিন পরেই হয়তো বাবার চিঠি আসে। খবর সব ভাল।

চিঠি লিখতে বসেছিল হর্ষ, মা শুয়ে শুয়ে বলে যাচ্ছিলেন সব। একেবারে শ্রীশ্রীদুর্গাসহায় থেকে শুরু করে সব কিছু। কখনো তাড়াতাড়ি, কখনো থমকে গিয়ে একটা কথা বলতে গিয়ে সেকথা ডিঙিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া

অন্য কথায় অন্য বিষয়ে মা এগিয়ে যান, কখনো পিছিয়ে আসেন। একবারও হর্ষর কথাটা ভাবেন না। সে অসহায় ভাবে মার মুখের দিকে তাকায়।

মা চোখ বুজে। হাতটা আড়াআড়ি কপালের ওপর তোলা। ঠিক ছবি দেখছেন কলকাতার। প্রথম প্রথম হর্ষ বলতো, মা 'একটু' আস্তে। থেমে থেমে বলো।

মা ধীরে ধীরে বলতেও চেষ্টা করেছেন প্রথম প্রথম। কিন্তু হয়না। থেমে থেমে বললে মার কথাই আসে না। তাই শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে মা মার মত বলে যাবেন। হর্ষ লিখে যাবে হর্ষর মত। যা কানে আসবে তার কিছুটা অন্ততঃ লিখতে পারলেই যথেষ্ট।

চিঠি শেষ করে সবে ঠিকানা লিখতে বসেছে, মন্দিরা ঝুঁকে পড়লো পোষ্ট কার্ডের উপর। কিছু যেন বলতে চায়। হর্ষ মুখ তুলে তাকালো। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন পাশ ফিরে শুয়ে। তাঁর যা বলবার বলা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

—তুই একটু লিখবি মন্দিরা ?

মন্দিরা ঘাড় নেড়ে অস্বীকার জানালো। কিন্তু যেমন ঝুঁকে পড়েছিল তেমনি রইল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ঘাড় তুলে মন্দিরা আস্তে আস্তে বললো, দাদা, তোর মন কেমন করছে না ?

—হ্যাঁ। তোর ?

—আমারও। ঠোঁট ফুলিয়ে বললো মন্দিরা।

—বাবার জন্যে তো ? আরো স্পষ্ট করে জানতে চায় হর্ষ।

—হ্যাঁ। একটু চুপ করে থেকে মন্দিরা বলে, নস্তর জন্যও আর ছোট-কাকার জন্যেও।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়েগেল হর্ষ। নস্ত, সেই বেরাল বাচ্ছাটার কথা কি করে সে ভুলে গিয়েছিল একেবারে। আর এই কবছর মন্দিরা মনে মনে নস্তকে ভোলে নি, কিংবা হঠাৎ মনে পড়েছে আজ তাকে। ছোটকাকার কথা মাঝে মাঝে যেমন মনে পড়ে হর্ষর, এগারটা রাত্তিরে ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাত খাওয়ার মত। আবছা আবছা। স্বপ্ন স্বপ্ন। কোণের ছোটঘরে খিল দিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মোটা মোটা ডাক্তারি বই খুলে ছোটকাকা ঠ্যাচু হয়ে বসে আছেন। বইগুলোর ভেতর বিদ্‌ঘুটে বিচ্ছিরি সব ছবি আছে। দিনের আলোয় পাতা উল্টে দেখেছে হর্ষ। ভালো লাগেনি।

মাঝ রাত্তিরে বাবার মাঝে মাঝে খিদে পায়। মা অবশ্য রাগ করে বলেন, রসের খিদে। মাকে ঘুম থেকে জাগতে হয়, কোন কোন দিন উনুন ধরাতে হয় আবার। বাবাব গরম গরম লুচি খাবার সখ হয়েছে, নয়ত, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে খিচুড়ি। মা রাগ রাগ মুখ করে উনুন ধরাতে যান, মুখে বললেও ধরান অবশ্য ষ্টোভ।

বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভুঁড়িতে হাত বুলোন আর বলেন, এই ছেলেমেয়েদের জন্যে আরকি। আমি লক্ষ্য করেছি অ জ সন্ধ্যে বেলায় ওরা ভাল রকম খায় নি। তুমি তো দেখবে না। হেঁ হেঁ—

ছেলে মেয়েরা যে খাবে না মা ভাল করেই জানেন। হর্ষর বেহুলার গল্পটা মনে পড়ে এই সময়। সেই যে লখিন্দরের রাত দুপুরে খিদে পেয়েছিল, বেহুলা আঁচল পুড়িয়ে রাঁধলেন। যদিও বাবাকে কিছুতেই লখিন্দর মনে হয় না তার।

এই সময় হর্ষ আর মন্দিরা বিছানা ছেড়ে, বাবাকে, বাবার গল্পকে ছেড়ে মার কাছে রান্নাঘরে গিয়ে বসবে। কেন জানি রাত দুপুরে মার লুচি ভাজা দেখতে ভারি ভাল লাগে ওদের। আর, বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ছোটঘরের জানালা দিয়ে চুপিচুপি উঁকি মারতে। ছোটকাকা পার্কের ষ্ট্যাচুর মত বিদ্যাসাগর হয়ে বসে আছেন, এখন মাথায় একটা কাক এসে বসলেও নড়বেন না হয়ত। শুধু নস্যি নেবেন একবার নিচু হয়ে।

ছোটকাকা মানেই এই ছবি, এইটেই সব প্রথম মনে পড়বে তার। তারপর দিনের বেলার কথা। সেই ছোটকাকা কোথায় গেলেন সন্ন্যাসী হয়ে। হয়ত বনের মধ্যে গাছ তলায় ষ্ট্যাচু হয়ে বসে আছেন এখন।

—দাদা। কি ভাবছিস ?

ধড়মড়িয়ে তাকালো হর্ষ মন্দিরার দিকে, কই কিছু না তো।

—নন্তর কথা একটু লিখে দিবি বাবাকে ?

পোষ্টকার্ডের ঠিকানা লিখবার পিঠটা খালি ছিল। কলম বাগিয়ে ধরে হর্ষ বললো, কি লিখবো বল।

—চিংড়ি মাছটাই ভালবাসে নন্ত। বাবা যেন রোজ চিংড়ি মাছ কেনে। আহা ছেলেমানুষ। এখনো ইদুঁর ধরতে শেখেনি।

—অ্যাদ্দিনে কি আর ছোট আছে রে তোর নন্ত। কত বড়ো হয়ে গেছে হয়ত। তিনচার বছর হয়ে গেল তো।

কলমের হ্যাণ্ডেলটা দাঁতের ওপর ঠুকতে ঠুকতে হর্ষ জানায়।

ক্ষুণ্ণ হলেও কথাটা মনে ধরে মন্দিরার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, তবে থাক।

—কেন, থাকবে কেন ? অন্য কোন কথা লিখে দি ?

—না দাদা, থাক। মন্দিরা ভারি মনে উঠে যায়।

হর্ষ ভেবে পায় না নন্ত বড়ো হয়ে গিয়ে অপরাধটা কি করেছে। সকলেই তো বড়ো হয়। মন্দিরাও হয়েছে।

আসলে মেয়েরা পুতুল ভালবাসে, একটু পরে হর্ষ যেন ভেবে পেল, কেননা পুতুলরা কোনদিনই বড়ো হতে চায় না।

ছোটকাকার ফটোটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেনা হর্ষ। কোথায় যে রেখেছে। মনেও থাকেনা আজকাল কিছু। যখন যেটা খোঁজে সেটা হারায়। না খুঁজেই আর একদিন পাবে হয়ত সেটা। তবু হর্ষর জিদ চেপে যায় ফটোটা তার চাই-ই। আজই চাই, এক্ষুণি চাই।

আসলে ছোটকাকার মুখের চেহারাটা কিছুতেই আর মনে করতে পারছেনা সে। তাই ফটোর তলব হয়েছে। কাউকে ভাবতে গেলে যদি তার মুখের চেহারাটাই স্পষ্ট মনে না পড়ে তাহলে ভারী অস্বোয়াস্তি লাগে হর্ষর।

সুটকেশের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করেও শান্তি হলো না, একেবারে তলায় পাতা খবরের কাগজখানাও টান মেরে তুলে ফেললো ও। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো একটি জিনিস দেখতে পেয়ে। দিনের আলোয় যার চেহারাটা পর্যন্ত কোনদিন লুকিয়েও দ্যাখেনি।

সেই সাদা মোটা খামখানা। তাড়াতাড়ি পিছনে তাকালো, মা ঘুমোচ্ছেন ওপাশ ফিরে। মন্দিরাও ঘরে নেই। খামটা হাতে তুলে নিল। কি আছে এর মধ্যে? একবারটি খুলে দেখলে হয় না? দোষ হবে?

ঘরের পেছনে তেঁতুল গাছে শব্দ হলো যেন। হাতের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো অমনি। আর ভাবলো না ওসব কথা। প্যাণ্টের পকেটে চালান করে দিল খামাখানা। নাঃ, শান্তিপিসীর হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে শান্তি। নইলে আবার ভুলে যাবে হয়ত। কিন্তু ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে এখন শান্তিপিসীর দেখা?

শান্তিপিসীকে প্রথম দেখেছিল হর্ষ ঘোষেদের পুকুর ঘাটে। সে গতবারের কথা। সেই প্রথম এসেছে দেশে বাড়িতে, উপলক্ষ পিসীর বিয়ে।

পিসীর সঙ্গে গেছে পুকুর ঘাটে। জায়গাটা ভারি নিরিবিলি, চারপাশে জঙ্গল। মাঝখানে ঘাটটা ভারি পরিষ্কার। ঢালু হয়ে থাকে থাকে জল পর্যন্ত নেমে গেছে সিঁড়ির মত, খেজুর আর নারকেল গাছের গুঁড়ি। এ ঘাটটা বিশেষ করে মেয়েদেরই।

চার পাঁচটা মেয়ে আগে থেকেই স্নান করছিল। শুধু একটি শ্যামবর্ণ ছিপছিপে মেয়ে বসে বসে জল ছেটাচ্ছিল দুহাতে। তাদের আসতে দেখেই টানাটানা চোখ দুটো উল্টে জিজ্ঞেস করল হঠাৎ, চ—কে?

প্রশ্নটা পারুলপিসীকে করা হয়ে থাকলেও হর্ষ হকচকিয়ে গেল কম না। এ বাবা কি জাতের ভাষা। তখন কি আর জানতো গাঁয়ের মেয়েরা নিজেদের কথা এই ভাষায় বলে। ঠাকুমা দিদিমারা শুনলে মুখ টিপে হাসেন, নিজের চোখে দেখেছে হর্ষ। বাপের বাড়িতে তাঁরাও যে এককালে এই ভাষায় কথা বলেছেন কোন দিন, এই মেয়েগুলোর মাথায় সে কথা কেন যে ঢোকে না! সাবধান হয়না!

পিসীও জবাব দিল ঐরকম জড়িয়ে জড়িয়ে দৌড়োনো গলায়। কিছুই বোঝা গেল না মনে হল। কিন্তু রোগামেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

তারপর সবাই মিলে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি চললো জলে নেমে। কলস বুকে নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে। ভীষণ রকম জল ছেটাতে ছেটাতে যে হাসি শুরু হলো মনে হল তা আর থামবে না। ডাঙায় বসে পিসীর জামাকাপড় কোলে নিয়ে হর্ষ কালা দর্শকের মত সব দেখলো।

স্নানান্তে বাড়ি ফিরবার সময় শ্যামলী মেয়েটি পিসীর সঙ্গে সঙ্গে এলো। তাকে মাঝখানে রেখে পাশাপাশি হাঁটছিল পারুলপিসীরা। আপন মনে আসছিল হর্ষ, কলকাতায় থাকলে এতক্ষণ তাকে স্কুলে যেতে হতো নিশ্চয়। সেই কথাই ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল। পিসীদের কথা কানে ঢুকছিল না একবিন্দুও।

হাতে একটা মৃদু চাপ পড়তেই খেয়াল হল, তার হাতটা কখন সেই অপরিচিতা মেয়েটির হাতের মুঠোর মধ্যে আটক হয়েছে। চমকে তাকালো তার মুখের দিকে। কিন্তু হর্ষকে সে গ্রাহ্য করলো না, পিসীর সঙ্গে সমানে হাসচে আর গল্প বুনে চলেছে।

ব্যাপার কি! মেয়েটি মাঝে মাঝে হর্ষর হাতে চাপ দেয় আর ও চমকে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু তার ঠোঁটে যে হাসির ঝিলিকগুলো দেখে তা হয়ত পারুলপিসীর জন্য, ঠিক তার জন্য নয়। ভারী অদ্ভুত ঠেকে পিসীর বন্ধুর এই ব্যবহার।

এই হচ্ছে শান্তিপিসী। এরপরে কতদিন পাড়ার বিমলা বৌদির বাড়িতে বিন্তির আডডায়, নয় তো দত্ত মাসিমার সেলাইয়ের আসরে তাকে দেখেছে। অবশ্য পিসীর বিয়ের আগে পর্যন্তই হর্ষ এই সব জায়গায় অনায়াসে যাতায়াত করতো।

সেখানেও শান্তিপিসীর সেই টানাটানা চোখ, দুষ্ট দুষ্ট হাসি। তাস খেলার মধ্যে একেবারে ডুবুডুবু হয়ে আছে হয়ত কিন্তু যেই হর্ষ একটু বেশীক্ষণ ধরে তার নিচের ঠোঁটের তিলটা দেখবে অমনি শান্তিপিসী ঠিক টের পাবে, হাসি হাসি চোখ তুলে তার দিকে তাকাবে এক পলক। শালিক পাখির মত, যতই পা টিপে টিপে যাও ঠিক টের পায়।

হর্ষ প্রথম দিন থেকেই শান্তিপিসীর ঠোঁটের তিলটা লক্ষ্য করেছে। গায়ের ভেতরটা শিরশির করে সুড়সুড়ি লাগার মত, একভাবে তাকিয়ে থাকলে। আচ্ছা ওটা যদি নাকের ওপরে হত কিংবা চোখের পাতার ওপরে, চোখ না বুজলে দেখা না যেত যদি? তাহলে বিশ্রী দেখাতো নিশ্চয়ই। ম্যাপে যদি দেখা যেত ভারতবর্ষের ঠিক চিবুকের নিচে সিংহলের তিলটা নেই, তাহলেও তো? সব সময়ে কত কি হিজিবিজি ভাবে হর্ষ, এমনি পাগলাটে তার স্বভাব।

বছর তিনেক আগের এক সন্ধ্যায় বেতের মোড়া পেতে বারান্দায় বসে ছিল হর্ষ, উঠোনের আবছা অন্ধকারে শান্তিপিসী এলো। হর্ষদের বাড়ি থেকে একখানা বাড়ির পরেই শান্তিপিসীদের বাড়ি। পিসীর বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু শান্তিপিসী এখনো যখন খুশী তাদের বাড়ি চলে আসে সময় পেলেই।

—বৌদি কোথায় রে হরো?

শান্তিপিসীর ঠোঁটের তিলটা দেখতে খুব ভালো লাগে হর্ষর, আবছা অন্ধকারের মধ্যে চোখে বেশ জোর দিয়ে তাকালো। না, মুখই চেনা যায় না ভালো করে।

—বসো না শান্তিপিসী, একটা গল্প বলবে আমাকে।

—আমার কথার জবাব দে আগে, বৌদি কোথায়?

একবারও ভাবলো না হর্ষ মাকে শান্তিপিসীর এত কি দরকার। বিকেল থেকে একা একা বসে আছে বারান্দার ওপরে চুপ করে, শান্তিপিসীকে দেখে তাই ভারি ভালো লাগলো।

—মা এখন রান্না ঘরে। এই বসো না শান্তিপিসী, এই নাও—

নিজের মোড়াটা শান্তিপিসীকে এগিয়ে দিচ্ছিল হর্ষ, হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে মাটিতেই বসে পড়লো শান্তি।

কেরোসিনের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন হর্ষদের বাড়িতে রাত্রে পড়াশুনার পাট স্থগিত রাখা হয়েছিল কিছুকালের জন্য।

ছোটঠাকুর্দা বলেন, রাত্রে পড়াশুনা যত কম করা যায় ততই ভালো। চোখ ভাল থাকে ছেলেদের। তবে পড়তে চাও, হ্যাঁ, আমার মত ভোরে ওঠো। আর রাত্রে হয় বসে বসে গল্প করো নয় ত আকাশের তারা পড়ো। চিনে রাখো কোনটা দক্ষিণ আকাশে প্রথম ওঠে, কোনটা ফোটে সকলের শেষে। কাল-পুরুষকে লক্ষ্য করো একমনে। স্বাতী আর মৃগশিরাকে যখন এক মিনিটে খুঁজে বের করতে পারবে তখন বুঝবো তুমি আকাশের অ আ ক খ শেষ করেছো।

আরো অনেক কথা। ছোটঠাকুর্দা বড় একটা কথা বলেন না, সব সময়েই পুজো আচ্ছা আর পড়াশোনা নিয়ে থাকেন, কিন্তু কথা উঠলে কখনো কখনো

তাঁর বারান্দা থেকে মুখ তুলে ওদের কথার মধ্যে যোগ দেন। হেসে হেসে দু চারটে কথা বলেই আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুব দেন।

রাত্রে উঠোনে পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে থমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। আগে, অনেক আগে যখন পুঁথিরও জন্ম হয়নি তখন মুনি ঋষিরা এই বই পড়তেন। কত কথা লেখা আছে আকাশের গায়ে, কত গল্প তারায় তারায়। শুধু কি জ্ঞান বাড়ে, চোখের জ্যোতিও।

হর্ষ তারা গোনার চেয়ে গল্প শুনতে ঢের বেশি পছন্দ করে ছোটবেলা থেকেই।

—কিসের গল্প শুনতে তুই বেশি ভালোবাসিস হরো? শাড়ির পাড়টা পায়ের পাতা পর্যন্ত টেনে দিয়ে গুছিয়ে বসতে বসতে শান্তিপিসী বলে।

—ভূতের।

শান্তি আর হর্ষ দুজনেই চমকে উঠলো উত্তরটা শুনে। বারান্দার এক কোণে মন্দিরা এসে কখন যে গুটিসুটি মেরে বসেছিল কেউ তা টের পায়নি।

একেবারে কোলের ওপরে টেনে নিল মন্দিরাকে শান্তিপিসী।

—ভূতের গল্প তোর খুব বুঝি ভালো লাগে? মন্দিরার গালের ওপর নিজের মুখটা ছুঁইয়ে আদর করে কথাটা বললো। এই মানুষ ডুবোন অন্ধকারের মধ্যেও মনে হয় শান্তিপিসীর নিচের ঠোঁটের সেই রহস্যময় তিলটা মন্দিরার গালের ওপরে ঠিক ছাপা হয়ে গেছে, জলছবির মতো। কলকাতায় থাকতে যেমন জলছবি এঁটেছে বইয়ের পাতায়।

গল্প জমে উঠলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। তবে ভূতের গল্প নয়। ভূতের চেয়েও রহস্যময় আর অদ্ভুত যারা, তাদের গল্প।

বাইরের অন্ধকারও ঘন হয়ে আসচে আলকাতরার মত। হর্ষ, মন্দিরা আর শান্তি তিনজনই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল, ডুবে গেল অন্ধকার গল্পের মধ্যে। শুধু প্রপিতামহের মত প্রাচীন তেঁতুল গাছটায় বকের দল মধ্যে মধ্যে পাখনা ঝাড়ে। ক্লোরোফর্মের মত ঝিঁঝিঁর একটানা মাদক গুঞ্জন যেন রাত্রির চৈতন্য অসাড়, নিঃস্পন্দ, ভারাতুর করে ফেলেছে।

শান্তিপিসী গল্প বলে চলে কেমন চুপিচুপি ভয়-ভয় গলায়। ডাকের মার বাড়ি তো বেশী দূরে নয়, হাওয়ারও কান আছে যে।

দিনের বেলা ওই যে ডাকের মার বাড়িখানা দেখ কবরখানার মত পড়ে আছে, রাতের বেলা তার রূপ যায় একবারে পাল্টে। যত সব জীবন্ত মড়াদের আনা গোনায় ও বাড়ির ধুলোমাটি পর্যন্ত ভূতুড়ে হয়ে ওঠে। তেল সিঁদুর মাখা কড়ি গাছটা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়ায়, পাতাগুলো মাথার চুলের মত খাড়া হয়ে ওঠে। বেহালার ছড়ের মত দমকা হাওয়া ওর অগুন্তি

ডালপালার মধ্যে পাক খেয়ে কেঁদে ওঠে। এইবার ডাক আসবে, ডাকের মা কান্নার সুরে গর্জন করে করে আকাশে মন্তর ঝাড়ছে!

ও, ডাকের নাম এর আগে শোননি? সে এক ভীষণ গল্প, শান্তিপিসী থমকে গিয়ে হর্ষর কাঁধে হাত রেখে বলে, সে সব কথা শুনলে গ্রীষ্মের রাত্তিরেও বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। আজ শনিবার—থেমে যায় আবার।

বোঝা যায় গল্প আজ আর ওদিকে এগোবে না, মোড় ঘুরলো।

অন্ধকার রাত্তিরের মত যাকে দেখা যায় না; ঝোড়ো হাওয়ার কালো কেশর ফোলা ঘোড়ার মত যে মুহূর্তে মাঠ নদী বন ডিঙিয়ে চলে যায়, তারই নাম ডাক। তার—

—আচ্ছা শান্তিপিসী, ন বছরের মন্দিরার কৌতূহল উঁকি মারে, তুমি নিজের চোখে তাকে কখনো দেখেছো?

—দেখিনি আবার?—শান্তিপিসীকে উত্তেজিত মনে হলো, গলা নামিয়ে কথাটা বললো, তবে একবার মাত্তর দেখেছি, সেই ছোট বেলায়।

কুয়ো পাড়ে দাঁড়িয়ে জল তুলছিলেন শান্তিপিসীর মা। মেঘ চুঁইয়ে যে ম্লান চাঁদের আলোটুকু আসছে তাতে চারপাশ ভাল করে দেখা যায় না। শান্তিপিসীর বয়স তখন অল্প, মার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ দেখে কি তাদের পাছ দুয়োরের উঠোনের ওপর দিয়ে দুখানা বাঁশ প্রায় নিঃশব্দে ছুটে আসছে। প্রথমে ভেবেছিল চোখেরই ভুল, হয়ত কিছুর ছায়াটায়া, কিন্তু পরক্ষণেই চোখের নেশা কেটে গেল। ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো দু হাত দিয়ে। শান্তিপিসীর মা মুখ তুলে তাকিয়েই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন আর তাঁদের একবারে গায়ের পাশ দিয়েই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লগির ওপর ভর দিয়ে একটি ছায়া মূর্তি বিদ্যুৎ বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেই জ্যোৎস্না রাতের উঠোনের ওপর দিয়ে একটি অতিকায় বাদুড় উড়ে গেল যেন, তার ছায়াটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মাটিতে আঁচড় কেটে গেল।

মা আর মেয়ে ছুটে গিয়ে ঘরে দরজা দিলেন, সেরাত্রে আর বাইরে বেরোবার সাহস হয়নি।

গল্পের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল তিনজন, মুখের ওপর লণ্ঠনের আলো এসে পড়তেই চমক ভাঙলো। মা কখন বড় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন রান্নাঘর সেরে।

—এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বসে আছিস তোরা! মার মুখে এই একটিই মাত্র বিস্ময়কর বাক্য যোগালো।

বাতাসে যদিও ফাল্গুনের টান ধরেছে তবু বারান্দায় ঠাণ্ডা বৈকি। শুধু হর্ষ নয়, তারা কেউই খেয়াল করেনি তাদের শীত করছে, অথচ গল্পের মধ্যে তন্ময় থাকলেও কখন গুটিসুটি মেরে বসেছে। ঘেঁষাঘেঁষি করে। শান্তিপিসীর

গায়ে অবশ্য একখানার বেশী কাপড় নেই তবু দেখে মনে হয় না শান্তিপিসী শীতকে এতক্ষণ খেয়াল করেছে। হাতের মুঠোয় হর্ষর হাতখানা নিয়ে যেমন সেই প্রথম দিন খেয়াল করে নি, ভুলে গিয়েছিল তার অস্তিত্বকে, মাঘশেষের এই শীতকেও বুঝিবা তেমনি। একেবারে কাছের কোন কিছুকে একেবারে ভুলে যাওয়াই শান্তিপিসীর একটা অদ্ভুত অভ্যাস। পরেও জেনেছে অনেকবার অনেক কিছু, আজও জানলো একটা ব্যাপার।

আজ সারাদিন শান্তিপিসীর খাওয়াই জোটেনি। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুতে কি বলবে! ভীষণ চাপা মেয়ে, নিজের বিষয়ে কিছুতে ঠোঁট খুলবে না। মার এই কথাটা শুনলেই কাঠবাদামের কথা মনে হয় তার।

এই তো শান্তিপিসী, খামখানা পকেটে নিয়ে হর্ষ ভাবলো, পিসীর বিয়ের পরও কত কত রাত্রে মার কাছে এসে থেকেছে। তখনো বড়োকাকার বিয়ে হয়নি, গোমড়া মুখ নিয়ে কাকীমা এসে ঢোকেন নি এ বাড়িতে।

মণিকাকা অসুখ বাধিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন থেকেই শান্তিপিসী আর বড়ো একটা তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতো না।

যদি কখনো সখনো এসেছে, হয়ত মার কথামত মণিকাকার খাবারটা দিতে গেছে, মণিকাকা কথা বলেনি একটাও। নিমের পাঁচন গেলা মুখ করে মণিকাকা গম্ভীর হয়ে বসে থেকেছে, নয়ত শুয়ে। হর্ষর ভারি অবাক লেগেছে, কষ্ট হয়েছে। পাছে শান্তিপিসী দুঃখ পায়। শান্তিপিসীর সঙ্গে সকলেই হেসে কথা কয় এক মণিকাকা ছাড়া।

তাই সুযোগ পেলেই, হর্ষও যে মণিকাকার ওপর ভীষণ অখুশী এ কথাটা মিছিমিছি বানিয়ে বলে শান্তিপিসীকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতেও মনে হয়নি শান্তিপিসী খুব খুশী হয়েছে।

বিমলা বৌদিদের তাসের আড্ডায় নিশ্চয় এই দুপুরে শান্তিপিসীকে পাওয়া যাবে, হর্ষ ভাবলো। কিন্তু সে তো এ পাড়ায় নয়, সে দালানে। ভর দুপুরে একা একা সেখানে যেতে এখনও গা ছমছম করে। পুকুরের উত্তর পার দিয়ে, শুয়ে পড়া খেজুরগাছটা ডিঙিয়ে, ভৌমিকদের মাঠেলের নরম নিচু পথটা পার হয়ে, তাঁদেরই বাঁশ আর বেতবনের ছোট্ট কাটাকুটি খেলার জায়গাটায় হঠাৎ মোড় নিলেই বুড়ো বটগাছটার বগলের নিচ দিয়ে দালানের একতলা চেহারাটা নজরে পড়ে। এই সারা পথটায় একজন লোকের দেখা পাওয়া যাবে না দুপুর বেলায়।

বাইরে থেকে দালানটা পোড়োবাড়ির মত। ইঞ্জিনশূন্য ছোট একটা রেল গাড়ির মত তার একতলা কালোকালো ছোপ ধরা অনেক জানালা দরজা আঁকা মূর্তি নিয়ে বেল-কতবেল-বিলিতি গাবগাছের ফুটো ফুটো ছায়ায় মরচে ধরা লোহার খাঁচার মত পড়ে আছে মনে হয়। আর তার পেটের মধ্যে কোথায়

কোন কার্ণিশ-ঘুলঘুলির ফাঁকে ফাঁকে তর্কবাগীশ সবুজ-নীল পায়রার দল মুখর হয়ে আছে সব সময়।

দালানের ভেতর পা দিয়েই যে কেউ চমকে যাবে দুপুর বেলায়। এই নির্জীব বাড়িটার ভেতর এতগুলি লোক বসে বসে তাস খেলছে ভাবতে পারা যায় না। কাকার বন্ধুরা প্রায় সবাই দুপুরে নয়ত সন্ধ্যায় দালানের আড্ডায় আসে। বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, বর্ষাকাল হোক। বড়োকাকা এই দলের সর্দার ছিলেন বিয়ের আগে, সবাই ডাকতে আসতো বড়োকাকাকে একটু দেরী হলেই। আর তখনই ছিল দালানের এলাকাটা হর্ষর কাছে বিপজ্জনক। বড়োকাকা একবার হর্ষকে সেখানে দেখতে পেলে হয়! দালানে আসাটা যে কত-বড়ো অপরাধ এবং কেন, তা আজও বুঝতে পারে নি হর্ষ, শত মার খেয়েও না।

কিন্তু মার এড়াবার একটা পথও ছিল, সেটা অন্তঃপুরের পথ। পারুল পিসীই সে পথে হর্ষকে প্রথম আনে। অবিশ্যি পারুল পিসীর দালানে আসায় কোনই নিষেধ ছিল না. গ্রামের এপাড়া ওপাড়া থেকে আরো অনেক মেয়েরা আসতো। কিন্তু তার বয়সী কোন ছেলেকে আসতে দেখেনি কখনো। একমাত্র শীতকালে যাত্রার পালার সময়, অথবা সঙ্কীর্তনের রাতগুলিতে ছাড়া। দালানের উঠোনটা সাফ হতো এই সময়, লোকজনে গমগম করতো। ডাক্তার দাদা ব্যস্ত পায়ে ছুটোছুটি করে সকলকে অভ্যর্থনা করতেন, যাত্রার দলের অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করতেন, তাদের সুখসুবিধের দিকে নজর রাখতেন। সন্ধ্যের মুখে মুখে মণিকাকা আর তার দু'একজন বন্ধু হ্যাজাক বাতিগুলোয় দম দিতো, ছেলেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো অসীম উৎসাহ নিয়ে। গাড়ি গাড়ি মোলায়েম খড় পেতে গ্যালারি তৈরি হতো, দড়ি টাঙিয়ে আলাদা করা হতো মেয়েদের বসবার জায়গা। সে সব রূপোলী রাতগুলো হর্ষ জীবনে কখনো ভুলবে না। ঘুঙুরের শব্দে, পুঁতির মালা আর হ্যাজাকবাতির উজ্জ্বল সাদা আলোর ঝলকানিতে, টিনের তলোয়ালে, কাঠের গদায় আর মাত্র একবাণ সম্বল রাংতার কাজকরা ধনুকগুলোয়, হারমোনিয়ামের পাঁজর ফাটা সুরে তবলার চাঁটি লেগে সে এক আলাদিনের রাজপ্রাসাদ জমে উঠতো। বুকের ভেতরটা গুড়্ গুড়্ করে উঠতো আনন্দে, উত্তেজনায়।

কিন্তু সে সব দিন গেছে। এখনও অবশ্য ভাঙা হাটে ভাঙা আসরে সে সব দিনের পুনরাবৃত্তি হয় কিন্তু তেমন জমে না। সে সব লোক নেই, সে সব মন নেই।

বাইরের ঘরে আজ আড্ডা বসে নি, তবু কয়েক জোড়া তাস পড়ে রয়েছে সাদা ফরাসটার ওপরে। ডাক্তারদাদা চিত হয়ে শুয়ে কপালের ওপরে হাত রেখে একমনে কড়িকাঠ গুনছেন। তাঁর টাকের ওপরে রোদের আভা চকচক করছে তামার টাটের মত।

উঁকি মেরেই সরে যাচ্ছিল হর্ষ, ডাক্তারদাদা ভারি ঘুমঘুম গলায় হাঁকলেন, কেরে ?

যদিও গ্রামসুদ্ধ সকলের তিনি একবাক্যে ডাক্তারদাদা, তবু বয়স তাঁর চল্লিশের বসবার ঘরে, শিগগিরই পঞ্চাশের দরজা খুলবে। যদিও সব সময়েই হেসে কথা কন, তবু না হাসলে তাঁকে এমন গম্ভীর দেখায় যে কথা বলতে সাহস হয় না, মনে হয় এক্ষুণি ভীষণ একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

হঠাৎ একটা থাপ্পড় কষাবেন না হাত ধরে আদর করে বসাবেন, ডাক্তারদাদা না হাসা পর্যন্ত তা অনুমান করা যায় না। যদিও ডাক্তারদাদা কখনো কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি এবং হর্ষর টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ার সুযোগ নিয়ে সর্বাঙ্গে ডজন দুয়েক ছুঁচ ফোটালেও তাকে তিনি দেখা হলেই আদর করেন, তবু হর্ষ কোন কথাই বলতে পারলো না।

ডাক্তারদা উঠে বসে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে ফেলে বল্লেন, হারুবাবু যে হঠাৎ, কি মনে করে ?

একদম বলার কিছু না পেয়ে লজ্জা পাওয়া গলায় হর্ষ বলে ফেললো, আপনার শরীর ভালো আছে ?

—আমার শরীর ভালো আছে কি না তাই তুমি জানতে এসেছো, ওরে দুষ্টু ছেলে! এসেছো বৌদির কাছে তা আর জানিনা। তা যা, যা না ভেতরে, বৌদিরা বোধ হয় তাস খেলছে। আমার সঙ্গে তো কেবল ছুঁচ আর ওষুধের কারবার—বলেই ফরাশের ওপর থেকে চশমাটা তুলে চোখে পরলেন।

হর্ষ ভেতর মহলে যেতে যেতে কি ভেবে আর একবার পিছন ফিরে দেখলো, ডাক্তারদাদা হাত মুঠো করে হাতের গুলি পরীক্ষা করছেন ঘাড় নিচু করে।

বিমলা বৌদি হাতের তাসগুলো ছাতারে পাখির লেজের মত গোল করে ছড়িয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে রেখেছেন, আর গৌরীদি, বনলতাদি, চিনুপিসী তাঁকে তাসগুলো দেখাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে, তিনি মুখ টিপে শুধু হাসচেন আর বলছেন, ওটি হবে না।

মেয়েদের মধ্যে তাস খেলা তিনিই চালু করেছেন এ গ্রামে। নইলে এই অজ পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা তাস পাবে কোথায়, খেলাই বা শিখবে কার কাছে। তিনি সহরের মেয়ে, ছ-সাত বছর হলো এসেছেন এগ্রামে, আগে থাকতেন পাটনা না কোথায় যেন। মেয়েরা সবাই তাঁকে ভীষণ ভালোবাসে, সেলাইয়ের নাম করে লুকিয়ে চলে আসে যে যার বাড়ি থেকে।

শান্তিপিসী জানালার ধারে বসে সেলাই করছিল, মুখ তুলেই হর্ষকে দেখতে পেল। হর্ষ শান্তিপিসীকে ইসারায় বাইরে ডাকলো। সেলাইটা হাতে করেই অবাক শান্তিপিসী বাইরে এসে দাঁড়ালো, কি রে, কি ব্যাপার ?

—কিছু না, তুমি ওদিকে এসো একটু।

পিছনদিকার আমগাছতলাটা আঙুল দিয়ে দেখালো।

গাছতলায় গিয়ে বিনা ভূমিকায় হর্ষ পকেট থেকে খামখানা বার করে বললো, তোমার চিঠি।

দেখি দেখি বলে শান্তিপিসী প্রায় ছোঁ মেরে খামখানা তার হাত থেকে নিয়ে নিল। সেই নাম ঠিকানা বিহীন খামখানার মধ্যে চিঠিও থাকতে পারে, টাকাও থাকতে পারে, সঠিক করে হর্ষ কিছুই জানতো না। তবু চিঠি মনে করেই শান্তিপিসী খামখানা হাতে তুলে নিল, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে হর্ষর হাতে ফের ফিরিয়ে দিল। মুখখানা রাগ-রাগ।

হর্ষ হেসে ফেললো। শান্তিপিসী সাদা খাম দেখে রেগে গেছে, ভেবেছে সে ঠাট্টা করেছে। ঠাট্টা করলে শান্তিপিসী ভীষণ রেগে যায়, মণিকাকা একদিন ঠাট্টা করেছিল। লুকিয়ে দেখেছে হর্ষ।

—কী হল, নেবেনা তোমার চিঠি?

—না। ভারি গলায় স্পষ্ট জবাব এলো।

—কে দিয়েছে না জেনেই তুমি নেবেনা। সত্যি বলছি এটা তোমারই—

—খবর্দার বলো! নিচু ডাল থেকে একটা আমের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে শান্তিপিসী রেগে উঠলো,—যা বলছি, চলে যা এখান থেকে।

শান্তিপিসী কখনো রাগে না বরং সব সময়ই দুষ্টু দুষ্টু হাসে কিন্তু আজ কি হলো। নিচের ঠোঁটের তিলটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হলো হর্ষ। মণিকাকা যে কত করে বলেছিল, কিন্তু না নিলে সেই বা কি করবে। এমন যে হবে আগে কি ভেবেছে একবারও।

ভীষণ রাগ আর অভিমান হলো শান্তিপিসীর ওপর। কি অন্যায় সে করেছে যে ধমক দেবে তাকে। নেবে না তো নেবে না, বয়েই গেছে তার। তেঁতুল তলায় এক হাত গর্ত করে পুঁতে রাখবে। মণিকাকা তো সবই জানতে পেরেছে এতক্ষণে। হর্ষর কোন দোষ নেই কিন্তু। ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছিল, শান্তিপিসীর গলা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে রাগ করে?

সর্বাঙ্গ গরমবালুর মত চিটমিট করে উঠলো রাগে, দাঁতে দাঁতে চেপে পিছন ফরে দাঁড়িয়েই বললো, বাড়ি যাচ্ছি, কেন কি দরকার?

একটা নরম হাতের চাপড় এসে পড়লো কাঁধের ওপর, ঠুন ঠুন করে উঠলো কাঁচের দুগাছা চুড়ি,—কি দরকার? হুঁ, খুবই রাগ হয়েছে মানিকের দেখছি।

—যাও ভালো লাগে না। কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে দিল এক ঝট্‌কায়।

—দে ।

সরাসরি হাত বাড়ালো শান্তিপিসী, একটু একটু কাঁপছে হাতটা, বেশী রকম কেটে গেলে যেমন কাঁপে।

হর্ষ কিছু বলবার অবকাশ পেল না। খামখানা শান্তিপিসীর হাতের মধ্যে গুঁজে দিতেই কান্নার সুরে ফুঁপিয়ে উঠলো শান্তিপিসী, কেন নিলি তুই এটা মহিমদার কাছ থেকে, কেন, কেন !

হর্ষ চমকে উঠলো।

বাড়িতেও মাঝে মাঝে এমনি হয়। কোন একটা করুণ ঘটনার সূত্র ধরে মনটা তার ঘুড়ির মত মেঘের রাজ্যে উঠে যায়। আবছা আবছা চৈতন্য নিয়ে হর্ষ জেগে বসে থাকে, বর্ষাঘনঘোর দুপুরের মত চারপাশ ধীরে ধীরে মুছে যায়। সময় হারিয়ে যায়, সম্বিত হারিয়ে যায়। কত কালের ভুলে যাওয়া ঘটনা, কত সুখ-দুঃখের কথা একে একে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

আজও তেমনি হলো। তিনসারি দিয়ে ছেলেরা বসেছে ঘরের মধ্যে। সামনের চেয়ারে ছুটির আগের ঘণ্টার মৌলবী সাহেব। দরজা দিয়ে এক ঝলক সোনালী আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের ওপর। একটা পাকা দাড়ি বিশ্রী ভাবে চিকচিক করছে। আশেপাশের ক্লাসে গোলমাল হচ্ছে, তাদের ক্লাসে গুঞ্জন।

ক্যামেরার লেন্সে ধরা ছায়ার মত সব মিশিয়ে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসা একটা আবছা ছবি হর্ষর চোখের সামনে ভাসছে। আর কিছু না।

আজ সকাল বেলা স্কুলে আসবার একটু আগে মন্দিরার ছাগলটা মারা গেল। ছাগলটা যে মারা যাবে একথা সে অনেক আগেই টের পেয়েছিল। তবু সকালে যখন সত্যি সত্যিই মারা গেল তখন মনটা তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। ঘর থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠোনে নামতে গিয়ে সেই যে মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠলো না ছাগলটা। নাভিশ্বাস কাঁপা হাড়জিরজিরে শরীরটা স্থির হয়ে যেতেই মন্দিরা ছাগলটার ওপর উপুড় হয়ে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

মানুষও এমনি করেই হঠাৎ একদিন মরে যায়। মরে গেলে আর ফিরে আসে না। তবু না মারা যাওয়া পর্যন্ত মানুষকে আমরা ততো ভালো বাসিনা, ততো সুন্দর করে মনের মধ্যে ভাবি না। মণিকাকার কথাই তো সব প্রথমে মনে হয় এ ব্যাপারে। তারপরে মনে পড়ে জেলে পাড়ার, কাপালি পাড়ার, ছুতোর পাড়ার চেনা আধ-চেনা ছেলে মেয়ে বুড়োদের কথা যারা এই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে তিলে তিলে না খেয়ে খেয়ে মরেছে কিংবা খিদেই যাদের তিল তিল করে খেয়েছে। যেমন পদ্মার চোরা খড়্গের মত ধারাল জল মাটির তলাটা দু-ফাঁক করে খেয়ে দেয়, গাছ পালা ক্ষেতখামার বাড়িঘর নিয়ে পাড়ি ভেঙে পড়ে তারপর হঠাৎ একদিন।

ওদের খিদেও তেমনি দেখা যায় নি, শুধু ব্যথাটা দেখা গেছে। পা ফুলেছে, চোখ গর্তে ঢুকেছে, কথা নাকি-নাকি হয়েছে। ঘরের চাল, গায়ের গয়না,

ঘটি বাটি বিক্রী করেও শেষ পর্যন্ত পেট ভরেনি। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, শামা ঘাসের দানা, কচুমূল, বেত গাছ, গাবের পাতা সব খেয়েও।

বাড়ি থেকে স্কুলে আসার এই তিন মাইল রাস্তাটা ওই কথাই ভেবেছে বারবার। বাঁশবনের পথটাও আজ গায়ে কাঁটা দেয় নি। বুনো শুয়োরের ভয় গাছের শুকনো পাতা পড়ার শব্দে উস্কে ওঠেনি বুকের মধ্যে।

ক্লাসে এসে মনটা কেমন যেন কান্না পাওয়া উদাস ভাব নিয়েছে। কানে আসছে না কিছু, চোখে পড়ছে না কিছু স্পষ্ট করে।

বাবার কথাটা আবার মনে পড়লো। কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেছে একদম। বাড়িগুলোতে লোকজনের চেয়ে তালাই ঝোলে বেশী। পাগলা কুকুরের কান্নার মত, কিছুটা ডাকের মার মন্ত্র পড়ার মত সাইরেন বেজে উঠে মধ্যে মধ্যে। আর অমনি রাত্রির অন্ধকার ফাটলের মধ্যে টুক করে কলকাতা সহরটা একটা ছুঁচের মত হারিয়ে যায়। একটা আলোর রেখা আসে না কোথা থেকে। ত্রিশূলের মত ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেনগুলো আকাশ কাঁপিয়ে উড়ে চলে যায়। দমবন্ধ ভয়।

কদিন আগের চিঠিতে বাবা লিখেছেন, মনে হয় রক্তের মধ্যেও প্লেনের ঘর্ঘর শব্দ মিশে গেছে। প্রায়ই মনে হয় মৃত্যু বুঝি অত্যন্ত কাছে এসে গেছে আমাদের। বেশ লাগে।

এই বেশ লাগে কথাটাই বাবাকে অস্পষ্ট করে দেয় একেবারে। ঐ কথাটার জন্যই বাবাকে যেন আর ভাবতে পারে না হর্ষ।

পারুলপিসীও এমনি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার রাঙা চেলির মধ্যে। তার থমথমে মুখের দিকে, পদ্মপাপড়ির মত ঈষৎ রাঙা চোখের দিকে চেয়ে সেদিনও নিজেকে এমনি মূর্খ মনে হয়েছিল তার। পারুলপিসী, তুমি যে বলেছিলে আমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারবে না! সে কি মিছে কথা, সে কি বানিয়ে বলেছিলে ?

—কই বলো ? ভাঙা গলার গর্জন শোনা গেল মৌলবীর।

ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে ওঠে হর্ষ, মৌলবী সাহেব শাইলকের মত নিষ্ঠুর আনন্দে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে জোড়া বেত গাছা। কি প্রশ্ন করেছেন জানবার কৌতূহল উপে গেল তার, অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করলো হাত পেতে।

আতঙ্কে শিউরে উঠেই চমকে গেল হর্ষ! একি! কাকে বেত মারলেন মৌলবী ? সেইতো হাত পেতে ছিল। আর বেত জোড়াও উঠেছিল ঠিক তাকে লক্ষ্য করেই। ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে ছিল মাত্র এক পলকের জন্য।

—হাত পাত।—মৌলবী গর্জে উঠলেন হর্ষকে হাত গুটিয়ে নিতে দেখে।

আবার হাত পাতলো। ক্রুদ্ধ বেত আবার হাওয়ায় নেচে উঠলো হিসহিসিয়ে, ঠিক সাপের জিভের মত, দাঁতের ছোবলটা আসছে তার পরের মুহূর্তেই! ভয়ে চোখের পলক পড়লো হর্ষর। সপাং!

এবারেও বিমূঢ় হয়ে গেল সে, তার হয়ে হাত সাফাই করে মার চুরি করছে কে? বেত কিন্তু থামলো না। কাতরোক্তি শ্রবণ না করা পর্যন্ত মৌলবীর স্বভাবতই তৃপ্তি হয় না, ক্রোধ নামক পারদ দ্রব্যটি তাঁর মাথায় ক্রমাগত চড়তেই থাকে। বেত নেচে চলেছে জোড়া পায়ে কথাকলির মত, হর্ষও হাত পেতে আছে মুখে চোখে কুঞ্চন মাত্র নেই। কিন্তু লজ্জায় ভয়ে সর্বাঙ্গ পাষাণ হয়ে গেছে, এক চুল নড়বার যো নেই।

ক্লাস সুদ্ধ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কেউ একটা কথা বলতে পারেনি, একটা ঢোঁক গিলতে পর্যন্ত না। তারপর ইয়াকুবের হাত ফেটে যখন ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়িয়ে পড়লো তখন মৌলবী চোখ কপালে তুলে থেমে গেলেন। ইয়ে আল্লা! এ কি করেছেন তিনি? যে ইয়াকুবের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক কোনদিন পড়া ধরে পর্যন্ত বিরক্ত করেন না তিনি, তাকেই কিনা এতক্ষণ ধরে—। কিন্তু ইয়াকুব যে প্রতিবার বেত মারবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তা তিনি কি করে জানবেন। হর্ষই দেখতে পেয়েছে কত পরে, কিন্তু তখন ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গেছে যে হর্ষ কথা বলতে সাহস করেনি পাছে ছেলেটির ওপর চরম নির্যাতন হয়।

দাঁতে দাঁত চেপে বসে ছিল ইয়াকুব, সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেত মারবার সময় মৌলবীর চর্বির আস্তর লাগা মুখখানা বিকৃত হয়ে চোখ বুজে আসে, এই মুদ্রাদোষটা ইয়াকুবের অজানা ছিল না।

এই ঘটনার পর মৌলবী আর ক্লাস নিলেন না। ইয়াকুবের হাত ধরে অত্যন্ত বিচলিত মুখে অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ইয়াকুবের এই প্রথম পরিচয় পেল হর্ষ, অন্তরের পরিচয়। ক্লাসে এসে প্রথম দিন থেকেই ফর্সা রং, শৌখিন, গোলগাল চেহারা এই ছেলেটির দিকে তার দৃষ্টি পড়েছিল। পাজামা পাঞ্জাবী আর মাথায় ফেজ টুপী পরে স্কুলে আসতো ইয়াকুব। অন্য মুসলমান ছাত্রদের মত সে কোনদিনই লুঙ্গি পরে আসতো না। আর তার রংটা ছিল আশ্চর্য রকমের ফর্সা।

বয়সে হর্ষর চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হলেও এই বয়সেই ইয়াকুবের বিয়ে হওয়াটা ক্লাসের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেদের কাছে কি করে রটে গিয়েছিল ইয়াকুবের নাকি ফুটফুটে সুন্দরী একটা বউ আছে। ব্যাস্! সকলে সর্বক্ষণ অমনি তার পিছনে আলপিনের মত লেগে আছে। ইয়াকুব বড় ঘরের ছেলে, স্বভাবটাও বড় লাজুক। নিজে থেকে কারো সঙ্গে কথা বলতে চাইত না। সেটা তার অহঙ্কার নয় তা বেশ

বোঝা যেত। কিন্তু চুপ করে থেকে বেচারীর বিপদ বাড়তো আরো বেশী। সে যে ক্লাসে বসে সব সময় তার বউয়ের কথাই ভাবছে এ সিদ্ধান্তে সবাই একবাক্যে পেঁৗছাতো, আর তার ফলেই দু:সহ ঠাট্টা ভোগ করতে হতো ক্লাসে বসে।

ইয়াকুবের জন্য দু:খ হতো হর্ষর। ক্লাসে নিজেও সে একলা। নিজেও সে চুপচাপ থাকে কিন্তু তার পিছনে লাগেনি কেউ। ইয়াকুবের পিছনেও লাগতো না নিশ্চয়, যদি তার এই বয়সে বিয়ে না হোত। তবু এই ছেলেদের সঙ্গে তার মন একটুও মিল খুঁজে পায় না। এদের রসিকতা, এদের আনন্দ বোকার মত। মোটা ধরণের। দু-একটা কথা যদি কখনো হয়েছে ইয়াকুবের সঙ্গেই হয়েছে। ইয়াকুব যে মনে মনে হর্ষকে ভালোবেসেছে, আজই প্রমাণ দিল তার। কিন্তু কেন দিল, কতটুকু আলাপ হয়েছে তাদের মধ্যে, যে এমন ? হর্ষর মনে আবার এই বাজে ভাবনাটা উঁকি দিল।

কিন্তু কিরণদাও উঁকি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

বাড়ি ফিরবার আগে রোজ পোষ্টঅফিস হয়ে যেতো ওরা। তিন চারখানা গ্রামের এই একমাত্র পোষ্টঅফিস। একজন মাত্র পিওন। চিঠি বিলি হতে পুরো একদিন সময় খুব কম করেই লাগে। তাই সাগতা গ্রাম থেকে কেউ কোন উপলক্ষ্যে একবার পবাণপুর গেলে অমনি পোষ্টঅফিসটাও ঘুরে আসতে ভোলে না। হর্ষদের আরো সুবিধে, একেবারে স্কুলের গায়েই পোষ্টঅফিস। প্রায় প্রতিদিনই এপাড়ার ওপাড়ার দু-চারখানা চিঠি সঙ্গে আনে পোষ্ট করবার জন্য।

সেদিন পোষ্টঅফিসে গিয়ে দেখা গেল কিরণদার বই এসে পেঁৗছেচে কলকাতা থেকে। ওইখানেই পার্শেল খোলা হলো। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে একখানা রোমাঞ্চকর গল্পের বইও এসেছে। মলাটখানা দেখামাত্র কিরণদার মুখ চোখের অবস্থা এমন পাল্টে গেল যে, কিরণদা এই বইখানার জন্যই রোজ এত আগ্রহ করে ডাকঘরে ঘুরে যেতেন তা বুঝতে বাকি থাকলো না।

এধরণের গল্পের বই আগে কখনো চোখেও দেখেনি। গল্প যা কিছু বাবার মুখেই শুনেছে এতদিন। বইখানার মলাট যেমন রঙচঙে ছবিতে ভয়ঙ্কর, নামটাও তেমনি, যখের ধন। যখ কথাটা শুনলেই দালানে যাবার পথের বড় পুকুরটার কথা মনে পড়ে যায়। নীলবর্ণ জল। কিন্তু পুকুরের মুখ সহজে দেখবার উপায় নেই। কাবুলীওলার মুখের মত চারপাশে নিরেট জঙ্গল গজিয়েছে। বেত আশশেওড়া খেজুর ফণিমনসা নল, কি নেই। চারপাশের উঁচু পাড়টা একেবারে ঠাসাঠাসি গাছ আর আগাছায়। চান করতে আসে না কেউ। শুধু দিলু মিঞা মাছ ধরতে আসে নিয়মিত, বৃন্দাবনও মধ্যে মধ্যে। আর নীল পুজোর সময় বছরে একবার পাটঠাকুর ডোবানো হয় বড়পুকুরে। গল্প আছে, এই পুকুরে নাকি যখের সিন্দুক আছে।

সে ভগবান পালের কাহিনী, দালান বাড়িরটা যাঁর তৈরী। সে কোন যুগের কথা, জটিবুড়ী হয়ত তখনও জন্মায়নি। ভগবান পাল মরবার আগে নাকি তাঁর সমস্ত ধনরত্ন সুদ্ধু এক গরীব বামুনকে মন্ত্রঃপূত লোহার সিন্দুকে ভরে অমাবস্যার গভীর রাত্তিরে নামিয়ে দিয়েছিলেন ঐ পুকুরের অতল গর্ভে। সিন্দুকের সঙ্গে ভূতুড়ে শিকল আছে একটা, জলে ডুব দিয়ে কান পাতলে তার ঝুমুর ঝুমুর শব্দ শোনা যায়। ঠিক পাতালের দিক থেকে আসে আওয়াজটা, মণিকাকা পর্যন্ত বলেছিল কথাটা।

শান্তিপিসীর মুখে শুনেছে একবার এক জেলে বউ ঠিক দুপুরবেলায় ঘাটে এসেছিল মাছ ধুতে। সিন্দুকটা নাকি তার পায়ে শেকল জড়িয়ে কোন অতলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সারা পুকুরে জাল ফেলেও আর বউটার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

যখের ধন বইটার নাম তাই দক্ষিণপাড়ার পুকুরটার মতই রহস্যময়।

তাদের গ্রামের একটা ছেলে চিঠির খোঁজ নিতে পোষ্টঅফিসে এসেছিল, ঠিক হল একসঙ্গেই ফিরবে, আর সারা পথ যাওয়া হবে বই পড়তে পড়তে। কিরণদা ক্লাস টেনে পড়েন বলে তাঁকেই বই পড়ার সম্মানটা দেওয়া হলো।

বাঁশবনের সঙ্কটপথ পার হয়ে ছোট নদীর সাঁকোটা ডিঙিয়ে পদ্মবিলের কাছে এসে বই পড়া শুরু হলো। পায়ের নিচে ক্যাম্বিসের বলের মত নরম পুরু ঘাসের পথ। দুপাশে মধ্যে মধ্যে বাবলাগাছ সজারুর মত কাঁটা গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনমানব নেই। তিনজনে শামুকের মত ধীর পায়ে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। কিরণদার ছাতা আর বই সেই ছেলেটার হাতে। কিরণদা যখের ধন পড়ে চলেছেন চেঁচিয়ে একটানা। সামনে বাঁ দিকে প্রায় মাইলখানেক একটানা রাইসরষের ক্ষেতে ফুল ফুটে রয়েছে। যেন বাসন্তী রঙের গালিচা পাতা, চোখ জুড়িয়ে যায় তাকালে। ডান দিকে ধান কাটা মাঠ ধূধূ করছে।

গল্পটা রহস্যে ভারি হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। মনটা একেবারে পৌঁছে গেছে করালীচরণের আশে পাশে। সংকেত লেখা মড়ার মাথার খুলিটা কেবলি মনে হচ্ছে পথের আশেপাশে কোথাও পড়ে রয়েছে, তাকালেই হয়ত চোখে পড়বে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

একেবারে গাঢ় বিকেলে গ্রামে এসে পৌঁছালো তারা, বই কিন্তু শেষ হলো না। মনের মধ্যে একটা তারপর-কি-হলো কৌতূহল নিয়ে বাড়ি ফিরলো হর্ষ। বারবাড়ির এবং সদরের প্রকাণ্ড উঠোন দুটো ধানের মড়াইতে ঢাকা পড়ে গেছে। দেড়মানুষ দুমানুষ উঁচু ধানের পালার মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা সরু গলি, ঠিক মনে হয় খাইবারপাস দিয়ে যাচ্ছে। শুধু

একটা সুগন্ধ নাকে ভেসে আসবে সদ্য কেটে আনা খড়ের আর পাকা ধানের। আবছা আবছা কিন্তু ভারি। শিশির পড়লে গন্ধটা আরো খোলে। তখন শালিক গান গায় ধানের পালার চূড়োর ওপর বসে।

ভীষণ ঘুম পেল হর্ষর, হাঁটু দুটো ভেঙে আসছে ক্লান্তিতে। ইচ্ছে হলো বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এখানেই নরম খড়ের ওমের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর একবার ঘুমিয়ে পড়লে তার কোন ভয় নেই, দুঃখ নেই, ভাবনা নেই। মা হয়ত লণ্ঠনের আলোয় তাকে খুঁজে পেয়ে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাবেন আর বলতে থাকবেন, এখন কি আর এত বড় ছেলেকে কোলে করতে পারি, এখন কি আর এভাবে নিয়ে যাওয়া আমার সাধ্যি। হর্ষ কিছুই জানবে না, যদি তাকে দুহাত ধরে হাঁটিয়েও নিয়ে যায় কেউ, তবুও না। কাল সকালে অবশ্য মন্দিরা বলবে সব কথা।

—এখানে আবার তুই কি করছিস? শান্তিপিসী হঠাৎ এসে পড়ে অবাক হলো, ইস্কুল থেকে কখন ফেরা হয়েছে? কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল শান্তিপিসী একটু যেন ঘাবড়ে গিয়েই।

প্রথমটা চমকে গেলেও শান্তিপিসীর রকম সকম দেখে হর্ষ ফিক করে হেসে ফেললো একটু।

—আমার কিছুই হয়নি তো। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

—ধ্যেৎ। শান্তিপিসী ওর পিঠে একটা চড় মেরে বললো, যাত্রা দেখতে যাবিনে?

—যাত্রা? ঘুমছাট চোখে হর্ষ খাড়া হয়ে দাঁড়ালো, যাত্রা। কোথায়? কখন? কবে?

—দালানে। কলকাতা থেকে দল এসেছে যে। ডাক্তারদা চিঠি লিখে আনিয়েছেন, বিমলা বৌদির খুব ইচ্ছে এবার কলকাতার দল আসে, তাই এক সপ্তাহ যাত্রা হবে দালানে, আজ থেকে শুরু।

শান্তিপিসী এক নিশ্বাসে সবটুকু বলে গেল, খুশী ভরা গলায়। রামায়ণের গোটা কাহিনী কদিন ধরে পালায় পালায় ভাগ করে হবে। শেষ দিন নাকি গ্রামের ছেলেরা, মানে কাকার বন্ধুরা ওদের সাজ পোষাক ধার নিয়ে নিজেরাই যাত্রা করবে। ভারি মজা সেদিন হবে।

—নে ঘরে চল। বৌদিকে বলে রাজি করাতে হবে আগে।

—কিন্তু বড়কাকা? আপশোষ মাখা গলায় হর্ষ জানালো।

—ভাবনা নেই। একটা হাত ধরে টানতে টানতে শান্তি বলে।

বড় কাকার কিন্তু একটা গুণ আছে, যাত্রা কিংবা হরির লুটের দিন হলে দালান বাড়িতে যাওয়া কিছু দোষের মনে করেন না। বজ্র আঁটুনির একটা ফস্কা গেরোও থাকে, শান্তিপিসী বলতেই কাজ হলো।

সন্ধ্যে সন্ধ্যের মধ্যেই রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে দল বেঁধে রওনা হলো, সঙ্গে একটা নেভানো লণ্ঠন, ফেরার মুখে কাজে লাগবে। দল মানে পাড়ার বৌ মেয়ের দল। মন্দিরা আর মা শুধু গেলেন না। বড়োকাকা নিজেই এগিয়ে দিলেন পুকুরপারের পথটা। তবু গা ছমছম করলো, সকলের মাঝে মাঝে হেঁটেও। কিন্তু তারপর ?

তারপর আলোয় আলোয় একাকার। সে আলো জোনাকীর নয়, তারার নয়, লণ্ঠনেরও নয়। হ্যাজাকের। বছরে দু চারদিনের বেশী যার আলো দেখতে পাওয়া যায় না এ গ্রামে। আলোর তদারক করছিল নীলকান্ত কাকা। মণিকাকা নেই, কথাটা বেশী করে মনে পড়লো, মণিকাকা থাকলে কি আর ঘোষেদের বাড়ির নীলকান্ত কাকা। হে:।

তা যাই হোক, নীলকান্ত কাকাব মুখখানা দিব্যি নীলকান্ত হয়ে উঠেছে হ্যাজাকের পান্‌শে নীল আলোয়। দালান আর সে দালান নেই। গেরুয়া আর সর্ষে ফুলের রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকোর পাল জোড়া দিয়ে চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে, একেবারে দালানের ছাদ থেকে শুরু করে গোটা উঠোনের আকাশটা ঢেকে দিয়েছে। কোথায় বিলিতি গাবের গাছ, আর কোথায় কি ? শুধু বটগাছটা দেখা যায় একটু দূরে অন্ধকারের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে যেন মাথা চুলকোচ্ছে আর মুচকি হাসছে।

কিন্তু উঠোনটাই কি আর চেনা যায় ? তকতক করছে গোবরজলে নিকোনো, ঝকঝক করছে তার ওপর আলপনা পড়ে। একটা কাঁটানটে গাছ কি বুনো ঘাসের ঝুঁটি নেই কোনখানে উঁচু হয়ে। খড়, নরম খড় পাটাতনের মত, বিছানার তোষকের মত করে চারপাশে বিছানো হয়েছে। মাঝখানে জ্যামিতির চতুর্ভুজের মত জায়গাটা দড়ি দিয়ে ঘেরা। দালানের বারান্দায় গাঁয়ের ভদ্র লোকের বৌ-মেয়েরা ঠিক বাবুই পাখির মতই ঠাসাঠাসি করে বসেছে, আর হাতমুখ নেড়ে অনর্গল কথা বলছে।

যাত্রার দেরী আছে, ডুগি তবলা বেহালা হারমোনিয়ম নিয়ে, ফুলের মালা গলায় পরে গায়েনরাই এখন পর্যন্ত আসরের ফরাশের ওপর সার বেঁধে বসেনি। অধিকারীই হবে বোধ হয় মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা লোকটা, ব্যস্ত ভাবে সাজঘরের দিকে যেতে যেতে থমকে গিয়ে জোড়হাতে কাকে নমস্কার করলো।

নমস্কৃতের দিকে তাকাতে গিয়েই হর্ষ হোঁচট খেলো একটা খুঁটোর সঙ্গে, শান্তিপিসী ধরে না ফেললে বিমলা বৌদির সামনে বিস্তর লজ্জা পেতে হতো। কারণ অধিকারীর নমস্কারের উত্তরে তাঁর হাতদুটো যুক্তাক্ষরের মত বুকের কাছ বরাবর তোলা থাকলেও চোখদুটো আচমকা হর্ষর অবাক মুখের ওপর এসে পড়েছিল।

রূপকথার পাটরাণীর মত সেজেছেন বিমলা বৌদি, এত গয়না, এত দামী কাপড় কেন জানি লজ্জা করে দেখলে। সবাইয়ের মাঝখানে থেকে আলাদা মনে হলেই লজ্জা করে তার, বিমলা বৌদিকে আলাদা মনে হচ্ছে। কাকীমার কথাটা মনে পড়ে যেতেই আরো লজ্জা করলো হর্ষর, কবে শুনেছে কিন্তু ভোলেনি, আশ্চর্য।

একটা তীর ধনুক নিয়ে পাছ দুয়োরের উঠোনে লুকিয়ে লুকিয়ে একটি শালিক পাখিকে তাগ করছিল এমন সময় রান্নাঘরে কাকীমার গলা শোনা গেল। মার সঙ্গে কথা বলছেন।

—যাই বলুন দিদি, ডাক্তার বৌয়ের এত ঢঙ্ ভালো লাগে না, সব সময় সেজে গুজে রঙের বিবিটি হয়ে আছেন, আর পাড়ার মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছেন চিবিয়ে চিবিয়ে।

—আহা অমন কথা বলিসনি, ছেলেমানুষ। সহরের মেয়ে এসে পড়েছে অজ পাড়াগাঁয়ে। একটু শখ আমোদ নিয়ে থাকে বৈ তো না, তা ছেলেপিলে হলেই দেখবি —

কাকীমা উত্তেজিত গলায় বাধা দিলেন, আর ছেলেপুলে হয়েছে, সাত বছর পার হয়ে গেল, না দিদি, ওসব মেয়ে—কাকীমার গলাটা পেন্সিলের শীষের মত সরু হতে হতে মিলিয়ে গেল, আর শোনা গেল না।

শালিক পাখিটাকে আর তীর মারা হলো না, সেটা উড়ে গেল, কিন্তু ব্যাধ নড়লো না এক পা-ও। মার মমতাময় কণ্ঠ শোনা গেল একটু পরেই, বোধ হয় একটা ছোট্ট ভারি নিশ্বাস ফেলে মা কথা বললেন, হবে রে হবে, দেখে নিস। আমার হর্ষও তো দশ বছর পরে হয়েছিল, কেউ আশা করেনি আর হবে—

একটু থেমে সেই সব দিনের কথা বোধ হয় ভেবে নিলেন এক ঝলক, তারপর রোগা, দুর্বল, থামা থামা গলায় নিজের মনেই মা বলে চললেন, সে এক দিন গিয়েছে আমার—কত বাঁকা চাউনি, কত ফিসফাস কথা, ঘাটে জল আনতে গেলে কানে আসতো। ভোর বেলায় কারো সামনে পড়ে গেলে মুখ বাঁকাতো, দিনটাই বুঝি তার মাটি হলো। এদিকে আমার যে কত দুঃখ কত ব্যথা! রাত্তির বেলায় বিছানায় শুয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ঠাকুরকে বলতুম, ঠাকুর—

ব্যস, ব্যাধের বুকের ভেতরটা টন্‌টনিয়ে উঠেছে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি, মা এবার নিশ্চয় কাঁদবেন।

সেই রঙেরবিবি কথাটা বিমলা বৌদিকে দেখবামাত্র মনে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো লজ্জায় ভারি হয়ে গেল, তাকাতে পারলো না। মনে হলো তার পিছনে আসতে আসতে কাকীমা নিশ্চয় কথাটা আবার মনে মনে উচ্চারণ করছেন।

বিমলা বৌদি বেশ খাতির করে নিজের পাশে তাদের সকলকে বসালেন, সেই মোলায়েম কচিকলাপাতা রংয়ের কম্বলটার ওপর। কাকীমা একটু দূরেই বসে পড়ে একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে পুরনো আলাপ শুরু করলেন দেখে বিমলা বৌদি শুধু একটু মুচকি হাসলেন।

কম্বলের ওপর থেকে একটা পশমের হাত ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে তার ভেতর থেকে একটুখানি করে সাদা তুলো বের করে শান্তিপিসী আর হর্ষর হাতে গুঁজে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর গন্ধ বেরলো, খুব চেনা কি একটা ফুলের গন্ধ। হর্ষ একবার সুগন্ধি তুলোটা শুঁকে পকেটে রেখে দিল।

শান্তিপিসীর খুব আহ্লাদ হয়েছে মনে হলো। নাকের সামনে ধরে গোটা দুই লম্বা নিশ্বাস নিয়ে হর্ষর গায়ে একটা খোঁচা দিয়ে চাপা খুশীধরা গলায় বললো, এসেন্স।

বড়ো কাকার মত গম্ভীর গলায় ও বললো, না আতর।

শান্তিপিসী ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, না।

—বেশ, না তো না। আসরের দিকে ভুরু কুঁচকে ও তাকিয়ে রইল পারুলপিসীর মত। একটু পরেই ভুলে গেল সে রাগ করেছে। এলোমেলো হিজিবিজি কতকি চিন্তায় মনটা ভরে উঠলো কিরণদার রাফখাতার পাতার মত।

লাল রঙটা ঝাল না মিষ্টি, এই অমীমাংসিত পুরনো প্রশ্নটা আবার ভাবতে থাকলো। একপয়সায় একটা দিল্লীকা লাড্ডুর কথা ছেড়ে দিলে ঝালের পক্ষেই মনটা সায় দেয় বেশী। বিমলা বৌদির ঠোঁটটা নিশ্চয়ই ঝাল হয়েছে তা হলে, যা টুকটুকে লাল রং মেখেছেন। উঠোনের লঙ্কাগাছটার কথা মনে পড়ে যায়, কুচকুচে পাতার ভেতর এক একটি লঙ্কা পেকেছে টুকটুকে হয়ে। গাছের ডালে পাকা লঙ্কা দেখলে যা আনন্দ হয় ওর, ডালিমের ফুল দেখলেও অতটা হয় না, ফুলের আবার অত বাহাদুরি কি আছে। তাকে তো একটা রঙের হতেই হবে, সুন্দর হতেই হবে। এতে আর আশ্চর্যটা কি? কিন্তু অমন যে বাঘা লঙ্কাটা, তার রং কিনা ডালিমের ফুলকেও হার মানায়। আরো যখন ছোট ছিল ভাবতো এই পাকা লঙ্কা গুলোই মরে গিয়ে পরের পরের পরের জন্মে এক একটা রবিবার হয়ে জন্মায়। তখনো রঙটা থাকে তেমনি লাল।

বুক পকেট থেকে সুগন্ধটা ফের নাকে এলো। শান্তিপিসী লুকিয়ে লুকিয়ে আতরটা এখনো শুঁকছে, ভেবেছে হর্ষ দেখতে পায়নি। পায়নি আবার। হর্ষকে কেন যে সকলে বোকা ভাবে, ভাবে কিছুটি বুঝতে পারেনা, সেত্যি। ওই তো বিমলা বৌদি মাঝে মাঝে তাকে দেখছেন, ভেবেছেন বুঝি হর্ষও অমনি আতরটা বের করে শুঁকবে। হর্ষকে তেমন

পাওনি। তবে বিমলা বৌদি সত্যি সত্যি তাকে খাতির করেছেন, কই আর কাউকে তো আতর দেন নি কাছে ডেকে।

অবিশ্যি সকলেই তাকে ভালবাসে, খাতির করে, বামুন বাড়ির ছেলে বলে। বিশেষ করে শিবশঙ্কর, তার নিজের ঠাকুর্দার নাম সকলের মুখেই যে পরিমাণ সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাতে বুঝতে পারে তিনি খুবই একজন গুণী লোক ছিলেন। যদিও এগাঁয়ে তিনি কোন দিনই বাস করেন নি, বরাবর পাবনা টাউনেই বাসা করে কাটিয়েছেন। তিনি মারা যাবার পরই বাবা তাঁর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে দেশের বাড়িতে এসে ওঠেন। অথচ শুধু এই গাঁয়েই নয়, পরানপুরে পর্যন্ত তাঁর নাম কে না জানে। স্কুলের হেডমাষ্টার বিরিঞ্চি-বাবু থেকে শুরু করে পোষ্টমাষ্টার হরিদাসবাবু পর্যন্ত তাকে দেখলেই খুশী হয়ে ওঠেন, সে তো ঠাকুর্দার জন্যই। কিন্তু ঠাকুর্দার কেন যে এত নাম তা তার মাথায় আসে না। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নেই। এই সাগতার বাড়িতেই বড় বড় দুটো আলমারী ঠাসা তাঁর বই রয়েছে। এ নাকি অর্ধেকও নয়, পাবনা থেকে আনা হয়ে ওঠেনি সব বই। এনেই বা কি ছাই হতো! কেউ তো পড়ে না, আলমারী পর্যন্ত খোলেনা কোনদিন। সে নিজে অবশ্য একদিন খুলে দেখেছিল চুপিচুপি। সবই মোটামোটা ইংরেজী বই, বোকার মত আবার বন্ধ করে রেখেছে তক্ষুনি। কিন্তু শুধু এই জন্যেই কি ঠাকুর্দাকে সকলে চেনে? কে জানে?

বাজনা বেজে উঠলো। এবার যাত্রা আরম্ভ হবে। গোঁপ কামানো সখীর দল গান গাইতে গাইতে আসরে ঢুকে পড়লো। সবাই নড়ে চড়ে বসলো সজাগ হয়ে। দশরথ সাজঘরের দরজার চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে বকের মত লম্বা করে গলাটা বাড়িয়ে দিয়েই আবার সুড়ুৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভেতরে। হর্ষ ঠিক দেখতে পেয়ে গেল তক্ষুনি।

একটা খেজুর পাতা তীরের মত এসে হর্ষর কোটের বুক পকেটে বিঁধে গেল। ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ ছুঁড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যেই ছুঁড়ুক তার হাতের টিপ অব্যর্থ। কৌশলও অসামান্য। সামান্য একটা খেজুর পাতাকে দুহাতের মাঝের আঙুলের সাহায্যে, এমন নির্ভুলভাবে ছুঁড়তে পারা সহজ কথা নয়। শান্তিপিসী ছিল, বিমলাবৌদি ছিলেন, একটু এদিক ওদিক হলে আরো অনেকে ছিল। কার চোখ কাণা হত ঠিক কি।

হ্যাজাকের আলোটা যেখানে পাশার ছকের মত গাছ আর বাঁশের খুঁটির ছায়ার মধ্যে এলিয়ে পড়েছে অস্পষ্ট হয়ে, চন্দ্রাতপের বাইরে আসরের সেই পিছন দিকটায় নজর পড়তেই সব স্পষ্ট হল তার কাছে। অপমূর্তির মত চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন দাঁত বার করে হেসে চলেছে, নিঃশব্দে, অতি নিঃশব্দে।

এই বৃন্দাবনকে দেখেছিল মা জনকেশ্বরীর ভিটেয় বনতুলসীর ঝোপের মধ্যে প্রথমে। ভাঁটির ফুল, শিমুলের ফুল যোগাড় করতে হর্ষ গিয়েছিল ওখানে। তখন বিকেল বিকেল। আর একটু পরেই মন্দিরাদের ভিটেকুমোরের পূজো আরম্ভ হবে, তার জন্যে ফুল চাই। পারুলপিসীই বলে দিয়েছিল কোথায় কোন ফুল পাওয়া যায়। আর একদিনের তো পূজো নয়, একমাস ধরে ফাল্গুন সন্ধ্যেয় পূজো হবে। গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতেই কুমারী মেয়েরা এই পূজো করে। পূজোর কোন মন্ত্র নেই। কেবল কতকগুলো ছড়া, এলোমেলো গল্পের মত, তাই একমাস আউড়ে গিয়ে পূজো শেষ হয়। তার পরে ঠাকুরের কাছে একরাশ প্রার্থনা। ঘর দাও, বাড়ি দাও, সুখ দাও। বাড়ির প্রত্যেকের নাম করে ছড়া কেটে মঙ্গল প্রার্থনার পর, ছোট্ট খেলনা পুকুরটায় ঘটের জল ঢেলে তার মধ্যে ঘিয়ের প্রদীপটা জ্বলন্ত অবস্থায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ফুলের জন্যে সাজি হাতে ঠাকুববাড়ি গিয়েছিল হর্ষ, সঙ্গে ছিল ঘোষেদের বাড়ির পুষ্প, আর বিমল, দত্তবাড়ির ছেলে। দুজনেই হর্ষর চেয়ে অন্তত: বছর দুয়েকের ছোট। মন্দিরা ছিল সকলের পেছনে। বিকেল হলে কি হবে বিরাট বেলগাছটাব নিচে ঠাকুরঘরখানা কবরখানার মত নির্জন। কাছাকাছি বাড়িঘর নেই। প্রায় এক মানুষ উঁচু মাটির ভিটের ওপর শুধু সেই করুগেটের টিনের ঘরখানাই নয়, খানিকটা ঘাসে ঢাকা আঙিনা, আর খানিকটা ভাঁটি, বন-তুলসী, ধুতরোগাছের ঘোর জঙ্গল। আঙিনার এক কোণে একটা জরাজীর্ণ কুয়ো আছে, তার পাটগুলোয় শ্যাওলার আস্তর লেগেছে। ফাটলে দু-একটা চারাগাছ মাথা চারিয়েছে। সাবধানে উঁকি মারলে দেখা যায় কুয়োর তলায় জলের চেয়ে জঞ্জাল জমেছে ঢের বেশী।

বিকেল বেলার গা-ভারি গা-ভারি আলোয় মনের ভেতরটা ছমছম করে উঠছিল। মাদার গাছটার তলায় ফুল কুড়োবার সময় ভয়ে ভয়ে এক আধবার ঠাকুরঘরের ভেতরে তাকাচ্ছিল। ভয়টা মা জনকেশ্বরীকে তো নয়, তাঁর বাহন দুটিকে। দুটি কিম্ভুত কিমাকার প্রেতমূর্তি, রঙ চটে গিয়ে আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে। একজনের নাম মোচরাসিঙে, আর একজনের নাম গাবুরডলন। দুটি যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

সামনের ঝোপটা হঠাৎ নড়ে উঠলো, শুকনো পাতায় খচমচ শব্দ তুলে। হাতের সাজি ফেলে দিয়ে পুষ্প আর মন্দিরা জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, বিমল তো ঠকঠক করে কাঁপছে, এক ইঞ্চি নড়বার ক্ষমতা তার নেই। এমন সময় ঝোপের মাঝখান থেকে ভুস করে মাথা তুললো কাকতাড়ুয়ার মত দেখতে এক অপমূর্তি। মাথার চুল জুতোর বুরুশের মত খাড়া খাড়া। কটকটে কটা চোখ, দাঁত উঁচু, চোয়ালের হাড়খানা সজাগ হয়ে নেমে এসে চিবুকের কাছে গোয়ারের মত বাঁক নিয়েছে। মুখে একটা চোখ পিটপিট মিচ্‌কে হাসি সাঁটা।

বিমলটা কঁকিয়ে উঠলো, বৃন্দাবন——

বৃন্দাবন জ্যাঠা গলায় হুঙ্কার দিল, কেন বাছা, আমাকে কি গাবুরডলন ভেবেছিলে ?

ঠাকুরবাড়ির ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে বুকসমান জঙ্গলের ভেতর থেকে গাবুর ডলনের নাম এত জোরে উচ্চারণ করতে শুনে ওদের বুকের তেভরটা হিম হয়ে গেল। অপদেবতার ব্যাপার, না জানি আজ কি ঘটে যায়। বৃন্দাবন তো মরবেই, ওরাও কেউ বাদ যাবে না। পুষ্প নিজের বুকে হাত দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলো রাম, রাম, রাম, রাম——

হর্ষও মনে মনে।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবন সশরীরে বেরিয়ে এলো ধুতরো আর বনতুলসীর জঙ্গলের ভেতর থেকে। খালি গা, খালি পা, বাঁ হাতে একটা মাঝারি আকারের বেজি।

পুষ্প বললো, মেনি ওর পোষা, কখনো কামড়ায় না।

হর্ষ বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে বললো, সত্যি ?

বৃন্দাবন বেজিটাকে আদর করতে করতে বললো, সত্যি।

——তা তুমি ওখানে একা একা কি করছিলে ? তোমার ভয় করে না ?

হর্ষ জানতে চাইল। বৃন্দাবন বেজিটাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম ?

——হর্ষ।

প্রথম বার দেশে গিয়ে বৃন্দাবনের সঙ্গে আলাপের এই সূত্রপাত। তারপর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যথেষ্ট। তার মাছ ধরায়, পাখির ছানা, ডিম ইত্যাদি সংগ্রহ করায় হর্ষ কতদিন সঙ্গী হয়েছে। বৃন্দাবনের ভাই নেই, বোন নেই, কেউ নেই। এক বুড়ী দিদিমা আর সে, এই দুটি প্রাণীর সংসার তাদের। প্রাণী অবশ্য আরো আছে, সে বৃন্দাবনের চিড়িয়াখানা ঘরে, যে ঘরটায় তার বাবা থাকতেন আগে। সজারু, বেজি, বনবেড়াল থেকে শুরু করে নানা রকমের পাখি, কচ্ছপ গোটাদুই, সব আছে। ঘরটা গিজ গিজ করছে। একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসে সব পশুপাখির খাঁচা থেকে এক জোট হয়ে।

মাছ মারা আর বাগানের কাজ দেখতে বৃন্দাবনের সামান্য সময় মাত্র খরচ হয়, বাকী সময়ের সবটাই চিড়িয়াখানা ঘরের জন্য খরচা করে। প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য আলাদা আলাদা খাবার যোগাড় করতে হয় তাকেই, খাওয়াতেও হয় নিজে হাতে। কে জোনাকী পোকা খায় আর কে ছাতুর সঙ্গে গুবরে পোকা ভালোবাসে বৃন্দাবনের মুখস্থ সব। শুধু যে নতুন কোন পাখি দেখলেই যেমন করে হোক তা সংগ্রহ করবে তাই নয়, নানা রকম অদ্ভুত পরীক্ষা চালানোয় তার ভারী আনন্দ। বাবুই পাখির বাসায় দোয়েলের ডিম রেখে সে দেখবার চেষ্টা করেছিল বড় হয়ে দোয়েল পাখিটার বাবুইয়ের বাদুড়ে চঙের বাসায় মন

বসে কিনা। আরো কত কি। কত মারা গেছে, কত এসেছে, আর আসছে তার কোন গোনা গুণতি নেই।

হর্ষ একদিন বলেছিল, তোর বাবা যদি কোন দিন দেশে আসেন, তোকে মারবেন না? তাঁর ঘরখানা তুই এভাবে ভরে রেখেছিস বলে?

ওর বাবার কথা উঠলেই ভীষণভাবে গম্ভীর হয়ে যায় বৃন্দাবন, একমনে শিস দিতে থাকে কিছুক্ষণ। গাছের কোটরের মধ্য থেকে প্যাঁচার বাচ্চা বের করবার সময় ও যে রকম শিস দিয়ে থাকে, কিংবা ওর সবচে আদরের বেজিটিকে ডাকবার সময় যেমন দেয়।

তারপর আবার দেঁতো হাসি হেসে বলে, আসবেই না।

—যদিই আসেন। হর্ষ জোর দেয়, ভেবেই পায় না মাত্র পঁচিশ মাইল দূরের টাউন থেকে তাঁর আসা এমন কি শক্ত। আর নিজের বাড়িতে কেনই বা তিনি আসবেন না।

—তাহলে শুনবি?—বৃন্দাবন চোখ পিটপিট করে বলে, তাহলে এই চাবুক!

হর্ষ শিউরে ওঠে। বৃন্দাবন ঘরের বেড়া থেকে চামড়ার একটা চাবুক টেনে নামায়।

—এই চাবুক দিয়ে বাবা আমাকে একদিন এমন মেরেছিল, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।—বৃন্দাবন দাঁত কিরমির করতে থাকে,—ঠিক এই চাবুকটা দিয়ে—

—ওটা ফেলে দিস না কেন তাহলে, আবার তো—

বোষ্টমীর গুপী যন্ত্রের মত গুপগুপিয়ে হাসলো খানিকটা, তারপর বললো, এখন আমি বড়ো হয়েছি, এবার আমি—বলে জোরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে একটা ভঙ্গি করলো।

অথচ সেদিন খুব স্পষ্ট হয়নি, পরে সব কিছুই জানতে পেরেছিল একে একে।

বৃন্দাবনের বাবা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বউকে নিয়ে পাবনা টাউনে থাকেন। দেশের বাড়িতে আর আসেন না। এটা তাঁর নিজের বাড়ি নয় প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়ি। বৃন্দাবনের মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এখানেই ছিলেন। বৃন্দাবন প্রথমটা দিদিমাকে ছেড়ে বাবার কাছেই থাকতো টাউনে, কিন্তু নতুন মার আদর সহ্য করতে পারলো না। প্রতিদিন তাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হতো বিনা দোষে। ধীরে ধীরে বৃন্দাবনের মেজাজটা গেল বিগড়ে, পড়াশোনা আর হলো না।

শেষে একদিন নতুনমার কারসাজিতে বাবার হাতে শেষ চাবুক খেয়ে টাউন থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে আসে। আসবার আগে নতুনমার নরম তুলতুলে গালে

এমন একখানা চড় কষিয়ে এসেছিল যে ওর ধারণা আজও তার দাগ আছে। আসবার সময় সঙ্গে করে বাবার চাবুকটা আনতে ভোলেনি। ভবিষ্যতে কোন দিন যদি পিতৃঋণ শোধ করবার প্রয়োজন হয়।

বৃন্দাবনের বাবা সব চেয়ে ভালো কাজ যেটুকু করেছেন, তা বৃন্দাবনের শরীর সম্বন্ধে। ওর শরীরটাকে তিনি মেরে মেরে পাকিয়ে দিয়েছেন; অনেক ধূসর চিহ্ন অক্ষয় করে রেখে দিয়েছেন ছেলের শরীরে। এখন এমন শক্ত হয়ে গেছে বৃন্দাবন যে, বেত হোক চাবুক হোক কিছুকেই আর গ্রাহ্য করে না বিন্দুমাত্র। গাছের কত উঁচু ডাল থেকে পড়েছে কতবার, জল হাওয়া খেয়ে আবার সুস্থ হয়েছে। সাপে কামড়েছে দু দুবার, তবু বেঁচে গেছে ডাকের মার দয়ায়। ডাকের মার নাম উঠলে এখনো হাত জোড় করে বৃন্দাবন। বুড়ী এত ভালো মন্ত্র জানে। সাপ পোষবার একটা সখ ছিল বৃন্দাবনের, এখনো আছে, কিন্তু দিদিমা বেঁচে থাকতে তা আর সফল হবার সম্ভাবনা নেই।

বৃন্দাবন বলে, সাপের মত সুন্দর আর কিছু না বুঝলি, পাখিই বল আর যাই বল, কম তো দেখলুম না।

আরো কত কি ভাবতো হর্ষ, লতার মত লতিয়ে লতিয়ে আসে ওর ভাবনা, একটা থেকে আর একটা, একদিন থেকে আর একদিন। বায়োস্কোপের ছবির মত, খুব তাড়াতাড়ি ভাবতে পারলে ছবিগুলো, মানে অতীত দিনগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে বলে তার বিশ্বাস, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভাবতে গেলে মাথার ভেতরটা নৌকোর মত দুলে ওঠে।

বৃন্দাবন এক চোখের ইসারায় তাকে ডাকলো আসরের বাইরে।

শান্তিপিসীর অলক্ষ্যে উঠে পড়লো হর্ষ, বিমলা বৌদি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। সেটা ভ্রূক্ষেপের মধ্যে না এনে দালানের খিড়কি দরজা খুলে আসরের পিছন দিকটায় বৃন্দাবনের কাছে গিয়ে বললো, ডাকছিলি কেন?

—ওখানে বসেছিস কেন? ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলের মতো থাকবি, বুঝেছিস? এই আমার মতো। নিজের বুকে অঙুল দিয়ে বার দুই টোকা মারলো বৃন্দাবন।

—কেন শান্তিপিসীর পাশে বসলে কি হয়? হর্ষ জানতে চাইল।

—ওসব শান্তি ফান্তি বিমলা ফিমলার পাশে না বসলে আর কোথায় বসবে, হ্যাঃ। যা মেয়েলি স্বভাব তোর।

যদিও বৃন্দাবন তাকে নিজেদের বাঁশঝাড় থেকে ছিপ কেটে দিয়েছে এবং নাজিরগঞ্জের হাট থেকে কই মারবার এবং বড় মাছ গাঁথবার দুরকমের বঁড়শি এনে দিয়েছে তবু ভীষণ রাগ হলো তার ওপর।

—ওরকম নাম ধরে কথা বলিস কেন? তোর চেয়ে বয়সে বড় না।

—মেয়েদের আবার বয়স, কচ্ছপ আবার মাছ হ্যাঃ, আপনি-আপনি বলে ডাকতে হবে।

গুবগুবিয়ে হাসলো বৃন্দাবন, পরে বললো, বাবার চাবুক খেয়েও এই মিঞা নতুন মাকে মা বলেনি, তুই তু-কারী করে কথা বলেছে, তা তোর—

হয় তো একটা গালাগালিই দিত, বৃন্দাবনের মুখটা বড়ো উদার। মাছ ধরতে বসে মাছকে পর্যন্ত গালাগালি করে। হর্ষ তাড়াতাড়ি বললো, কিন্তু বিমলা বৌদিকে তা বলে—

—আরে রেখে দে, জানা আছে আমার সব, এই তো সেবার ডাক্তারদার হাতে কেমন ঠেঙানি খেল, আমি কিছু জানি না ভাবছিস······

বৃন্দাবনের মুখে হাত চাপা দিয়ে থামালো হর্ষ, চেঁচাস না, কেউ শুনতে পাবে, ওদিকে চল। বৃন্দাবন আপত্তি করলো না, হর্ষর সঙ্গে সঙ্গে চললো। অন্ধকারে ঝুপসি হওয়া বটগাছের কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হর্ষ জিজ্ঞাসা করলো, ডাক্তারদা বিমলা বৌদিকে সত্যি সত্যি মেরেছিল রে ?
—করুণ গলায় কথা বললো হর্ষ, তুই জানলি কি করে ?

—স্বচক্ষে দেখেছি যে, বিলিতি গাব চুরি করতে উঠেছিলাম গাছে, চাপা কান্না শুনে প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম শাঁখচুণি ভেবে, রাত্রি-বেলা, তায় গাব গাছ, বলা তো যায় না !

—কি দেখলি তুই ? রুদ্ধ নিশ্বাসে হর্ষ শুধোয়।

—ঘুলঘুলিটা দিয়ে দেখলাম ডাক্তারদা বিমলার চুলের মুঠি ধরে মারছে, খাটের ওপর ওপুড় হয়ে পড়ে বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদছে ও।

—ইস ! হর্ষ স্তম্ভিত হয়ে গেল ডাক্তারদার কীর্তি শুনে। সত্যি কত দুঃখ বিমলা বৌদির।

—কেন মারছিল বলতে পারিস ? উদাস গলায় জানতে চায় হর্ষ।

—কি জানি।—কেমন অমনস্ক গলায় বৃন্দাবন কথা বলে, মনে হয় কি জানি ভাবছে দালানের অন্ধকার ছাদটার দিকে তাকিয়ে।

—তবে আর বোধ হয় মারে না—অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ গলায় কথা বলে বৃন্দাবন। শেয়াল ডেকে উঠলো দূরে কোথায়, দুটো কুকুর ধমকে উঠলো ঘেউ ঘেউ করে ওপাড়া থেকে, বৃন্দাবনের কথায় ছেদ পড়লো।

—আমি একটা খাঁই দিয়েছিলাম গাব গাছ থেকে, খুব ভয় পেয়ে গেছলো ডাক্তারদা।

—কি, কি করেছিলি, ?—বৃন্দাবনের হাতটা ধরে খুশী ভরা গলায় সজাগ হয়ে ওঠে হর্ষ।

—হেঁ হেঁ বাবা আমার সঙ্গে চালাকি নয়, আবার গুপী যন্ত্রের মত সরু মোটা গলায় হেসে নিল খানিকটা, করলাম কি জানিস ? ঘুলঘুলিটার কাছে

মুখ নিয়ে খোনা খোনা গলায় হাঁকলাম, 'এঁইওঁ ডাঁগতাঁর, ওঁ কি হঁচ্ছে।' ব্যস্। ডাক্তারদার হয়ে গেল।

বৃন্দাবনের খোনা গলা শুনে হর্ষর গাটা ছমছমিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনের হাত ধরে টানলো, এবার চল, যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে কখন।

বৃন্দাবন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তুই যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

হর্ষ অবাক হয়ে বললো, কেন, তুই এখন কি করবি ?

বৃন্দাবন কোন জবাব দিল না। চাঁদরের তলা থেকে দেশলাই বের করে খস্ করে একটা কাঠি ধরালো। অন্ধকারের মধ্যে হর্ষ দেখতে পায়নি এতক্ষণ, এবার টুকরো আলোয় দেখলো বৃন্দাবনের ঠোঁটে একটা বিড়ি।

ছোট ঠাকুর্দাকে হর্ষ যত দেখে ততই আশ্চর্য বোধ করে।

যে বাড়িতে রোজ গোপালের ভোগ দেন সেইখানেই নিজে হাতে চারটি চালকলা ফুটিয়ে নেন। মাছ্‌ মাংস দূরের কথা। সারাদিনের মধ্যে এই আহার। সকালে জলযোগ নেই, বিকেলেও না। রাত্রে মুড়ি চিঁড়ে যা হোক দুমুঠো খান।

মা কতদিন বলেছেন, ছোটকাকা, এই বয়সে আর কেন এমন কষ্ট করছেন, আমাদের এখানে খাবেন, আমি নিজে আপনার জন্য আলাদা করে রেঁধে দেবো।

ছোটঠাকুর্দা একটু হেসে বলেছেন, থাক বৌমা, এখনো না।

সারাদিন বাড়িতে বসে ঠাকুর্দা গীতা চণ্ডী পাঠ করেন নয়ত মোটা মোটা ইংরেজী বই পড়েন আমতলায় বসে। মণিকাকা যখন অসুখ নিয়ে বাড়ি আসেনি তখন পর্যন্ত ঠাকুর্দার কয়েকজন ছাত্র ছিল। তারা গ্রামেরই এপাড়ার ওপাড়ার ছেলে। সকালে আর দুপুরে তারা পালা করে আসতো। তখন হর্ষও যেত মাঝে মাঝে পড়তে। কিন্তু ঠাকুর্দার ঘরের ভেতর কোন দিন ঢোকবার অনুমতি পায়নি। বারান্দায় অন্য ছেলেদের সঙ্গে বসে পড়া মুখস্থ করতে থাকলেও হর্ষর দুই চোখের কৌতূহল খোলা থাকতো ওই আবছা অন্ধকার-অন্ধকার ঘরখানার দিকে।

ঠাকুর্দা যখন স্নান করে আসতে যাবেন তখন দরজায় তালা লাগিয়ে বলে যাবেন, তোমরা মন দিয়ে পড়ো, আমি এই এলাম বলে।

দুপুর বেলা ছোট ঠাকুর্দা ঘরের ভেতর ঠিক দরজার সামনেটা বসে একটা লাটাইয়ের মত জিনিসে করে দড়ি পাকান, তাঁরই নিজের ক্ষেতের সাদা পাট থেকে। বেশ সরুসরু টোন সুতোর মত, বৃন্দাবনের দিদিমা যেমন কাপাস তুলো থেকে সুতো কাটেন। কিংবা ঠাকুর্দা বসে বসে পুরনো খামের সাদা পিঠে হাতের লেখা প্র্যাকটিশ করেন এই বুড়ো বয়সেও।

কাকীমা অবশ্য ছোট ঠাকুর্দাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। ঠাকুর্দা যখন উঠোনে ধান কিংবা তিল সর্ষে যব কলাই রোদ্দুরে শুকোতে দিয়ে উঠোনেরই একটা গাছতলায় টুল পেতে বসে বাল্মীকির রামায়ণ গুণগুণ করেন, আর মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে বেশ কড়া নজর রাখেন চারপাশে, তখন তাদের বড় ঘরের চৌকিতে শুয়ে শুয়ে কাকীমা আক্রোশে ছটফট করেন : এই মন-মন ফসল ঘরে তুলে পচাবেন তবু আমাদের প্রাণে ধরে দেবেন না একমুঠো।

মা শুনে একটু হাসেন। কাকীমা তা দেখে আরো ক্ষেপে যান, না দিদি হাসির কথা নয়, আমার গা জ্বলে যায় এমন হাড় কেপ্পন স্বভাব দেখলে।

কিন্তু হর্ষ জানে ফসল ঠাকুর্দার ঘরেও পচবে না, গরীব শিষ্যের দল এর সৎ ব্যবহার করবে পুরো মাত্রায়। অবশ্য এমন নয় যে ঠাকুর্দা দান করেন কেউ হাত পেতে এসে দাঁড়ালেই। ঠাকুর্দা ধার দেন, নিজের বাড়ির লোক ছাড়া কাউকে কর্জ দিতে তাঁর আপত্তি নেই। যদিও পরিণামে সেগুলো দানের কোঠায়ই জমা হয়। শুধু ফসল কেন, তাঁর এতকালকার জমানো টাকাগুলো পর্যন্ত ধার দিয়ে দিয়ে ফর্সা করে এনেছেন।

মণিকাকার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আনতে চাননি নিজের টাকা থেকে, বলেছেন, বাজে খরচ। দুদিন উপোস দিলেই যা সেরে যায় তার জন্যে—।

অথচ শোনা যায় কোন এক শিষ্যের মামলার যাবতীয় খরচা শেষ পর্যন্ত তিনিই চালিয়েছিলেন শুধু মাত্র এই কারণে যে শিষ্যটি পথের মাঝখানে একদিন হাউ মাউ করে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল।

সেদিন বৃন্দাবনের বেজিটা দুষ্টুমি করে সেই যে ঠাকুর্দার ঘরের চৌকাঠের তলাকার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে বসলো, বৃন্দাবনের শত ডাক সত্ত্বেও আর বেরোতে চায় না। এদিকে মুস্কিল হয়েছে, ছোটঠাকুর্দা দরজায় তালা দিয়ে রেখে কোথায় গেছেন। তাই বোঝা যাচ্ছেনা বেজিটা ভেতরে গিয়ে কি করছে। একটা জানালা পর্যন্ত নেই যে উঁকি মেরে দেখবে।

বারান্দার ওপরে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হর্ষ চৌকাঠের তলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল এমন সময় ছোটঠাকুর্দার আবির্ভাব।

বৃন্দাবন বোধহয় তাঁর চটির শব্দ আগেই পেয়েছিল তাই তার পথ সে স্বার্থপরের মত বেছে নিয়েছিল নিঃশব্দে, ধরা পড়লো হর্ষ।

ছোটঠাকুর্দা হর্ষকে দেখে ভয়ানক চমকে উঠলেন প্রথমে, কেরেই। কি করছিস ওখানে? হর্ষ যত বলে, বেজি দেখছি ঠাকুর্দা।

ঠাকুর্দা ততই অবুঝ হন, বেজি। আমার ঘরে বেজি। চালাকি পেয়েছ?

বেজিই অবশ্য শেষ পর্যন্ত হর্ষর মান রক্ষা করেছিল সেদিন কারণ ঠাকুর্দার ঘর থেকে নির্গমনের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সেইদিন থেকে হর্ষর ছোট ঠাকুর্দাকে বড়ো আশ্চর্য লাগে। এত পূজো আচ্ছা করেও কেন যে তাঁর মনটা সব সময়ে এমন ছোটখাটো ব্যাপারে খুঁজি খুঁজি করে বেড়ায় আশ্চর্য।

সেদিন বৃন্দাবন এসে ভোর বেলায় হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিল, শিগগীর চল, ওদিকে সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে।

—ওদিকে, কোথায়?—হর্ষ লাফিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে।

—ডাকের মার বাড়িতে।

বৃন্দাবন দাঁড়ায় না। সমানে দৌড়তে থাকে। পিছন পিছন হর্ষও। ডাকের মার বাড়িতে গিয়ে দেখে সত্যিই এলাহি কাণ্ড। লাল পাগড়ি বাঁধা পুলিশে পুলিশে তার উঠোনটা ভরে উঠেছে। গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে চারপাশে, সকলের মুখেই একটা উদ্বেগের ছায়া।

ভিড় ঠেলে এগোতেই নজরে পড়লো ডাকের মার ঘরের দাওয়ার ওপর একটি রোগা লম্বা লোক বসে আছে, মুখের চেহারাটা বেশ নিরীহ নিরীহ। হাতে হাত কড়া দিয়ে বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটার চেহারার এমন কোন বিশেষত্ব নেই যার জন্যে দ্বিতীয়বার তাকানো যায় কিংবা একবার দেখলেই মনে রাখা যায়।

বড়ো দারোগাবাবু লোকটিকে মেঘ-ডাকা গলায় ধমক লাগাচ্ছেন কিন্তু লোকটির কোন হুঁস নেই, দারোগাবাবুর মুখের ওপরেই বরং গোটা দুই হাই তুলে বসলো। লোকটি হয় বেদম কালা, কিছুই শুনতে পায় না, নয়ত ভীষণ শয়তান।

কিন্তু লোকটিকে কেন ধরেছে, ডাকের মার বাড়িতেই বা কেন ধরা হলো, এই কথাই হর্ষর মনে বারবার জাগছে। এদিকে আবার কি কাণ্ড দেখ, সেই জটি বুড়ীর কোন খোঁজই নেই। কোথায় যে গেল।

বৃন্দাবন বললে, তুই দাঁড়া আমি একটু ভেতরটা ঘুরে আসি।

বৃন্দাবন এই না বলে তার বেজিটার মতই কত সহজে ভিড়ের ভেতরে তার শরীরটাকে গলিয়ে দিল। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর কি কৌশলে যে জনতা ঠেলে, পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে একেবারে ডাকের মার দাওয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, দূর থেকে হর্ষ তা অনুমান পর্যন্ত করতে পারল না। বৃন্দাবন যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাওয়ার গায়ে হেলানো বেশ পাকা বাঁশের দুখানা অদ্ভুত ধরণের লাঠি রাখা ছিল। লাঠি দুখানা বাঁশের চেয়ে চিকণ কিন্তু সাধারণ লাঠির বাঁশ যেমন হয় তার চেয়ে মোটা। মাঝ বরাবর আধ বিঘত পরিমাণ একটা করে কঞ্চির ঘাট, কঞ্চিটা একেবারে গোড়া থেকে কাটা হয়নি আরকি।

বৃন্দাবন হাত বাড়িয়ে যেই লাঠি দুখানা ছুঁয়েছে অমনি পুলিশ তাকে তাড়া লাগালো। ফিরে এসে বৃন্দাবন বললে, ওদুটো কি বলতো ?

—লাঠি। আবার কি ?

—রণপা। দেখিস নি তো কোন দিন, জানবি কি করে।

—কি করে ও দিয়ে ? হর্ষ জিজ্ঞাসা করে।

—কি আবার করবে—বৃন্দাবন মুরুব্বির মত মুচকি হেসে বললে, ওর ওপরে চড়ে। পা গাড়ি বলে ও গুলোকে। চড়া কিন্তু ভারি শক্ত। তবে চড়তে জানলে পাঁচ ঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়।

রণ পা, অর্থাৎ যুদ্ধের পা। হর্ষর হঠাৎ কয়েক বছর আগের একটা গল্প মনে পড়লো, শান্তিপিসী বলেছিল গল্পটা। শান্তিপিসীর বয়স তখন অল্প, মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রাত্তির বেলায় কুয়োর ধারে। হঠাৎ দেখে কি তাদের পাছ দুয়োরের উঠোনের ওপর দিয়ে দুখানা বাঁশ প্রায় নিঃশব্দে ছুটে আসচে। প্রথমটা ভেবেছিল চোখেরই ভুল, হয়ত কিছুর ছায়া, কিন্তু পরক্ষণেই চোখের নেশা কেটে গেল শান্তিপিসীর। ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো দুহাত দিয়ে। শান্তিপিসীর মা মুখ তুলে তাকিয়েই ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন আর তাঁদের একেবারে গায়ের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লগির ওপর ভর দিয়ে একটি ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎ বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা কথা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিল হর্ষর, ঐ লোকটা ডাক নয় তো? কিন্তু লোকটির চেহারা তাকে বারবার নিরাশ করলো। ঐ রোগা, নিরীহ মুখ লোকটি, চুলে যার রূপোলী আঁচড় লেগেছে দুচারটে, সে আর যাই হোক ডাক হতে পারে না। কিন্তু রণপা? রণপা কেন এলো, কোত্থেকেই বা এলো। ভাবনার কথা।

বড়োকাকার কাছ থেকেই সব জানা গেল পরে। মাকে বলছিলেন বড়োকাকা, হর্ষ বাড়ি ফিরেই শুনতে পেল। কথাগুলো সাজিয়ে নিলে এই রকম দাঁড়ায়।

বহুকাল ধরেই এ অঞ্চলে ডাকের নাম কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে সম্প্রতি কয়েকটা বড় বড় ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর থেকে লোকে সন্ধ্যা বেলা ও নাম উচ্চারন করতে পর্যন্ত ভয় পেতো। ডাকের অগম্য কোন জায়গা ছিল না, অসাধ্য কোন কাজ ছিল না। অথচ বড়োকাকার ধারণা ডাকের কোন দল নেই, সে একা। পরানপুরের ডাকাতি থেকে তো তাই অনুমান হয়। যুদ্ধের বাজারে বীরেন শা প্রচুর টাকা করেছিল এবং সেই টাকা সে যে খুব সৎ উপায়ে অর্জন করেছিল তাও না। সেদিন সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, অন্ধকার দিনটা শেষ হতে রাত নামলো আরো গাঢ় অন্ধকার নিয়ে। মাঝরাতে হঠাৎ একটা ভয়ানক গোলমাল শুনে প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে দেখলো বীরেন শার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। ত্রিশ চল্লিশ জন মশালধারী বাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখবা মাত্রই সবার প্রাণ জুড়িয়ে গেল, কেউ আর এক পা এগোলো না। যে যার ঘরে খিল দিল পত্রপাঠ। কারণ এ অঞ্চলে ডাকাতদের হাতের দমকার টিপ একেবারে অব্যর্থ। কিছু নয়, অন্ধকারের ভেতরে মুগুড়ের মত একখানা গাছের ডাল কিংবা বাঁশের টুকরো ঘুরতে ঘুরতে এসে বুকে লাগবে, ব্যস সব শেষ হয়ে যাবে। একেই দমকা বলে।

সকাল বেলা উঠে সকলে দেখলো বীরেন শার বাড়ির চারপাশে ত্রিশ চল্লিশটা ছোট ছোট কলাগাছ দাঁড় করানো রয়েছে, তাদের গায়ে একখানা করে মশাল

বেঁধানো। দরোয়ান গুলো ঘরের ভেতর তালাবন্দী। শোওয়ার ঘরে বীরেন শা এক কান কাটা রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। সিন্দুকটা খোলা।

সেই ডাক আজ সত্যি সত্যি ধরা পড়লো! বড়োকাকা সবশেষে বললেন, স্বদেশী ডাকাত কিনা তাই পুলিশের এত রোখ চেপে গিয়েছিল ধরবার জন্যে।

টিফিনের সময় আজকাল হর্ষ আর ইয়াকুব আর আগের মত বনে বাদাড়ে নতুন গাছগাছড়া খুঁজে বেড়ায় না। পরানপুর থেকে পাবনা টাউন পর্যন্ত উঁচু মাটির যে সড়কটা নতুন তৈরী হয়েছে তারই ধারের বটগাছটার তলায় বসে বিনি পয়সার বাজী ধরে। দুপুর বেলা ঠিক এই সময় পাবনা থেকে বিশ্বাস কোম্পানীর বাসটা এসে পৌঁছোয়। আজও ধুলো উড়িয়ে মোটরটা দেখা দিতেই ইয়াকুব বললো জোড়, হর্ষ বললো বিজোড়।

গাড়ি থামলো, যাত্রী নামলো এক এক করে। বিজোড় জোড় বিজোড়, ওরা গুণতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হর্ষ হেরে গিয়েও জিতে গেল, হর্ষর বাবা নামলেন সকলের শেষে বাস থেকে।

হর্ষর প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি, মনে হয়েছে দুপুরের রোদ্দুরে ঝাপসা দেখছে, কিন্তু না! একছুটে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হর্ষ। জনার্দন বাবু প্রথমটা অবাক হলেন, ভেবে পেলেন না তাঁর আসবার কথা কি করে জানতে পারলো ও। পরে হাতে বই খাতা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

এবং সেদিন বিকেল বেলায়ই হর্ষর মনটা কেমন করে উঠলো মা জনকেশ্বরীর বনতুলসীর ভিটের কাছে বেড়াতে এসে, যখন মনে হলো আর কদিন পরেই এই গ্রাম ছেড়ে তারা চলে যাবে বরাবরের মত কলকাতায় বাস করতে। বাবা বলেছেন যুদ্ধ নাকি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কলকাতা যাবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলেও চোখে কিন্তু জল এলো হঠাৎ।

মনে হলো শীতকালে যাত্রা আসবে প্রতিবছর, হ্যাজাকবাতি জ্বলবে, টিনের তরোয়ালে তরোয়ালে যুদ্ধ হবে, শুধু হর্ষ থাকবে না। বিমলা বৌদির তাসের আড্ডায় হয়ত শান্তিপিসী তখনো যাবে। তারপর মন কেমন করে আষাঢ় প্রথমের বর্ষা আসবে ঘোলা জল নিয়ে। সব প্রথমে একদিন ভোরে উঠে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে হবাক হয়ে যাবে কে? গাজনার বিল ধূ ধূ করছে পিটুলির গোলার মত সাদা জলে। তারপরে একটি কি দুটি দিনের মাত্র অপেক্ষা। খাল আর নালা দিয়ে, বেত ঝোপের তলা দিয়ে, পায়ে চলা ঢালু পথের বুক বেয়ে ছোট ছোট ঝর্ণার মত অবিরাম ধারায় আসতে থাকবে বর্ষার ঘোলা জল। একখাল থেকে আর এক খাল, এক মাঠেল থেকে আর এক মাঠেল জয় করে, পুকুরগুলো টৈটুম্বুর ভরিয়ে তবে জলের

আবেগ থামবে। আগে আগে লাফিয়ে আসতে থাকবে অসংখ্য মাছ, তারা ভগীরথের মত এগিয়ে নিয়ে আসতে থাকবে জলের ধারাকে।

শ্রাবণ ভাদ্র দুটো মাস গোটা গ্রামখানা বারো খণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অথৈ জলের মধ্যিখানে, এক একটা পাড়া এক একটা ছোট দ্বীপ। নৌকো ছাড়া চলাচল বন্ধ।

ভাদ্রমাসে মনসা পূজোর সময় কাকীমা মার মত করেই হয়ত কাউকে সেই তিন বউয়ের গল্পটা বলবেন। কিন্তু গল্পের ছোট বউ যখন বলবে :

আজকের হেন দিন হয়
মা বাপের বাড়ি হয়
ষোলমাছ্ পোড়া দিয়ে পান্তা ভাত খাই।—

তখন সেই শোলোক বলার সঙ্গে সঙ্গে কাকীমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠবে না মার মতো।

চৈত্র মাসের নীল পূজোর দিনের ছবিটা একবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, সেই পাটঠাকুরের ভর আসা। উঠোনের এক পাশে মাটিতে এক হাঁটু মুড়ে গাবুরডলনের মত করে বসে আছে জন ছয় সাত জোয়ান। তারা কেউ জেলে পাড়ার, কেউ ছুতোর পাড়ার। প্রত্যেকের বাঁহাতে ষোলগাছা করে বেতের লম্বা ঝাঁটা একখানা করে। একজন হাতে প্রকাণ্ড একটা ধুনুচি নিয়ে প্রত্যেকের মুখের সামনে আরতির মত করে ধূপের ধোঁয়া দিচ্ছে আর বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ছে। এদিকে কক্করাকড় ঢাক বেজে চলেছে দ্রুতলয়ে, গুড়গুড়িয়ে। পাথরের মত বসে আছে মালকোঁচা করে কাপড় পরা ছ-সাতটি জোয়ান মূর্তি। কোন লক্ষণ নেই বিচলিত হওয়ার।

কিন্তু একটু পরেই দেখা যাবে ধোঁয়া শুঁকছে মুখ বাড়িয়ে যেন, তারপর তক্ষকের ফনার মত একটু একটু দুলবে বাতাসে, রুক্ষ চুলগুলো কেশরের মত ফুলতে থাকবে যেন ধূপের ছায়ায়, সমস্ত শরীরটা ক্রমে শক্ত হয়ে আসছে ইস্পাতের মত।

চোখের পলকে কাণ্ড ঘটে যাবে, এক একটা করে পড়ে যাবে মাটিতে, কাটা পাঁঠার মত দাপাদাপি করবে ধূলোর মধ্যে, অসুরের মত শক্তিতে হাতের বেত আছড়াবে উঠোনের ওপর, ভয়ে সবাই সরে যাবে একপাশে। ওদের গলার শির ফুলে উঠেছে, চোখ বোজা। দেখতে দেখতে বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে যাবে একের পর এক, উঠোনথেকে মাঠেলে, মাঠেল থেকে বিলের চষা ইঁট ইঁট শক্ত মাটির ঢেলা ভরা জমির ওপর দিয়ে। ভর দুপুরের রোদ্দুরে ছায়া ফেলতে ফেলতে দিগন্তে মিলিয়ে যাবে দূরের চিলের মত, কটি ছোট কালো বিন্দু হয়ে।

কিন্তু হর্ষ আর সেদিন থাকবে না।

অনেক দিনের অনেক রাতের ঝাপসা তুলিতে আঁকা পিছনের দিনগুলো কতকগুলো খণ্ডচিত্রের মতই মনে পড়ে হর্ষর। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, তার মনে হলো, প্রায়ই মনে হয়, তাদের গলিটা সেই প্রথম দিনের মতই সমান রকম বাঁকা, যাত্রার দলের দুমড়ানো তরোয়ালের মত আড়াইখানা পাক খেয়ে সোজা একটি দোতলা বাড়ির পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে।

প্রথম যখন কলকাতার এই বাসায় জনার্দনবাবু সপরিবারে এলেন, কলকাতার আকাশ তখনো থমথমে। পথের মোড়ে মোড়ে মুখোসপরা আলো, সাইরেন বাজে কখনো কখনো। ব্যাফল ওয়াল বাড়িগুলোকে তখনো হতশ্রী করে রেখেছে, পার্কগুলো ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে ক্ষতবিক্ষত। রূপোলী বেলুন ওড়ে হাওড়ার নতুন ব্রিজের মাথায়, সতর্কতা। যুদ্ধ যদিও গড়িয়ে গেছে মহাদেশের প্রান্তে এবং ভয়ের কিছুও খুব প্রত্যাশিত নয়।

আগের বাসাটার মত এ বাসাটা নিরিবিলি নয়, বিস্তর জায়গা নেই শোবার বসবার ঘরের বাইরে। এক চিলতে বাগান বাড়ির চারপাশটা মাটির রেখা দিয়ে ঘিরে দেয় নি, মন কেমন করা নারকেল গাছ নেই সন্ধ্যে বেলার জন্যে। এ নিতান্তই কানাগলির মধ্যে আত্মগোপন করা, অথচ বাবুই পাখির বাসার মত হৈ চৈ-এ ভরা বাড়ি। চিৎকার, গান, গলা সাধা, পড়ামুখস্থ, ক্লাবের রিহার্শাল, মাঝরাতে নৈমিত্তিক মার খাওয়া বৌয়ের নাকি কান্না, চাপা গর্জন এবং সব মিলিয়ে একটা তাড়িখানার চাপা কলরবের মত ঐকতান কানে আসে। ঘরের সবকটা জানালা সব সময় খোলাই যায় না।

তবে হর্ষর মধুর লাগে এ বাসার প্রথম প্রহরের দিনগুলোর কথা ভাবতে। কত আসা কত যাওয়া, কত মৃত্যু কত জন্ম। কত পরিবারের পতন উত্থান এবং উড়ে যাওয়ার ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে এই মেরুদণ্ডহীন গলিটার সরীসৃপ শরীরে। জলের ধারার মত একজনের শূন্যস্থান আর একজনকে দিয়ে পূরণ করতে করতে বয়ে যাচ্ছে সংসার। শুধু এ গলির বাসী খবরের মত রয়ে গেছে হর্ষরা, রয়ে গেছেন নতুনবৌদিরা, পুরানো হয়েও। থেকে গেছে চক্রবর্তী পরিবার, কালের সমস্ত চক্রাবর্তন শিরোধার্য করে।

হর্ষর ওপরে কড়া নিষেধ ছিল জনার্দনবাবুর। একমাত্র স্কুল ছাড়া পথে ঘাটে বেরোনো চলবে না। মিলিটারী ট্রাকের বেপরোয়া চলা ফেরা কলকাতার পথঘাটকে খুব নিরাপদ রাখেনি। এ তোমার পরানপুরের মেঠো

সরক নয়, সাগতার ঘাসে ঢাকা সবুজ হালটও নয়, কলকাতার খ্যাপা রাস্তা। বড়ো মানুষই কখন যায় কখন থাকে ঠিক নেই, তার তুমি!

সেই কিশোর বয়সের বোবা ব্যাকুল নিঃসঙ্গ মুহূর্তে, সেই রুদ্ধশ্বাস দুরন্ত প্রহরে, স্কুল ফিরতি চার দেয়ালের বুড়ি ছোঁয়া বিকেলগুলোর একমাত্র আকর্ষণ ছিল নতুনবৌদি। পাশাপাশি বাড়ির সূত্রে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে থাকে তার বেশি কিছু নয়। পাড়ার ছেলে মেয়েদের তিনি নতুনবৌদি, তাই হর্ষরও। তবু হর্ষকে তিনি একটু আলাদা চোখে দেখতেন, একমাত্র হর্ষরই অবাধ গতিবিধি ছিল তাঁর ঘরে। হর্ষকে দেখলেই তিনি খুশী হতেন, একদিন না গেলে অনুযোগ করতেন।

আর তাঁর সংসার বলতে তো দুটি প্রাণী, তিনি আর তাঁর স্বামী, নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি পরিবার। এপাড়ার সবচেয়ে মাজিত রুচির, সবচেয়ে নিরীহ স্বভাবের, নিরপেক্ষ প্রকৃতির।

প্রথম দিন ছাদে উঠেই পাশের ছাদে চোখ পড়তে বেজায় অবাক হয়ে গেল হর্ষ, মাত্র হাত দুই ব্যবধানে কয়েকটি ফুলের টব বসানো ছোট ছাদটিতে একটি অল্প বয়সী বৌ কাপড় কুঁচিয়ে তুলছে আর গুনগুনিয়ে গান গাইছে। মুখের গড়নটা পাশ থেকে অবিকল পারুলপিসীর মত। কিন্তু পারুলপিসীর রঙ এতটা ফর্সা নয়, কপালের ওপর অশথের পাতার মত করে অমন ঢেউ খেলিয়ে ফুলিয়ে চুল বাঁধে না পারুলপিসী।

বিয়ের পর পারুলপিসীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি হর্ষর, আসামের লামডিং না কোথায় পিসীর শশুর বাড়ি। কতকাল কেটে গেছে পিসীর দেখা নেই, গলা শোনে নি কতকাল, তবু দিন কেটেছে হর্ষর। আগের মতই। অথচ একসময় পিসীর কাছে না শুলে রাত্রে ঘুম হতো না তার, মার কাছে শুলেও না। হায়, আর কি দেখা হবে কোন দিন! মনটা কেমন করে উঠলো, একটা অসতর্ক নিশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভেতর থেকে।

নিশ্বাসের শব্দটা বোধ হয় কানে গিয়েছিল নতুনবৌদির, একটু চমকে গিয়েই মুখ তুলে তাকালেন তাদের ছাদের দিকে, যন্ত্রচালিতের মত একটা হাতে মাথার কাপড় টানতে গিয়ে হর্ষকে দেখে থেমে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন একটু।

হর্ষ লুকিয়ে দেখা ধরা পড়ার লজ্জায় আরক্ত হয়ে চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। অপরিচয়ের ঘোর কাটেনি তখনো, মনের মধ্যে একটা ছিছি লজ্জা, বুকের মধ্যে রক্তের তোলপাড়। একটা ভালো লাগার সঙ্গে ভয় আর লজ্জার স্বাদ সে এই প্রথম উপভোগ করলো।

সেদিন আর লজ্জা বাড়ান নি নতুনবৌদি। কিন্তু পরদিন দেখা হতেই মুখ টিপে সেই চোরা হাসিটা হাসলেন। সেই দুপুর আর বিকেলের মোহানায়

নিরিবিলি ছাদ, পাশের নিমগাছের নুলো ডালে একটা চড়ুই পাকা ফলের মত রোদ্দুরে লাল হয়ে বসে আছে। নিচতলার চৌবাচ্চায় জল পড়ার শব্দ আসচে একটানা। হর্ষ চোখ ফেরাতে পারলো না। হয়ত খুব বেশী লজ্জা করলো বলে। নতুনবৌদি মুখ টিপে হেসে এমন হাল্কা করে ওর দিকে সোজাসুজি তাকালেন, যে ওর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো।

হর্ষকে তাঁর দিকে সম্বিতহারা চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি কথা কয়ে উঠলেন অপবিচিত গলায়, তোমার নাম কি ভাই?

কেমন যেন একটা রিণরিণে বেশ ছিল গলার স্বরে, ঠিক যেন কচুরির ফুলের মত, অপরাজিতার মত, স্নিগ্ধ বেগুনী-নীল রঙের ঝঙ্কার। কতো কতো মেয়েলী গলার মধ্যে চোখ বুজে চেনা যায়।

গলার স্বরের একটা রঙ আছে, বড়োকাকার একরকম, বাবার একরকম। কথাটা শুনে ছোটকাকা গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, হর্ষ বড়ো হলে পাগল হবে। বাবা হেসে মাথা নেড়েছিলেন, না, ছবি আঁকবে দেখিস।

কিন্তু না, নতুনবৌদি তাকিয়ে আছেন। নামটা স্বপ্নে-পাওয়ার মত বলে গেল হর্ষ। নতুনবৌদি নিজে একবার স্পষ্ট করে প্রতিধ্বনি তুললেন নামটার, তারপরে যেন নিজের মনেই বললেন, বাঃ বেশ ভারি সুন্দর নাম তো তোমার!

এর পরে আরো অনেক কথা হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, তেমন লজ্জা পায়নি। সব কিছু আজ আর মনে নেই, থাকবার কথাও নয়। তবে ধীরে ধীরে দু-ছাদের দূরত্ব ঘুচে গেছে, দু-ঘরের। চৌকাটি পাপোষ হয়েছে পায়ের তলায় নির্বিঘ্নে। কত বিকালে কত সন্ধ্যায় নতুনবৌদিকে ভীষণ রকম ভয় দেখিয়ে লাফিয়ে এছাদ ওছাদ হয়েছে হর্ষ। পড়ে যাবার ভয় ভেঙে গেছে তার।

প্রথম যেদিন স্কুলে ভর্তি হলো এ বাসায় এসে, সেদিনটির কথাও এমনি স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু কত তফাত! অনেক অনেক দুঃস্বপ্ন যেমন কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যায় না মন থেকে, এও তেমনি।

তাকে ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে জনার্দনবাবু চলে গেলেন, একবার ফিরেও তাকালেন না পিছনে। অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে, মুখ ভার করে, মন খারাপ করে, মাথা নিচু করে বসে ছিল হর্ষ। চোখ না তুলেও বেশ বুঝতে পারছিল অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ তাকে মাকড়সার জালের মত ঘিরে ফেলেছে। আলপিনের মত দুষ্টু হাসি নাচছে সামনে পিছনে অনেকের ঠোঁটে।

কোনো স্কুলে এমন আবহাওয়ার মধ্যে পড়েনি সে, এমন অসহায় অবস্থা দাঁড়ায়নি মনের মধ্যে। চোখ তুলতেই সবচেয়ে চ্যাঙা ছেলেটি চোখে চোখ বাধিয়ে দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলো, আজই তুমি বুঝি ভর্তি হলে, খোকা?

নীল রেখা গোঁপের নিচে হাসলো ছেলেটি। বয়সে হর্ষর চেয়ে বছর তিন চারেকের বড়ো হলেও ছেলেটির সম্বোধনে মোটেই খুশী হতে পারলো না সে। একপাশে একটুখানি ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল মাত্র। কিন্তু তাতে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না দেখে একে একে নানা প্রশ্ন করা হলো নানা দিক থেকে। সে ধীরে ধীরে সদুত্তর দিয়ে চললো সাধ্যমতো। লাজুক লাজুক করুণ গলায়।

শিক্ষক তখনো ক্লাসে আসেন নি, হর্ষর শেষ উত্তর শুনে ছেলের দল বিকট উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, বা-ঙা-ল !

কথাটা এই প্রথম শুনলেও একটা উন্মত্ত অভিমান ফেনিয়ে উঠলো বুকের কাছটায়। গোয়ালন্দর কাছে পদ্মার ঘোলা জল যেমন ফুঁসে ওঠে মেঘনার মসী বর্ণ জলের ঘা খেয়ে। মনসার দেশ উত্তর বাংলার গঙ্গার জঙ্গলে আলাদ গোখুর ফণা তোলে যেমন। রাগ আর অভিমান একসঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি এর আগে কখনো। গলার কাছটায় জ্বালা করতে থাকে, কিন্তু দুর্বল স্বভাব হর্ষ এলিয়ে পড়ে আবার। আশপাশ থেকে দেবগণ ততক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি শুরু করে দেয়, কাগজের কচি, খড়ির টুকরো, ছোলাভাজা। সঙ্গে সঙ্গে হো-ও-ও সমবেত চিৎকার। এবং মাঝে মাঝে অদৃশ্য হাতের চাঁটি।

একেবারে বোকা বনে গিয়েছিল হর্ষ, আর একটু হলেই হয়তো কেঁদে ফেলতো। এমন সময় মাস্টার মশাই ক্লাসে ঢোকায় সেদিনের মতো অব্যাহতি পাওয়া গেল। কিন্তু পালাজ্বরের মতো এর জের চললো অনেক দিন ধরেই।

লাল চোখে, শুকনো মুখে, প্রথমদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলো হর্ষ। বই খাতা চুপিচুপি টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে ছাদে চলে গেল, মা আর মন্দিরার চোখ এড়াবার জন্য। ছাদের এক কোণে গিয়ে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে স্কুলের কথাই ভাবতে লাগলো। এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাকে সহপাঠিদের হিংস্র আনন্দের র‍্যাশান যোগাতে হবে। নিস্তার নেই, কিছুতেই নিস্তার নেই তার। ইয়াকুবের কথা মনে পড়লো, সে তো এর তুলনায় স্বর্গে ছিল। দেশের ছেলে সবাই, আর যাই ভাবুক কেউই পর ভাবেনি তাকে কখনো।

আকাশ পাতাল কতকি ভাবছিল হর্ষ, এক কথা থেকে আরেক কথা। হঠাৎ পিছনে, মানে পিছনের ছাদ থেকে সেই আশ্চর্য গলার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো যেন। মুখ তুলে পিছন পানে তাকাতেই নতুনবৌদি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে হর্ষ ভাই ?

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষ হাসবার চেষ্টা করলো, কিছু হয়নি তো !

তার চেয়ে মাত্র বছর কয়েকের বড় হলেও নতুনবৌদির চোখকে সেদিন ফাঁকি দিতে পারেনি হর্ষ। একটা কিছু হয়েছে এবং সম্ভবত: কি হয়েছে সেটা মোটামুটি অনুমান করেই তিনি বললেন, আজকে তো তুমি স্কুলে গিয়েছিলে, না ?

ঘাড় নাড়লো ও। নতুনবৌদি তাঁদের ন্যাড়া ছাদের ধারে এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের বাড়িতে এখন একবার আসবে ভাই, আসতে পারো ?

হর্ষর মনে আছে সেইদিনই সে প্রথম লাফিয়ে নতুনবৌদিদের ছাদে গিয়েছিল, এবং তার কাণ্ড দেখে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। তার জন্যে কেউ সত্যিকরে এতখানি ভয় পায়, ভাবনা করে, এই অনুভব তাকে যে আনন্দ দিয়েছিল তার তুলনা হয় না।

দু-ছাদের মাঝখানে খাদের মতো যে সঙ্কীর্ণ একটা চোরাগলি, পা ফসকে তার মধ্যে যদি হর্ষ পড়ে যেত, তাহলে——নতুনবৌদি আর ভাবতে পারেন নি কথাটা। মাগো ! একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনি করে তিনি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন হর্ষকে।

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো হর্ষ, মনে হল আশপাশের ছাদ থেকে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। নতুনবৌদি যা কাণ্ড করবেন এক একটা !

আলিঙ্গন মুক্ত করে প্রথমে একটা ধমক দিয়েছিলেন নিচে কড়া গলায়, তার পরে পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে একেবারে নরম হয়ে গেলেন নতুন-বৌদি, ইস্কুল পছন্দ হলো তো ?

হর্ষ কিছু বলবার আগেই অবশ্য তিনি জবাব পেয়ে গেলেন পিঠে হাত বুলোতে গিয়ে। আলপিন শুদ্ধু কাগজটা জামার কলারের কাছ থেকে খুলে এনে মনে মনে পড়লেন লেখাটা। তারপর হুঁ বলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আড়চোখে তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে হর্ষ পড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল লেখাটা, তার প্রথম দিনের স্কুল জীবনের উল্লেখযোগ্য সেই সার্টিফিকেটটা। কিন্তু পারে নি। শুধু স্পষ্ট দেখেছে কাগজটা পড়বার সময় নতুনবৌদির মুখখানা কেমন কঠিন আর লাল হয়ে উঠেছিল।

হাত ধরে একেবারে তাঁদের দোতলার শোয়ার ঘরে নিয়ে এলেন নতুন-বৌদি। ঘরটি খুব বড়ো নয়। কিন্তু এমন ছবির মতো সাজানো গুছানো যে দেখলেই অকারণে ঘুম পেয়ে যায়। চার দেওয়ালে ছবি ছড়ানো। ঘরের একপাশে জানালার সামনে একটা খাট, তার ওপরে নিভাঁজ নিটেউ ধবধবে বিছানা। নতুনবৌদি তাকে বিছানার ওপরে বসতে বললেন। বার দুই ইতস্তত: করে হর্ষ সসঙ্কোচে হাল্কা ভঙ্গিতে বসে পড়লো। বৌদি তাকে বসিয়ে দুমিনিটের জন্যে বাইরে গেলেন। ঘরময় একটা মিষ্টি গন্ধ, ঠিক চিনতে পারলো না এই গন্ধটাই একটু আগে নতুনবৌদির খোঁপায় পেয়েছিল, না অন্য কিছুর।

হাই উঠলো বসে থেকে থেকে, দুমিনিট এতো সময় ! ঘুম পেলো আবার, আর একবার ঘুমিয়ে পড়লে হর্ষর এখনো——। জোর করে জানালার দিকে

তাকালো। একটা একুশ বাইশ বছরের ছেলে ওপাশের সাদা বাড়িটার বারান্দায় বসে পড়া মুখস্থ করছে এই জানালার দিকে তাকিয়ে।

শব্দ শুনে হর্ষ জানালা থেকে মুখ ফেরালো। নতুনবৌদি একটা রেকাবী আর জলের গ্লাস হাতে করে ঘরের ঢুকেছেন, মুখে সেই চোরা হাসিটা। বললেন, খেয়ে আসোনি বাড়ি থেকে জানি, আর আসলেও বা——

হর্ষর হঠাৎ বাড়ির কথা স্মরণ হলো, মা খাবার নিয়ে বসে আছেন হয়ত। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। তার স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরী দেখে সদরে গিয়ে উঁকি দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, কিংবা মন্দিরাকে পাঠাচ্ছেন।

নতুনবৌদি তখন নিচু হয়ে মেঝেতে একটা ফুল তোলা আসন পাতছিলেন হর্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না আমি——

বিস্মিত ভঙ্গিতে ঘাড় তুললেন তিনি, না আমি কি ? কি হলো তোমার হঠাৎ ? ও, বাড়ির কথা ভাবছো——ঠিক বুঝতে পারেন নতুনবৌদি, আর মনের কথা কেউ বুঝতে পেরে গেলে ভাবি অস্বস্তি লাগে হর্ষর।

——বাড়ি যাই এখন। গলার স্বরটা দ্বিধায় দুললো হর্ষর।

খপ্ করে হাতটা ধরে নতুনবৌদি বললেন, বসো দেখি এখন। তোমার মাকে জানালা দিয়ে বলে এসেছি আমি।

মুখের দিকে তাকিয়ে তথাস্তু ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু করে আসনে বসে পড়লো অগত্যা।

সন্দেশ একটু করে ভেঙেভেঙে মুখে দিচ্ছিল আর সলজ্জ ভাবে তাকাচ্ছিল হর্ষ। নতুনবৌদির সামনে খেতে যথেষ্ট লজ্জা করে তার। কার বা করে না। এমন হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলে কি আর খাওয়া যায় ? মনে হয় হ্যাংলার মতো দেখাচ্ছে কিংবা বেশী বড়ো হাঁ করে ফেলেছে, নইলে অন্ততঃ দাঁতগুলো বিশ্রী বনমানুষের ভঙ্গিতে বেরিয়ে পড়েছে। তার চেয়ে পাখির মতো ঠোঁট করে একটু একটু খাও, ঘাড় নিচু করে, সেই ভালো।

নতুনবৌদি গল্প করছিলেন তার সামনা সামনি খাটের ওপর বসে, আর মাঝে মাঝে হাসছিলেন, মিহি ঠাণ্ডা হাসি। ছোট ছোট মসৃণ ঝিনুকের মতো ঝকঝকে একসার দাঁত দুধ-আলতা ঠোঁটের নিচে চমকিয়ে যাচ্ছিল প্রতিবারেই। কি ভালো যে লাগছিল সেই সময়। অথচ তাঁর বারো আনা গল্পই বাপের বাড়ির, আর সেই জন্যেই হর্ষর একটুও মন লাগছিল না শুনতে, সব সময় সব গল্প শুনতে কি ভালো লাগে। ঠিক তার মত একটা ভাই আছে নতুনবৌদির, শোনা অবধি অস্বস্তিই লেগেছে কেন জানি। বাকি সিকিটা অংশ তার জন্যে, ঠিক তার জন্যে নয়, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে না মিশবার উপদেশ।

কথা বলতে বলতে নতুনবৌদির ভ্রূ-দুটি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, চিবুকটাকে কঠিন আর লম্বা দেখায়, ক্রুর কটাক্ষে জানালার দিকে একবার তাকান। পাখির

শিস শোনা যায় একটা তৎক্ষণাৎ, কি পাখি ভেবে পায় না হর্ষ। জলের গ্লাসে চুমুক ঠেকিয়ে রেখে সেও তাকায় কিন্তু তার ওখান থেকে দেখা যায় না কিছু। বাইরের নিমগাছটার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে, বাইরে ঠাণ্ডা রোদের বিকেল। ঘুড়ি উড়ছে কোথায় যেন পত্ পত্ করে।

রোদ্দুরের একটা রেখা গালের এক পাশ ছুঁয়ে ফেলেছে নতুনবৌদির। জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে অমনি বললেন,—যার তার সঙ্গে মিশবে না তুমি। এখানকার ছেলেগুলো বেশির ভাগই ভারি অসভ্য। তুমি বিকেল বেলা আমাদের ছাদে আসবে রোজ।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল, কে আসচে। নিশ্চয়ই নতুনবৌদির স্বামী। এখনো হর্ষ দেখেনি তাঁকে, ভদ্রলোক নাকি কোন কলেজে প্রফেসারী করেন, এই পর্যন্ত তার জানা আছে। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে।

কিন্তু বারান্দায় জুতো খুলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি মণিকাকার বয়সী, মণিকাকা বেঁচে থাকলে আজ সেই কথাই স্বচ্ছন্দে বলা চলতো। চেহারাটা আশঙ্কাজনক কিছু মাস্টার মুখো নয়, দিব্যি হাসি-খুশী। চশমা পরায় চোখ দুটো আরো স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল দেখায়। জামার বোতাম খুলতে খুলতে মৃদু হেসে তাকালেন হর্ষর দিকে।

—পাশের বাড়ির হর্ষ বাবু। নতুনবৌদি অমনি ঠাট্টার স্বরে নামটা বলে দেন।

তারপরে হাতপাখা হাতে এগিয়ে এসে মুখটিপে হেসে হর্ষকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কে জানো ?

আগে না দেখলেও ঠিকই চিনতে পেরেছিল হর্ষ, একপাশে ঘাড় নেড়ে জানালো সে জানে। কিন্তু নতুনবৌদির মাথায় তখন মতলব জেগেছে, বললেন, ছাই জানো, বলো দেখি কে ইনি আমার ? বলেই জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগলেন হর্ষর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। গম্ভীর হয়ে।

একদম দমে গেল হর্ষ। এমন এক একটা কাণ্ড করে বসবেন নতুন-বৌদি থেকে থেকে যে ভাবতে পারা যায় না। ইনি যে তাঁর কে, সারাজীবন চেষ্টা করলেও সে তা মুখ ফুটে বলতে পারবে কি !

কিন্তু নতুনবৌদির অনেক কথার মতো, সেদিনকার বৈকালিক উপদেশও পালন করতে পারে নি হর্ষ। যে স্কুলে সেদিন তার এমন অভ্যর্থনা হয়েছিল সেইখানেই তাকে কমপক্ষে ছ-সাত ঘণ্টা কাটাতে হত। সেই ছেলেদের ভেতরই, যাদের নির্মমতা তাকে সেদিন এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারে নি। নতুনবৌদির স্নেহ-করুণা এই কুরুক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগেনি।

কাজেই পারস্পরিক সম্পর্কটা মসৃণ করে আনতেই হল, মিশতেই হলো তাদের সঙ্গে। দেখলো বাইরে থেকে যতটা ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল, সত্যিকরে তারা ততটা কিছু নয়। তাদেরও বিবেক আছে, বিশ্বাস রাখবার চেষ্টা আছে।

এবং সেই বয়সেই তাকে একজন বুঝিয়েছিল, মন্দ ভালো দুটো চেহারাই মানুষের। এবং একই মানুষের। সুতরাং তুমি যদি ওই মন্দ দিকটাতেই চক্ষুস্থির না করে চলো তবে তোমার দুঃখটা কি। আর তাতে করে আসলে তোমার ভালোই হবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাস্টার নাকি ছেলেটা! আজ ভাবতে বড়ো হাসি পায়, কে ওই বয়সেই 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস' মার্কা দিয়ে এই গুরুপাক উপদেশটা পরিবেষণ করেছিল। কে আবার, গজেন। সেই অত্যন্ত আদর্শবাদী, গুরুচালী, সিরিয়াস ছেলেটা। যে অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে নাক ফুলিয়ে কথা বলে।

প্রথমটা গজেনকে ভালো লাগেনি, হর্ষের মনে হয়নি। সমবয়সী হলেও বেশ মজবুত আর ভারিক্কী চেহারা ছিল তার। একটা চোখ ঈষৎ ট্যারা, অনেকের চোখেই সেটা আজ পর্যন্ত ধরা পড়লো না, আশ্চর্য! কপালে একটা গভীর ক্ষত রেখা ডান ভুরুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে টানা। সকলের আগে চোখ পড়ে সেইখানটায়। তবে হাসি পেতো তার চুলের উদ্ধত আপোষহীন ভাবগতিক দেখে। ছোট ছোট খাড়া খাড়া চুলগুলোকে কিছুতেই স্ববশে আনতে পারতো না। আর সেই কারণেই বোধ করি মাঝে মাঝে একটা গান্ধি টুপি চড়িয়ে আসতো মাথায়।

গজেনের বাইরেটা যত রুক্ষ ছিল ভেতরটা তত নয়। ঐ বয়সেই সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাব্য চর্চা করতো। কিন্তু সেটা হর্ষকে ততটা কিছু অকর্ষণ করতে পারেনি, যতটা করেছে তার জীবনে কোথায় একটা রহস্যের গুপ্তকাঁটা বিঁধে আছে এই অনুমান। কিন্তু সে পরের কথা, পরে আসা যাবে।

সেদিন গজেন হর্ষকে ধরে বসলো স্কুলের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলার জন্য। বিকেলটাকে বদ্ধঘরে বুড়োর মতো কাটিয়ে সুবোধ বালক সাজবার কোন মানেই হয় না। শক্ত হতে হবে। সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ কর নি। বক্তব্য শেষ করে একটা নাটকীয় নিশ্বাস ফেলে গজেন।

যেন বাঙালীকে, বিশেষ করে হর্ষকে, মানুষ করে তুলবার গুরুভার তার কাঁধে কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে চাপিয়ে দিয়েছে। আর সেটা পালিত হবে সর্বপ্রথম ফুটবল মারফৎ। কিন্তু ফুটবল যতটা না তাকে সেদিন টেনেছিল, কবিতার লাইনটা তার ঢের বেশী আকর্ষণ করেছিল খেলার মাঠে।

গজেনের সব কিছুই একটু উল্টো পাল্টা ধরণের। এমনকি ওদের বাসা-টাও। হর্ষ নিজেদের বাসার সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে দেখলো। বড়োবাজারের

শোভারাম বসাক স্ট্রীটে ছিল গজেনদের বাসা। চারপাশে মাড়োয়ারী পট্টি। বাঙালী-মুখ যদি বা এক আধটে নজরে পড়ে, বাঙালিনীর সাক্ষাৎ আদৌ নেই।

বাড়িটা বিরাট। অনেক ভাড়াটে থাকে। তবে গোটা বাড়িটা ওদেরই নাকি লীজ নেওয়া। কয়েকটা তাঁত চলছে দেখতে পেল একটা ঘরে। ছাদে বস্তা বস্তা রঙিন সুতো শুকোচ্ছে। চাদর পাট করা রয়েছে থরে বিথরে। এই তাঁত আর এই ব্যবসা ওদেরই।

আর একটা জিনিস দেখে চমৎকৃত হলো। গজেনের বড়দা একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, যদিও সেটা সাহিত্যের নয়, অর্থনৈতিক। পত্রিকার অফিস ঘরেই তাকে নিয়ে বসালো গজেন, না ঠিক অফিস ঘরে নয়, কাঠের পার্টিশান দেওয়া তার পাশের ছোট্ট ঘরখানায়। সাদা পুরু গদীর ওপর ময়লা পা জড়োসড়ো করে বসলো হর্ষ।

গজেনের বৌদি এলেন সঙ্গে সঙ্গে। ভারি বাচ্চা চেহারা। নতুন-বৌদির কথা এক ঝলক মনে পড়ে গেল, কিন্তু অতোটা সুন্দরী ইনি নন। হাল্কা, রোগা চেহারা, টোপাকুলের মত আদুরে আদুরে গাল, কথা বলবার ধরণটাও ঠিক তেমনি। বয়সে আর শরীরে এত ছোট যে নিজের প্রায় সমবয়সী মনে হয়। কিন্তু তক্ষুনি আবার সন্দেহ হয়, মনে হয় চোখের ভুল, ঠিক বুঝতে পারছে না, বয়স হয়ত অনুমানকে ডিঙিয়ে গেছে অনেক দূরে। শরীরটা হয়তো কোন অসুখে পল্কা।

অনর্গল কথা বলেন আর ছটফটিয়ে ঘুরে বেড়ান, চঞ্চলতা তাঁর চোখে মুখে হাতে পায়ে, জিভের ডগায় পর্যন্ত। জোরে জোরে চেঁচিয়ে হাসেন, আর হাসলেই তাঁকে সবচেয়ে ক্লান্ত দেখায়। একটুকু কথাযই রাগে অভিমানে গাল ফোলান, মনে হয় যে কোনো মুহূর্তেই তিনি কেঁদে ফেলতে পারেন, কিন্তু কাঁদেন না। খুব মজা লাগলো হর্ষর।

গজেনের বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে কতটুকু মাত্র সময় লাগলো ভাবতে আশ্চর্য লাগে। এমন এক একজন থাকে যাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করা মানেই সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া। এক বারের জন্যেও মনে হবে না তুমি দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছো, তুমি বাইরের কেউ। ইনিও তেমনি। এঁর চোখের দিকে তাকাতে, এঁর সঙ্গে কথা বলতে একটুও লজ্জা করে না হর্ষর। আশ্চর্য নয়ত কি!

বৌদিকে গজেন 'আপনি' বলে না, হর্ষও বললো না। গজেন জামাকাপড় ছেড়ে এলে বৌদি হঠাৎ বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হলেন। কেন তা একটু পরেই স্পষ্ট হলো।

দুটো বড়ো বড়ো কাঁচের গ্লাসে রঙিন শরবৎ নিয়ে যখন বৌদি ফের সেই ছোট ঘরখানায় পদার্পণ করলেন ততক্ষণে গজেন আর তার মধ্যে বন্ধুত্ব দস্তুরমত

জমে উঠেছে। এরই মধ্যে গজেন খাতা বের করে কবিতা দেখিয়েছে, তার নিজের রচনা।

দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি সে দারুণ আবেগে পড়ে শোনাচ্ছিল হর্ষকে। এমন সময় বৌদি এলেন।

—এই যে ক্ষুদে সাহিত্যিক, আবার কবিত্বে শান দিচ্ছ বুঝি?

কাঁচের গ্লাস দুটো দুজনের হাতে এগিয়ে দিতে গিয়ে একটু থেমে বৌদি ঠাট্টা করলেন। গজেন রেগে গিয়ে খাতা বন্ধ করলো, এবং কিছুক্ষণের জন্য কথাও।

—এই রাগ হলো বাবুর, মাগো! আচ্ছা, হর্ষ—বৌদি তার মধ্যস্থতা মানলেন, তুমি কি তোমার বৌদির ওপর এমনি কথায় কথায় রাগ করো?

অপরাধীর মত ঘাড় চুলকে হর্ষ বললো, আমার কিন্তু মোটেই বৌদি নেই।

—কেন? মোটেই নেই কেন?—বৌদি কিছুক্ষণ চোখের পলক পর্যন্ত ফেললেন না। পৃথিবীতে কারো বৌদি নেই একথাটা তিনি যেন হঠাৎ করে ভাবতে পারেন না। তারপরে কিছু একটা অনুমান করে তাড়াতাড়ি কথা বলেন, ও হরি, তোমার দাদাদের বুঝি এখনো—

—ধ্যাৎ, কি যে বলো—গজেন আর চুপ করে থাকতে পারলো না, ওর কোন দাদাই নেই, মায়ের ও এক ছেলে, তা জানো?

মায়ের এক ছেলে হওয়ার মধ্যে কি দুর্ভাগ্য লুকিয়ে রয়েছে হর্ষ ঠিক বুঝতে পারলো না। বৌদি দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে দুঃখ বাচক চুক্ চুক্ শব্দ করলেন দুবার।

বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠতেই শক্ খেলো হর্ষ. ইস্ সন্ধ্যে হয়ে গেছে একেবারে।

গজেন বললো, তাতে কি হয়েছে, বাড়িতে তোকে বকবে ভাবছিস?

বকুনির ভাবনা বিস্তর থাকলেও সেকথা এখানে স্বীকার করতে তার পৌরুষে বাধলো—দূর। সন্ধ্যে বেলায় পড়তে বসতে হবে না? তাছাড়া—

হর্ষর ঠোঁটে তাছাড়া-টা খাপছাড়া ভাবে থেমে গেল, ঘরের মধ্যে একটি প্রায় কিশোরী মেয়ের আবির্ভাবে। ন্যাসপাতি রং গায়ে একটা ধূপছায়া ফ্রক। সুন্দর মুখখানার দুপাশে স্প্রিংয়ের মত কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল কাঁপছিল তখনো। হর্ষকে ঘরের মধ্যে দেখবামাত্র কাঠের পার্টিশানের ওপিঠে বিদ্যুতের মতই মিলিয়ে গেল জিভ কেটে।

গজেন ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকালো, কিন্তু দেখতে পেলোনা কাউকে। হর্ষও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

গজেনের বাড়িতে হর্ষ এমন একটা স্বাদ পেলো যা এর আগে সে কখনো কোথাও পায়নি। কখনো কোথাও পাবে না। এক মুহূর্তে যেন পাল্টে গেল অনেকটা, বয়স বেড়ে গেল যেন অনেকখানি। নিজেকে আলাদা মনে হলো সকলের থেকে, নতুন মনে হলো, ভাগ্যবান মনে হলো। একটা সময় থাকে মানুষ সকলের মধ্যে থেকেও ভারি একলা থাকে, কারণ তার নিজের কিছু ভাববার থাকে না। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য, তারপরেই এমন একটা সময় আসে যখন সে একা থেকেও আর একলা নয়। যখন সে নতুন, যখন সে অপূর্ব।

রোজ বিকেলে খেলারমাঠ থেকে সোজা দুজনে চলে যায় গজেনদের বাড়িতে। আজকাল আর দোতলার ঘরে তারা বসে না। চলে যায় তিনতলার নির্জন ঘরখানায়। সেখানেই পুরো ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে বাসায় ফেরে।

কোন কোন দিন গজেন তাকে বিপ্লবীদের কাহিনী শোনায়। গল্পের মত বলে গেলেও হর্ষের বুঝতে কষ্ট হয় না দেশপ্রেমাত্মক এই উত্তেজক কথাগুলো মোটেই গজেনের নিজের কথা নয়। হয় কারো মুখে শুনে, না হয় কোন বই পড়ে গজেন এগুলো অমন করে বলতে পারে।

দুটো আলমারী ভর্তি গজেনের বই আছে। হর্ষ মনে মনে আক্ষেপ করে, আলমারী দূরে থাক তার নিজের একটা শেলফ পর্যন্ত নেই। আর পাঠ্য বইয়ের বাইরে একখানা বইও কেউ কিনে দেয়নি তাকে। রোজ গজেনের কাছ থেকে একখানা করে গল্পের বই নিয়ে আসে বাড়িতে, পড়ে ফেরত দেবে বলে। তারপর হয় ইতিহাস নয় ভূগোলের মলাট ওভার কোটের মতো করে পরিয়ে রাত্রি বেলা সেই নিষিদ্ধফল ভক্ষণ করে। পদ্ধতিটা গজেনই বাতলে দিয়েছে, যদিও গল্পের বই তার বাড়িতে নিষিদ্ধ কিছু নয়।

সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই নেশাটা জমে উঠলো মন্দ না। ছুটির দিনে গজেনদের বাড়িতে পড়ার অজুহাতে চলে আসে, আর সারা দুপুর ধরে অনেক কিছু পরিকল্পনা চলে রোজ। না, বড়ো হয়ে তাদের বেশ উঁচু দরের সখের গোয়েন্দা হতেই হবে। কিরীটি রায়ের মতো, নয়ত প্রতুল লাহিড়ীর। গজেনের ইচ্ছেটা কিন্তু অন্যরকম। বড়ো হয়ে মোহনের মতো দুর্জয় দস্যু হয়ে তারা দেশ সেবায় নামবে। পরাধীনতার নাগপাশ মোচন করতেই হবে। আর হর্ষ যদি বন্ধু হয়েও লোভে পড়ে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে—

ফস কোরে বিছানার নিচ থেকে একটা ভোজালী বের করে দেখায়। একটু ভয় পেয়ে গেলেও সামলিয়ে নিয়ে আলগোছে হাত বাড়িয়ে ভোজালীটার ধার পরীক্ষা করতে ভোলে না হর্ষ। গজেন বাধা দেয় না, ওকে হাত দিয়ে লুব্ধ হবার সুযোগ দেয়। আহা, এমনি একখানা যদি তার থাকতো! বড়ো হলে তো দরকার হবেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতেই গজেন চট করে ভোজালীটা আবার লুকিয়ে ফেলে। হর্ষর বিস্তর সন্দেহ হয়, ওটা গজেনের নিজের নয়, বাড়ির কারো। এমন কি সেই বেঁটে নেপালী দরোয়ানটারও হতে পারে। হর্ষর চমক লাগাবার জন্যেই হয়ত লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে এসেছে।

গজেন একটু বেশী মাত্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল মনে হয়। কিন্তু তার আশঙ্কা ফলে নি। শুধু হর্ষর বুকের মধ্যে কেমন গুড় গুড় করে উঠেছে, অবশ হয়ে গেছে সমস্ত চেতনা, যখন লাল পশমের চটি পরে খরগোসের লোমের মতো দুধ-সাদা ফ্রক গায়ে অনেক দিনের চাপা পড়ে যাওয়া ধূপছায়া স্মৃতিটা কপাটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

আজকেও পালিয়ে যেত হয়ত, কিন্তু গজেন তার আগেই গম্ভীর গলায় ডাক দিল, শিউলি!

শিউলি দরজার কপাটে হাত রেখে বললো, কি-ই?

হর্ষ দেখলো ঘরের মধ্যে তাকিয়ে আছে শিউলি কিন্তু না গজেন না তার দিকে তার দৃষ্টিটা পৌঁছাচ্ছে। দুচোখে যেন কেমন একটা আবিষ্ট ঘুম জড়ানো। কিন্তু ঘুম কি দেখা যায়!

—কি চাই তোমার? গজেন তার কণ্ঠস্বরকে বয়স্ক করে তুলতে চেষ্টা করলো। চঞ্চল হাসিটা অমনি শিউলির ঠোঁটের ওপর বক্রোভ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শুধু ন্যাসপাতি-রঙ গালের ওপর দুফোঁটা রোদ্দুরের মত ইয়ারিং দুটো দুলে দুলে জ্বলতেই থাকলো।

ঘাড় দুলিয়ে সে বললো, কিছু না। অমনি।

কোঁকড়া চুলে ঢেউ লাগলো, দেবদারু গাছের কাঁপন লাগা পাতার মতন। শিউলি! শিউলি তাহলে মেয়েটির নাম। আশ্বিন মাসের হাল্কা মেঘের মত ফ্রকটা একটু একটু কাঁপছে হাওয়া লেগে।

—তবে?

বলেই গজেন এমনভাবে মুখ বাড়িয়ে তাকালো যেন এক্ষুণি তাহলে তার চলে যাওয়া কর্তব্য। এবং তাই করলো শিউলি, শুধু চলে যাবার আগে পলকের জন্য তার চোখ দুটো ছুঁয়ে গেল হর্ষকে। রক্তটা চলকে উঠলো বুকের মধ্যে।

বন্ধুর রূঢ়তায় মনটা খাপ্পা হয়ে উঠেছিল হর্ষর। পুরনো প্রসঙ্গ আর

জানলো না। কি একটা জরুরী দরকার হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বাড়ি যাবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো।

আজ সব চেয়ে আশ্চর্য বোধ হয় হর্ষর যে পুরো একটি বছর তার কেটে গিয়েছিল শিউলি এবাড়ির কে তাই জানতে। অথচ এই দীর্ঘ তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে মাত্র পঁয়ষট্টি দিনও সে ওবাড়িতে অনুপস্থিত থাকেনি। গজেন কোনদিন শিউলির প্রসঙ্গ তোলেনি তার কাছে, ওর স্বভাবই এই রকম। কোন কোন কথা বলেনা, কিছু কিছু আড়াল রাখে। আর হর্ষও এতটা বেহায়া নয় যে মুখ ফুটে শিউলির কথা তুলবে।

তবু তার সমস্ত চেতনার নেপথ্যে একটি ফুলের মত সুন্দর নাম উঁকি দিয়েছে, একটি ফুলের মত সুন্দর মুখ। ঘুমোবার আগে সমস্ত চিন্তাকে বিদায় দিলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে কই! চোখ বুজলেও দেখা তার বন্ধ হয়েছে কোথায়!

সেদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল হর্ষ, যাকে বলে বামাল সুদ্ধ। ইতিহাসের মলাটটা উল্টো করে লাগানোতেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। মা সেলাই করতে করতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, ঘর্ঘর শব্দে থেমে গেল কলটা।

—কি পড়ছিস? মা ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ করলেন গলাটা। হর্ষ চমকালেও বিচলিত হলো না।

বললো, কেন, ইতিহাস।

—ইতিহাস! মা উঠে এলেন সেলাই রেখে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ছদ্মবেশ উন্মোচন করে মোহন আত্মপ্রকাশ করলো। মা ছেলের এতখানি অধঃপতন আশা করেননি, এ তাঁর ধারণারও বাইরে। ছেলেকে এতদিন অন্যরকম জানতেন। কিন্তু দুচার পাতা ওল্টাতেই শিউরে উঠলেন জায়গায় জায়গায় আণ্ডার লাইন দেখে।

ঠাশ করে গালে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, এই বিষ গেলা হচ্ছে কতদিন থেকে?

আর কি লজ্জা সেই সকাল বেলায়, নতুনবৌদি একেবারে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আজ পাকা পনের দিন পরে তাঁর সঙ্গে হর্ষর দেখা হলো। নিরুত্তরে চোখ নিচু করলো। লজ্জায় তখন তার মাথা কাটা যাচ্ছিল। মার খাওয়াটা নিশ্চয়ই ওঁর নজর এড়ায় নি।

নতুনবৌদিকে দেখেই মা সঙ্কল্পচ্যুত হলেন। পাশের ঘরে গিয়ে আক্ষেপের কাহিনী শুরু করে দিলেন মা। পাঁচটি নয়, দশটি নয়, একটি মাত্র ছেলে। এও যদি বই পড়ে পড়ে বয়ে যায়—আর যাবেই বা না কেন, মোহনের একটুখানি দাম্পত্যালাপ সাবিত্রীবালার কণ্ঠে উদ্ধৃত হলো, ভয়াতুর কপোতী আমার! ছিঃ ছিঃ ঘেন্নায় মরি, ছাপা অক্ষরে এসব মাথা খাওয়া কথা কেন বাপু!

নতুনবৌদি বোধহয় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিলেন, কারণ একটু পরেই আবার শোনা গেল,—না এসব হাসির কথা নয়, কাণ্ডটা ভেবে দেখ দিকি একবার!

পরদিনই, বাবা বাড়ি আসতে হর্ষর ব্যবস্থাটা পাকাপাকী হয়ে গেল। নতুনবৌদির স্বামী অনিরুদ্ধ রায়ের কাছে শনিবার রবিবারে তার পড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এর পিছনে যে কার ষড়যন্ত্র আছে তা চোখ বুজে টের পেল হর্ষ।

ব্যস, শেষ হয়ে গেল। কিছুদিন যাও বা একটু স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল তা এখন থেকে চুকে বুকে গেল। খেলার মাঠে যাওয়া বন্ধ হলো না বটে, কিন্তু ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়িতে না ফিরলে হুলস্থূল পড়ে যাবার রীতিমত ভয় থাকে।

সুতরাং এক্ষেত্রে ছাদই ভালো। স্কুল থেকে ফিরে সটান নতুনবৌদিদের ছাদে চলে আসে খেলার মাঠে না গিয়ে। নতুনবৌদি বিকেলের গা ধোয়া শেষ করে লুডু নিয়ে বসেন, কিংবা বাঘবন্দী। ক্যারম চলে কোন কোন দিন, যে দিন মন্দিরা আর তার বন্ধু মালতী এসে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। তারপর অনিরুদ্ধদা ফিরলেই সন্ধ্যে বেলার গা ঘেঁষে খেলার আসর ভেঙে যায়।

আসলকথা, নতুনবৌদি নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, মনের মতো একজন সাথী জোটালেন। আর নতুনবৌদির জন্যও কি হর্ষর কম গর্ব। তিনি কি শুধু সুন্দরী? তিনি আই, এ পর্যন্ত পড়েছেন, সুন্দর গান জানেন এবং সে গান হর্ষ মাঝে মাঝেই শুনতে পায় তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি একলা ঘরে থাকলেই। হয়ত গুনগুনিয়ে গান গাইছিলেন একা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, হর্ষ এসে পড়েছে এমন সময়। এখন গান বন্ধ করবার উপায় নেই, বরং গলাটাই চড়াতে হবে তাঁকে।

অনিরুদ্ধ রায়ের কাছে পড়তে ভারী মজা লাগে হর্ষর। তার কারণ বোধকরি পড়াবার মত করে তিনি পড়ান না। গল্পের মত বলে যান, একে একে ছবির পর ছবি ভেসে ওঠে তাঁর প্রতিটি কথার ঢেউ লেগে। তারপরে সমালোচকের মত ধারালো যুক্তি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটেন প্রতিটি ঘটনা, বিশ্লেষণ করেন প্রতিটি চরিত্র। ছাপার হরফের মধ্য দিয়ে পাঠ্য বইগুলো যে-কথা বলে ফেলেছে চিরকালের মতো, সেইটেই শেষ কথা হয় না, আরো কথা থাকে। পাঠ্যের চেয়ে পাঠক ছোট নয়, যদি সে নির্ভীক ভাবে চিন্তা করতে জানে। আর তাই তো ইতিহাসকে মনে হয় না ইতিহাস বলে, ভূগোলকে সন্দেহ হয় না ভূগোল। জ্ঞানের জগতে আর কাব্যের জগতে তখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় না। নইলে কালিদাসের মেঘদূত একখানা মানচিত্র সর্বস্ব ভূগোলের বই হয়ে যে উঠতো তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

অনিরুদ্ধদার এইসব কথা নতুনবৌদিও মাঝে মাঝে শোনেন মনোযোগী ছাত্রীর মত।

সেদিন আসন্ন বিকালে ঘরে ঢুকে হর্ষ দেখলো খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে নতুনবৌদি কি যেন সেলাই করছেন। মাথা ঘষেছেন তাই চুলগুলো ধোঁয়ার মত ফুলে উঠেছে, মুখে একটা গেরুয়া আভা।

—কি সেলাই করছেন বসে বসে ?

কথা বললেন না নতুনবৌদি, দাঁতে ছুঁচ রেখে চোখের ইসারায় জানালাটা দেখালেন খাটের পাশের। তারপরে পা গুটিয়ে নিয়ে হর্ষর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বললেন, পর্দা। তোমার পা কেমন এখন, অনেকটা ভালো ? যাক তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। কি যে তোমাদের গুঁতোগুঁতি করে ফুটবল খেলা ভাই, ভেবে মরি !

খাটের ওপর বসতে যাবে এমন সময় দুজনেরই চোখ বড়োবড়ো হয়ে উঠলো। হাতের পর্দাটা একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুনবৌদি দ্রুত হাতে জানালার খড়খড়ি বন্ধ করতে লাগলেন। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকলো হর্ষ, ভাঙা পা-টা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো উত্তেজনায়, ভয়ে।

সাইরেন বাজছে। ভূতুড়ে কুকুরের একটা বিকট কান্না যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে আকাশে। তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে, সেই আবছা অন্ধকারের ভেতরেও ভয়টা ঠিক চিনতে পারলেন নতুনবৌদি। হাত বাড়িয়ে প্রায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—ভয় কি ?

ভয়ের কিছু নয় হয়ত, কিন্তু ভরসারও নয়। কাঠ হয়ে বিছানার ওপর বসে রইল নতুনবৌদির মুখোমুখি হয়ে। মনে মনে মৃত্যুরও বুঝিবা।

নতুনবৌদির শরীরের উত্তাপটা যেন হর্ষর সারা শরীরে জড়িয়ে গেছে। প্রায় দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে হর্ষর, তবু নিজেকে সরিয়ে নিতে সাহস পাচ্ছে না। পাছে নতুনবৌদির অন্যমনস্কতা ভেঙে যায়। কি যেন ভাবছেন নতুন-বৌদি, দেওয়ালে টাঙানো অনিরুদ্ধদার প্রকাণ্ড ছবিখানার দিকে তাকিয়ে। চোখের দৃষ্টিটা যেন কিরকম দূরমনস্ক, অস্পষ্ট, আবছা। এক কথায় নতুনবৌদির এখন খেয়াল নেই, সম্বিত নেই। হর্ষর যেমন মাঝে মাঝে হয়।

এমন সময় আবার সাইরেন বেজে উঠলো, যাক বিপদ কেটে গেল এযাত্রার মতো।

স্বস্তির নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে একটা আরাম নেমে এলো হর্ষর।

আর সেই মুহূর্তেই ঘরের কড়াটা নড়ে উঠলো বেশ জোরে জোরে। তাড়া-তাড়ি গায়ে আঁচল জড়াতে জড়াতে ব্যস্ত হাতে দরজা খুললেন নতুনবৌদি।

না, অনিরুদ্ধদা নন, নিচের তলার ভাড়াটেদের ছোট ছেলেটা। বৌদি তার দিকে রাগত চোখে তাকাতেই সে হাত বাড়িয়ে বললো, চিঠি, এতক্ষণ আসতে পারিনি।

নীল মোটা খামখানা হাতে তুলে দিয়েই পালালো ছেলেটা। জানালাটা হাত বাড়িয়ে খুলে দিল হর্ষ। গাঢ় বিকেলের খানিকটা তাজা আলো ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে।

নতুনবৌদির ঠোঁটের হাসিটা শক্ত হয়ে ধারালো হয়ে উঠলো খামের ওপর চোখ বুলোতেই। ডিমভরা মাছের মত মোটা খামটা ছিঁড়ে ফেলতেই খান চারেক পাতার চিঠি বেরুলো।

খাটের ওপর বসেই হর্ষ একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে নতুনবৌদি চিঠিটা পড়তে লাগলেন, নাকের পাপড়ি দুটো ফুলে উঠলো মাঝে মাঝে, নিশ্বাস একটু ঘন হলো। কোন খারাপ সংবাদ নয়ত ?

কিন্তু পড়া শেষ করেই দেশলাই ঠুকে আগুন দিলেন চিঠিটার মুখে, রঙিন পাতাগুলো কুঁকড়ে কালো হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

করুণ চোখে সেই ভস্মাংশের দিকে তাকিয়ে হর্ষ বললো, কে বউদি ?

তার এই অত্যন্ত পরিপক্ক ভঙ্গির প্রশ্নটি শুনে তিনি একটুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর ঝাঁঝালো গলায় ধমক দিলেন, অত সব খবরে তোমার দরকার কি !

ভীষণ অভিমান হলো। নতুনবৌদিও কিছুক্ষণ কথা বললেন না, পরে উঠে গিয়ে দুম দুম করে খাটের পাশের জানালাটা বন্ধ করে বললেন, আজ বাড়ি যাও।

অপমানে হর্ষ দাঁড়িয়ে পড়লো এক নিমেষে। একটা কথাও না বলে খোঁড়া পা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিরুদ্ধ রায় তার দুর্বার বেগ লক্ষ্য করলেন।

জনার্দনবাবুও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে নিজেকে একটু একটু সরিয়ে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। যে কদিন বাড়িতে থাকেন, একটা আলাদা ঘরে একাই থাকেন। এই ঘরটা বাড়ির এক কোণে, এমনিতেই নির্জন, তাতে আরো নির্জন করে রাখবার ব্যবস্থা করেন তিনি। শীতকাল হলে জানালা দরজা ভেজানো থাকে সব সময়। মোজা, উলের টুপী, মাফলার জড়িয়ে প্রকাণ্ড তাকিয়ার মতোবালিশটায় হেলান দিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি। চোখ বুজেই থাকেন বেশি সময়। কি যেন ভাবেন রাতদিন। হয়ত নিজের জীবনের কথা, হয়ত নয়। হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর বয়সী যাঁরা এখনো ডালহৌসি-এসপ্ল্যানেডময় ছুটোছুটি করছেন দু'বেলা, বাড়ি করেছেন গাড়ি করেছেন, তবু ইচ্ছার আর অধ্যবসায়ের অন্ত নেই। তাঁরা কেউ কেউ তাঁর বন্ধু, কেউ কেউ তাঁর জানা চেনা ব্যক্তি। ফিরপো, ক্যাগানোভা, গ্রাণ্ডের নৈশ টেবিলেও তাঁদের হাত পৌঁছায় মাঝে মাঝে। কেউ ফ্ল্যাশ খেলেন রাত জেগে, ঘোড় দৌড়ের মাঠে ঘুরে আসেন নিয়মিত।

তাঁরা সকলেই ঘোর সংসারী, সংসারের জন্যেই তাঁরা ছুটছেন, চারপাশের প্রতিবিম্বকে ঠেলে ওপরে উঠছেন দক্ষ সাঁতারুর মতো। কিন্তু কেউই বাঁধা পড়েন নি সংসারের বেড়া জালে, নিজেদের সখ আমোদ নেশা কিছুই বাদ পড়েনি অথচ সংসারের কর্তব্যও অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও।

আর তিনি ? আদর্শ ছিল, আকাঙক্ষা ছিল, কিন্তু অদম্য উৎসাহ ছিল না মনে। সংসারের কাছে প্রথমেই অনেক কিছু চেয়ে বসেছিলেন, কিন্তু আগে যে সংসারকেই তাঁর দেবার ছিল সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। বই পড়েছেন বিস্তর। দেশ বিদেশের কথা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবন কাহিনী পড়তে পড়তে উদ্দীপনা পেয়েছেন, শেক্সপীয়র পড়তে পড়তে পাগল হয়েছেন প্রায়।

উপকরণ ছিল বিস্তর, কাজে লাগলো না। মনে মনেই মাটি হলো নিজের ঘরকুণো স্বভাবের জন্য, শান্তিপ্রিয় চরিত্রের জন্য। হলো না, কিছুই হলো না তাঁর ! প্রথম জীবন থেকেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে আসতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। যা তিনি চান নি, যা তিনি মন থেকে অপছন্দ করেছেন তাই জড়ো হয়ে উঠেছে চারপাশে। কে জানে হয়ত এই সংসার, এই ছেলে মেয়েও তিনি চান নি। তাঁর মনের স্বপ্নের সঙ্গে একটা রেখাও মেলেনি এর। হয়ত আর কিছু চেয়েছিলেন, আর কিছু হয়ে উঠতে।

আজ হঠাৎ নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেছেন। বুঝতে পেরেছেন এত দিন অভিনয় করে এসেছেন তিনি এ সংসারের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। কুশলী অভিনেতার মতো নিজেই মুগ্ধ হয়েছেন নিজের অভিনয়ে, ভুলে গেছেন তিনি আর কারো ভূমিকায় নেমেছেন।

আজ তিনি ক্লান্ত। মনে মনে মুক্তি চাইছেন, আর পারছেন না বলেই। ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে, ছেলের কাছ থেকে, মেয়ের কাছ থেকে, নিজের মূর্খ, সুন্দরী, অন্ধবিশ্বাসী স্ত্রীর কাছ থেকে। হয়ত এতটা নির্মম হতে তিনি কোন দিনই পারতেন না, কেন না এমনিতেই তাঁর মনটা বড়ো কোমল। বড়ো ভাবপ্রবণ, একটুতেই চোখে জল এসে যায়। কিন্তু যুদ্ধ তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিল, নির্মম হয়ে উঠবার, নিজের অপছন্দ সৃষ্টিকে নিস্পৃহ হাতে টুকরো টুকরো করে ফেলবার।

কিন্তু তিনি ভাস্কর নন, চিত্রকর নন, সামাজিক দায়িত্ব আছে তাঁর। নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ফেলতে তিনি তাই চাননি। শুধু দীর্ঘ নিঃসঙ্গতার অবকাশে নিশ্চিহ্ন করে ভুলতে চেয়েছেন যে, এরা তাঁর আপনার কেউ; আত্মার আত্মীয়। শুধু এইটুকু মাত্র। আর্থিক যোগাযোগ ছাড়া অপর কোন গ্রন্থীতে তিনি বন্দী হবেন না।

ছেলে মেয়েই বা কেন বাধ্য থাকবে তাঁর কাছে। মনে মনে তাদের প্রাপ্য তো তিনি দিচ্ছেন না। তাঁর স্ত্রীই বা কেন সেবা দাসী হয়ে থাকবে চিরদিন, একটা মুখের মন্ত্রের কি এত জোর, সাতটা পাকের কি এত শক্তি? মন নেই যেখানে সেখানে শরীরও নেই, কিন্তু শরীর নেই যেখানে মন আছে সেখানেও। স্ত্রীর প্রতি তিনি অবিবেকী নন, কিন্তু কি করবেন, এখানকার সমাজ বন্ধন অন্য রকমের, এদেশের অশিক্ষিত মেয়েরা আরো ভয়ানক।

মাঝে মাঝে একটা অতি তীব্র অভিমান হয় জনার্দনবাবুর। ইচ্ছে হয় ধূলোয় মিশিয়ে দেন নিজেকে। একটা দমকা হাওয়ায় নয়, ধীরে ধীরে মৃদু বিষক্রিয়ার মতো। নিজের জন্যে কিছু করতে তিনি দুঃখ পান। জামায় কাপড়ে শখে আমোদে তিনি নিজেকে ছেঁটেছেন, অতি নির্মমভাবেই ছেঁটেছেন। এমন জুতো পায়ে দিয়ে তিনি পথে বেরোন যাতে করে পদমর্যাদা কেন, কোন মর্যাদাই প্রকাশ পায় না।

কিন্তু জনার্দনবাবুর মনে এখনো একটা সুপ্ত বাসনা আছে, সেটাকে যদি কেউ পলায়নী মনোবৃত্তি ভাবেতো ভাবুক। আর কটা বছর মাত্র চোখ বুজে কাটিয়ে দেবেন তিনি, এই একই ভাবে শুয়ে থেকে আর সময় মাফিক ডিউটিতে গিয়ে। তারপর কোনক্রমে ছেলেটাকে নিজের ডিপার্টমেণ্টে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি সটান দেশের বাড়িতে চলে যাবেন। সেখানে তাঁর ছোটকাকা যেমন একা আছেন, তিনিও তেমনি থাকবেন। জমি জমা যা আছে দেখা শুনা করলেই

তাঁর চলে যাবে, ইচ্ছে হয় পেনসন নেবেন, নয়ত নেবেন না, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে সেই টাকাটা সাহায্য করা হবে।

তবে যতই রিটায়ারের সময় এগিয়ে আসচে ততই অধৈর্য বাড়ছে। মনে হচ্ছে, দিন বুঝি আর কাটতে চায় না। যাবজ্জীবন কয়েদীর মতো তিনি ডায়েরীর পাতায় একটা করে তারিখ কেটে রাখেন এক একটা দিন শেষ হয়ে গেলে। এই গলির জীবন থেকে মুক্তি তাঁকে পেতেই হবে। দেশের উদার আকাশ, অবারিত মাঠ তাঁকে ডাকছে।

তিনি একা আবার সেখানে ফিরে যাবেন, সেখানে ফিরে না গিয়ে তাঁর উপায় নেই।

দেওয়ালের প্রকাণ্ড ক্যালেণ্ডারখানা একটু হাওয়া লেগে খরখর করে উঠলো। জনার্দনবাবু সেই দিকে তাকালেন। ঐ ছবিটা যতবার তিনি দেখেন ততবার তাঁদের পাবনার বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। এমনি একখানা ছায়াধরা একতলা বাড়ি, সামনে ছোট্ট একটুখানি ফুলের কেয়ারি, একটা সজনে গাছ, একটা ইঁদারা এবং ইঁদারার পাশে একটা শিউলি গাছ। লালরঙের একতলা বাড়িটার দুকোলে দুটো দুটো জানালা, পেটের ভিতর একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দা, বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে। বারান্দার পেছনে ঘর, দুপাশে ঘর, ভেতরে এগিয়ে গেলে অন্দর মহলের বারান্দা, তারপর মাটির উঠোন, উঠোনের অপর পারে রান্নাঘর, চানের ঘর ইত্যাদি লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মূল বাড়ির সঙ্গে তাদের দৈহিক সম্পর্ক নেই, একটা ভুসভুসে গাঁথনির ইঁটের নিচু প্রাচীর দিয়ে তাদের অন্তরঙ্গ করা হয়েছে।

ক্যালেণ্ডারের তেরঙা ছবিতে অবশ্য অতটা খুঁটিনাটি ধরা পড়েনি, সবুজ গাছের অস্পষ্ট অথচ ঘন জমির দিকে পিঠ করে বাড়িটা শুধু মুখোমুখি ইঁদারা, শিউলি আর সজনে গাছকে পেয়েছে। সামনের চকচকে বড় রাস্তা থেকে ছবিটার শুরু এবং শেষ হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকতি বারান্দাটার নিখুঁত সজ্জার মধ্যে।

ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জনার্দনবাবুর গা ভারি হয়ে ওঠে পূর্বকালের একটা বোবা আনন্দে, মনে হয় তিনি তাঁর পনের বছর বয়সে ফিরে গেছেন। মনে হয় এই মাত্র সভাস্থ সকলে উঠে যাবার পর তাঁর বাবা পাণ্ডুলিপি আর হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কেন, সেটা কি খুবই অসম্ভব? অন্তত: তাঁর কাছে তো নয়, যখন তিনি ঐ বারান্দার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন। বেতের পাঁচখানা চেয়ার পঞ্চজন্য সাজানো রয়েছে এবং মাঝখানে পাঞ্চজন্য বেতের মোড়া আর ছোট টেবিলটা। এই পঞ্চজন্য এবং পাঞ্চজন্যের রহস্য আজকের দিনের আর কেউ জানে না, সেকালের কেউও জানতো না, একমাত্র তাঁর বন্ধু সতীশ ছাড়া। সতীশই রসিকতা করে নামটা দিয়েছিলেন। পাঁচখানা চেয়ারে বসতেন পাবনা টাউনের পাঁচজন বিখ্যাত

ব্যক্তি। তিনজন ডাকসাইটে উকিল, হাইস্কুলের হেডমাস্টার, আর পঞ্চাননবাবু। পঞ্চাননবাবু কে ছিলেন এবং ঠিক কি ছিলেন জনার্দনবাবু নির্দিষ্টভাবে জানতে পারেন নি কোন দিনই। তবে তিনি যে পাঁচজনের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সাহিত্য ও শাস্ত্র রসিক ছিলেন তা অনুমান করে নিয়েছেন। এবং এই পাঁচজনের জন্য যিনি মধ্যমণি হয়ে বসতেন, তিনি সামনে ছোট টেবিলটা নিয়ে বেতের অদ্ভুত গড়নের মোড়াটার ওপর বসতেন। তিনি এই গৃহের গৃহস্বামী এবং এই আসরের কথক। প্রতি রবিবারের বিকালে প্রবল সভা বসতো। সেদিন কথক তাঁর নিজের রচনা পাঠ করে শোনাতেন, সপ্তাহভর তাঁর বন্ধুদের জন্য যা লিখেছেন। রসিক শ্রোতারা নিঃশব্দ হয়ে শুনতেন এবং সভা শেষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যে যাঁর বাড়ি ফিরে যেতেন।

জনার্দনবাবুর বাবা, শিবশঙ্কর চৌধুরী প্রকৃত বন্ধুবৎসল এবং মজলিশি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রবিবার ছাড়াও সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে সন্ধ্যার কোল ঘেঁষে ঐ বারান্দায় মজলিশ বসতো। হাস্যরহস্য, রম্য আলোচনা সবই চলতো কিন্তু এত মৃদু তালে, এত মার্জিত সংযমের সঙ্গে যে, অন্দর মহলে তার গুঞ্জন ছাড়া কিছু পৌঁছতো না। কোনদিন বারান্দা কাঁপানো হাসি শোনেন নি জনার্দনবাবু, নানা প্রসঙ্গে তর্ক বেধেছে প্রায় প্রতিদিনই কিন্তু তার উচ্চরোল প্রতিধ্বনি শোনা যায় নি কোন দিন। অর্থাৎ যে পাঁচজন এই আসরের আসরী ছিলেন, তাঁরা শুধুই শিক্ষিত ছিলেন না, গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতেও জানতেন। অতি নিকটে গিয়ে না দাঁড়ালে অর্থাৎ আলোচনা স্বকর্ণে শুনতে না পেলে বোঝা দুষ্কর ছিল কোনো গুরুতর বিষয়ের আলোচনা চলছে, না হাস্য পরিহাস হচ্ছে। প্রায় কেউই হয়ত হাসছেন না, কেবল কথার পিঠে কথা পড়ছে, ঘোরানো কথা, ফেরানো কথা, যেন রঙের তাস পড়ছে; বুদ্ধির লুকোচুরি চলেছে, বাচন ভঙ্গির দৌড় চলেছে এবং কারো হাত থেকে শেষ পর্যন্ত যখন ইস্কাপনের টেক্কা ছিট্‌কে আসছে, তখন হাসি।

শেষ দিকে শিবশঙ্করের পশার কমে গিয়েছিল তাঁর সততার জন্যে, সত্যবাদিতার জন্যে। কোর্ট থেকে অনেকদিনই শূন্য হাতে ফিরতেন। তাঁর বন্ধুর দল, ভক্তের দল এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে দুঃখ করতেন কারণ শিবশঙ্কর তাঁর আদর্শটাকে একটু হেলালেই যথেষ্ট রোজগার করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে নিজের দুঃখ নিজে ডেকে আনছেন ছাড়া আর কি বলা যায়। আজকাল কটা কেস আর সৎপক্ষের তরফ থেকে হয়। মামলাবাজ তারাই যারা ধনী, এবং অর্থ তাদেরই থাকা সম্ভব যারা নিত্য নতুন অনর্থ বাধাতে জানে। সুতরাং তাদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা আর হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা একই কথা। তবু শিবশঙ্করের মুখের ওপর এই কথাটা শোনাবার মতো সাহস তাঁর অতিবড় বন্ধুরও ছিল না। শিবশঙ্করের প্রতি একবাক্যে মাথা নোয়ায় না, শ্রদ্ধা করে না এমন

লোক তখনকার আধখানা পাবনা টাউনে কেউ ছিলেন না। সত্যিকারের বিদ্বান সত্যিকারের কবি প্রকৃতির এবং সমুদ্রের মতো উদার হৃদয় লাখে একজন মেলে না। তা তিনি নাই বা করতে পারলেন বাড়ি, নাইবা রাখলেন বিষয় আশয়। ভাড়া বাড়িতে বাস করলেও তাঁর মর্যাদা অক্ষয়, তাঁর সুনাম অব্যয়।

শেষদিকে এমন হয়েছে মায়ের মুখে শুনেছেন, নিজেও দেখেছেন জনার্দনবাবু, বাড়িতে হয়ত একদিন রান্নাই চড়েনি। পরদিনই কোর্ট থেকে এক থোক টাকা যদি পেয়ে গেছেন শিবশঙ্কর, গত দিনের দুঃখ ভুলে গিয়েছেন একেবারে। সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। বারান্দায় যথারীতি সুখাদ্য পেঁৗছেচে, মূল্যবান তামাক পুড়েছে গড়গড়ায়। ভেতর বাড়িতে হয়ত সারাদিন শাকভাত গেছে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় বাইরের বারান্দায় ভোজ্য প্রাচুর্যের অভাব ঘটেনি। শিবশঙ্করের স্ত্রী শুভলক্ষ্মীর চোখের জল রান্নাঘরেই ঝরেছে, রান্না ঘরেই শুকিয়ে গেছে। চার পাঁচটা ছেলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছে। যাঁব সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে তিনি গুণী মানী সব কিছুই কিন্তু সংসার জ্ঞান কাণাকড়ির নেই। সকলের মনের কথা তিনি নখ দর্পণে রাখেন কিন্তু ঘরের কোন খবর রাখেন না। শয্যার অর্ধ শরীকানা যাঁর, তাঁর মনের খবর তিনি রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। তিনি হয়ত মূর্খ কিন্তু তাঁরও সখ আছে, সৌভাগ্য কামনা আছে। ঘর সাজাবার বাসনা আছে। দুঃখ আছে, চোখের জলটাও একেবারে কিছু শুকিয়ে যায়নি। কিন্তু সে কথা বোঝে কে।

বাবাকে বরাবর দূর থেকেই দেখেছেন জনার্দনবাবু। কাছে গিয়ে দাঁড়াবার, কথা বলবার, সাহস এবং সৌভাগ্য কোনটাই ছিল না তাঁর। অতি ছেলেবেলার কথা ভাল স্মরণ হয়না, যে বয়েসটার স্মৃতি এখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না সে বয়েস থেকে বাবাকে লুকিয়ে-এড়িয়েই চলতে শিখেছেন। বাবাকে চিনেছেন বাবার মৃত্যুর পরে ভালো করে। দু-তিন গাড়ি বই আর হাজার দেড়েক পাতার পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছিলেন শিবশঙ্কর। বন্ধুদের জন্য যা লিখেছিলেন, বন্ধুদের অনুরোধে, পীড়াপীড়িতে। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক উপন্যাস দুখানা আর কিছু কবিতা, কিছু অনুবাদ কবিতা। কবিতাগুলো খুব কিছু নতুন নয়, মামুলি বিষয়ে, গতানুগতিক পদ্ধতিতে লেখা। পাখির নামে, ফুলের নামে, নদীর নামে। কিন্তু মনকে নাড়া দিয়েছে পড়তে গিয়ে গদ্য কীর্তি দুখানাই। হ্যাঁ কীর্তি বলেই মনে হয়, জনার্দনবাবুর কাছে তারা অক্ষয়কীর্তি। কতবার যে পড়েছেন সেই কষকালিতে লেখা ছাপার মতো ঝরঝরে সুন্দর হাতের লেখা, শ্রীকৃষ্ণলীলা আর গৌড় বিজয় দুখানা। উপন্যাসের রস, কবিতার রস, ইতিহাসের রসদ একত্র এত সুন্দর জমেছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বারবার মনে পড়েছে।

একটা অংশ জনার্দনবাবুর নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখস্থ হয়ে গেছে, যখন খুশী চোখ বুজলেই দেখতে পান। সেটি শ্রীকৃষ্ণলীলার রুক্মিণীর পত্র। সাহিত্যিক মূল্যে নয়, সেটি অন্যকারণে তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছে, শুধু তাঁর মনের সঙ্গেই নয়, জীবনের সঙ্গেও যেন।

রুক্মিণী লিখিলেন—"দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ! পত্রবাহক অপরিচিত ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাকে অবিশ্বাস করিও না। ব্রাহ্মণ আমারই প্রেরিত। আমি বিদর্ভ নগরের রাজকন্যা। দেবর্ষি নারদের মুখে তোমার গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া আমার মন তোমার পক্ষপাতী হইয়াছে কিন্তু আমার পিতা ও ভ্রাতা আমাকে চেদিরাজ শিশুপালের সহিত বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া তাহাকে সংবাদ দিয়াছেন। বিবাহের দিন নিকটবর্তী। অদ্য হইতে সপ্তাহকাল যেদিন পূর্ণ হইবে সেইদিনই আমার বিবাহ হইবার কথা, বড় বিপদে পড়িয়া তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। অবিলম্বে আসিয়া আমাকে শিশুপালের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার চরণ সেবার অধিকার প্রদান কর, এই আমার প্রার্থনা। ক্ষত্রিয় বালিকার শত অপরাধ মার্জনা করিয়া অবশ্য আসিও। আমি তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।"—এই লিখিয়া পত্র বন্ধ করিবেন এমন সময় কি ভাবিয়া পুনরায় পত্রের নিচে আরও কয়েক পংক্তি লিখিয়া দিলেন—"শুনিয়াছি তুমি নাকি অপরের আশা পূর্ণ করা অপেক্ষা ভঙ্গ করিয়াই বেশী আনন্দিত হও, পরকে হাসান অপেক্ষা কাঁদাইতেই অধিক আমোদ পাও; আমার বেলা দয়া করিয়া তোমার স্বাভাবিক নিয়ম একটু পরিবর্তন না করিলে আমি বড় বিপদে পতিত হইব।"

চিঠিটা পড়া হয়ে যেতেই জনার্দনবাবু আবার চোখ মেললেন। শিয়রের দিকে ঘাড় ফেরাতেই লেটার বক্সের মতো উপরের পাটখোলা জানালাটা নজরে পড়লো। ফুরুৎ, ফুরুৎ। দুটো উড়ো চিঠি ছিটকে এলো জানালা দিয়ে ধূসর বাদামী রঙের ছোট দুখানা ডানায় ভর করে, চিরিক্ চিরিক্ ডাকে ঘর ভরে দিয়ে। লাল ঠাণ্ডা সিমেণ্টের মেঝের ওপর সকাল বেলার রোদ সবে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, চড়ুই দুটো তাদের ধান ঠোঁটে রুটির টুকরো খুঁজে বেড়ালো, শূন্য চায়ের কাপের সামনে মুহূর্তখানেক দার্শনিক সেমিকোলন হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপরে খুনসুড়ি সুরু হলো আবার, চিরিক চিরিক চিক্।

জনার্দনবাবু সাঁতার জানা লোকের মতো আবার স্মৃতির অতলে ডুবে গেলেন। আবার ভাবতে লাগলেন রুক্মিণীর চিঠিটা ঠিক যেখানে শেষ হয়েছিল তারপর থেকে। চোখের পাতা দুটো আবেশে ভারি হয়ে নেমে এলো আবার।

রুক্মিণীর চিঠিটার যেখানে শেষ আর একটা চিঠির সেখানে শুরু। চিঠিটা বিদর্ভ নগর থেকে আসেনি, এসেছিল সাগতা গ্রাম থেকে, এবং অমনি কষ কালিতে, যে কালিতে রুক্মিণীর কাতর অনুনয় প্রকাশ করেছিলেন শিব-

শঙ্কর একদা। কালের বিচারে দ্বিতীয় পত্রখানাও পৌরাণিক সংগ্রহশালায় এতদিনে জমা পড়েছে হয়ত, তবু জনার্দনবাবুর নিজের কাছে তা গত পর্শুদিনের কথা বলে মনে হয়, একটুও ঝাপসা নয়, রঙ ফিকে নয়, রক্তের মধ্যে সেই দিনটির প্রতিধ্বনি এখনও ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। ছোটকাকার পরিচ্ছন্ন, নিরুত্তাপ সাধু-ভাষায় লেখা কয়েকছত্র অনুরোধ এবং তৎসহ চিঠিকে টেলিগ্রাম জ্ঞান করে চলে আসবার উপদেশ।

ঢাকুরিয়া লেক কাটা হচ্ছে তখন। জনার্দনবাবু তার ঠিকাদারী করেন। অতীতটা অনেকদিন থেকেই ন্যাতাবুলোনো শ্লেটের মতো। বর্তমানটাও আনকোরা নতুন, একটা সরু সাদা রেখার নবীন যাত্রা যেন। বিগতদিনের সাহসী ইসারার একটু আবছা ভঙ্গিও অবশিষ্ট নেই, যার ওপর নিশ্চিন্তমনে দাগা বুলোনো চলতে পারে, নির্ভর করা চলে। ভবিষ্যতটাও ভাদ্রের পদ্মার মতো, পার দেখা যায় না, পারাচটা আয়নার মতো, মুখ দেখা যায় না, সমস্ত অনু-মানটাই শূন্যে পাক খেয়ে ফিরে আসে। তবু তখন বয়সটা পঁচিশের কোঠায়, ইচ্ছেটা দিগ্বিজয়ী রকম একগুঁয়ে, আর স্বাস্থ্যটা অভাবনীয় রকম ভালো। পারদকে ঝাঁকানি দিয়ে যত নিচেই নামানো যাক, উত্তাপ পেলেই আবার সে উঠবে। বাবার আকস্মিক মৃত্যু জনার্দনবাবুকে কপর্দকশূন্যতার যে স্তরেই ঠেলে দিক না কেন, তিনি আবার উত্তাপেরই খোঁজ করে বেরিয়েছেন। বাস্তব জীবনে পাবনার বাসা আর প্রথমজীবনের সমস্ত কিছু ইতিহাস মুছে গেছে চিরদিনের জন্যে, সাগতার জঙ্গলী অঞ্চলের ভিটেয় আর একখানা খোড়ো ঘর অন্ততঃ উঠেছে। ছোটকাকার সঙ্গে, বিভীষণা ছোটকাকীমার সঙ্গে তখনও একান্নবর্তী সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি তাঁদের. জনার্দনবাবু মা বোন ভাইকে খোড়ো চালের নিচে রেখেই বিদেশে বেরিয়ে পড়েছেন রুজি রোজগারের সন্ধানে। সৎ উপায়ে যত প্রকার চেষ্টা সম্ভব সাধ্যমত তা তিনি করেছেন, ছোট খাটো হেন কাজ নেই যা তিনি করেন নি। ক্যানভাসারী থেকে শুরু করে ঠিকাদারী পর্যন্ত।

বাঁচবার জন্যে, বেঁচে থাকবার জন্যে, যখন নির্লজ্জ লড়াই চলেছে, সেই রুদ্ধশ্বাস বিব্রত দিনগুলোতেও জনার্দনবাবুর মনের মধ্যে থেকে একটা আশ্চর্য বিক্ষেপ রঙিন যন্ত্রণার ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়তো দেহের সমস্ত শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে। আর তখনই তিনি বুঝতেন তাঁর চেয়েও অনেকগুণ শক্তিশালী একটি উত্তমপুরুষ তাঁর মনের মধ্যে সব সময় বেঁচে রয়েছে, ঘুমিয়ে থাকলেও তার জেগে না উঠবার কোন স্থিরতা নেই। জেগে উঠলে কেউ তাকে রুখতে পারবে না, তিনিও না। আর সেই ঢেউটা, সেই রঙিন যন্ত্রণাটা মনের মধ্যে একটা বৃত্তাকার কম্পন তুলে বসেছে। কি যেন তাঁর হওয়ার ছিল হয় নি, কি যেন তাঁর পাওয়ার ছিল পান নি। একে একটা অতিচেতন মনের কান্না বলেই উত্তর বয়সে তাঁর ধারণা হয়েছে।

কিন্তু সেই চিঠিটা। সেই চিঠিটাই তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। অর্থাৎ তারপর থেকে যা যা ঘটে গেছে তা হয়ত ঘটার কথা ছিল না। একটি পিতমাতৃহীন অসহায় বাঙালী মেয়েকে আসন্ন বৈধব্য থেকে এবং সারা জীবনের তুষাগ্নি থেকে রক্ষা না করলেই বা বাংলা দেশের কতটুকু ক্ষতি হতো? কিন্তু সে দিন, সেই ফাল্গুন গোধূলিতে কেবলমাত্র আদর্শই কি তাঁকে অত গভীরে স্পর্শ করে গিয়েছিল? আর কিছুই কি তাঁকে বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে, উদাস করে দেয়নি? ভৈরোঁ-কালিংড়ার অর্ধনারীশ্বর শিহরণ সে রাত্রির মধ্যপ্রহর পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে সংগীত-মূর্তি নিয়েছে। ভোর বেলাকার রাগ রাত্রিবেলায় এক আশ্চর্য পবিত্র মূর্চ্ছনা এনেছে, কোথায় যেন একটু একটু করে আলো জাগছে, এক একটি অস্থায়ী আঙুলের বিকম্পিত ঝংকারে এক একটি সবিতৃদেবের বশ্মি জেগে উঠছে।

সন্ধ্যা বৈকালের একটি অপবিচিত, বিস্মিত, উত্তাল মুহূর্তের ছবি বুকে করে সে রাত্রে তিনি ছুটে গেছেন গাজনার বিলের দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার মাঠের ভেতর। তাকিয়ে দেখেছেন কালপুরুষ জ্বলছে মাথার ওপর। কঙ্কালভাস্বর শরীরে পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকার জমে জমে একটি কষিতকান্তি ধাতব মূর্তি যেন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে। আর ত্রিকালব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের বিরাট মুখের মধ্যে কত রোমাঞ্চকর তারা নিঃশব্দে দপ্ দপ্ করছে। পঁচিশ বছরের জনার্দন চৌধুরী সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। দু-চোখ ভরে হঠাৎ জলের ধারা নেমে এসেছিল।

এই অনুভূতির তুলনা হয় না, জন্মমৃত্যুকে ছাড়িয়ে যায় এর অনুকম্পন। সকলের জীবনে ঘটে কি না কে জানে, জনার্দনবাবুর জীবনে একবারমাত্র এই অনুভূতির স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল।

রবিবারের সকালগুলো যেমন তাড়াতাড়ি শুরু হয় বেলাও হয় তেমনি। সাড়ে সাতটা আটটা বাজলেই বইতে আর মন বসে না, গলিতে ছেলেদের কলরব শুরু হয়ে যায়। পাঠ্য বইয়ের আড়ালে অন্য বই কেঁদে ওঠে, দু-রঙা তেরঙা তাদের মলাট, ছবিগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে।

আজও টেবিলের ঘড়িতে আটটা বেজেছে কি বাজে নি, হর্ষ উঠে পড়েছে। নিচের ঘরে মন্দিরা তখনো পড়ছিল, হর্ষ সদ্য দিয়ে যাওয়া খবরের কাগজখানা মেঝেয় মেলে ধরে হেডলাইন গুলো দেখে নিচ্ছিল। একটু পরেই এটা বাবার ঘরে চলে যাবে, তার আগেই ব্যক্তিগত, হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, পুস্তক সমালোচনা ভালো করে দেখে নিতে হবে। এইগুলো হর্ষর প্রিয় খোরাক। মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে সবে কি একটা মজার খবর আবিষ্কার করেছে অমনি মন্দিরা তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললো, ও দাদা, ও কেরে—

মুখ তুলেই হর্ষ দেখলো একটা হিন্দুস্থানী আধা ভিখিরী গোছের লোক সদর দরজা দিয়ে ঢুকে তাদের ঘরের দিকেই আসছে। লোকটার পরনে একখণ্ড ফালি কাপড়, গায়ে আর একখানা পৈতের মতো আড়াআড়ি জড়ানো, হাতে লাঠি।

মন্দিরা লোকটাকে ছেলেধরা মনে করেছিল কি না কে জানে। তবে ভয় পেয়েছিল এটা ঠিক। তাড়াতাড়ি ঘরের কোণের দিকে সরে দাঁড়িয়েছিল, আর একটিও কথা বলেনি।

লোকটা যে ভালো নয়, আর তার মতলবও খুব সাধু নয়, হর্ষ এক নজরেই বুঝে নিয়েছিল। লোকটা বাড়ির ভেতর ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল বটে, কিন্তু তাদের তখনো দেখতে পায় নি। বরং হর্ষ খুব স্পষ্ট করেই দেখতে পাচ্ছিল। গায়ের রং বাদামী। রোদে পোড়া মুখ। ন্যাড়ামাথায় প্রকাণ্ড একগোছা টিকি। ধনুকে গুণ পরানো শরীর, সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টিটা ঘোলাটে।

মেজাজ গরম হতে বেশি সময় লাগেনি, হর্ষ হুঙ্কার ছাড়লো, ভিখ্ মাঙতা বাহার সে মাঙো, অন্দর মে কিঁউ ঘুষা!

আচমকা ধমকানী খেয়ে লোকটা ভড়কে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এগোবে না পিছুবে স্থির করতে না পেরে ইতস্তত করছে দেখে হর্ষ এগিয়ে গেল, কা তামাসা দেখ্‌রহা হো? বাহার যাও।

ততক্ষণে হর্ষর চিৎকার শুনে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

লোকটা পাগল হতে পারে এমন একটা আশঙ্কা হর্ষর মনে প্রায় বদ্ধমূল হতে যাচ্ছিল এমন সময় মা একটা কাণ্ড করে বসলেন।

হঠাৎ কান্না জড়ানো গলায় মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে তোর একি চেহারা হয়েছে রে। কথা বলছিস না কেন ?

হর্ষ ব্যাপারখানা বিন্দুমাত্র বোঝবার আগেই মা তাকে হাত ধরে টেনে এগিয়ে আনলেন, এই যে হর্ষকে চিনতে পারিস, ছোট ?

বিদ্যুৎ চমকের মতো হর্ষ কেঁপে উঠলো আশ্চর্য শিহরণে। এই ছোটকাকা! কিন্তু লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, একটা কথাও বলতে পারলো না ছোটকাকার সঙ্গে। নিজের অসঙ্গত ব্যবহারটাকে সে কিছুতেই ভুলে যেতে পারছিল না সহজে।

বাবা ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছেন, কি হয়েছে, কি ব্যাপার!

—ছোট এসেছে!

—অ্যাঁ!—ওই একটি মাত্র বিস্ময়সূচক শব্দ করে হর্ষর বাবা থেমে গেছেন, দ্বিতীয় কোন কথা বলতে পারেন নি। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে একমুহূর্ত বিলম্ব হয়নি যে তিনি বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অসাড় হয়ে গেছেন।

—তুই হঠাৎ এতদিন পরে! আয় বোস—ওরে মন্দিরা—মন্দিরাকে ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে করে কি আনতে বলে মা ছোটকাকাকে হাত ধরে টেনে নিচের ঘরের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

ভাঙা গলায় এবং ভাঙা ভাঙা কথায় ছোটকাকা মার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

—সকলকে দেখতে ইচ্ছে করলো তাই চলে এলাম। মাসখানেক আগে রওনা হয়েছি—অনেকটা পথই হেঁটে এসেছি কি না।

একটু পরেই মন্দিরা গরম দুধ নিয়ে এলো এক গেলাস। হর্ষর বাবা ততক্ষণে আবার ওপরে চলে গিয়েছেন। তাঁর স্বাভাবটাই এরকম। ছোটভাই ফিরে আসার তীব্র আনন্দ বুকে নিয়ে তিনি আবার তাঁর নিজের ঘরে পালিয়ে গেছেন। দুঃখকে তিনি সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এই হঠাৎ পাওয়া সুখের ধাক্কা সামলাতে।

এদিকে ছোটকাকা কিছুতেই দুধ খাবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার পীড়াপীড়িতে খেতেই হল। তারপর কয়েক মিনিট পরে একটা পোড়াগন্ধ নাকে যেতে মা যেই রান্না ঘরে ছুটে গেছেন উনুন সামলাতে, অমনি ছোটকাকাও উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন সদর দরজার দিকে। একটু সন্দেহ জাগলেও হর্ষ সঠিক করে কখনোই ভাবতে পারে নি ছোটকাকা আবার চলে যাচ্ছেন। বোকার মতো তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার, কারণ তখন পর্যন্ত ছোটকাকার সঙ্গে তার একটিও কথা হয়নি, সেই প্রথম অভ্যর্থনার পরে।

আর এক পা যেতে পারলেই দরজার বাইরে চলে যেতে পারতেন ছোটকাকা, কিন্তু তা হলো না, মা এসে পড়লেন।

—ওকি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

—অনেকক্ষণ তো হলো, এবার যাই—ছোটকাকা ফিরে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বললেন।

—কোথায় যাবি।

—আবার—

—-আবার! চোখের পলকে মার গলার সুর স্বর সব পাল্টে গেল।

অপ্রকৃতিস্থ গলায় মা চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার জন্যেই যদি তোমাদের মনের কষ্ট হয়ে থাকে, সংসারে অশান্তি এসে থাকে, তবে স্পষ্ট করে বলো সে কথা। যেভাবে হোক নিজের জীবন বের করে দিয়ে, ঘরে তোমাদের মন বসাবার ব্যবস্থা করে দেই।

আক্ষেপটা শুধু মাত্র ছোটকাকাকে লক্ষ্য করে নয়, হর্ষর বাবাও তার লক্ষ্যস্থল।

ছোটকাকা থতমতো খেয়ে আর এক পা এগোলেন না, বরং ধীরে ধীরে ফিরে এসে আবার নিজের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন।

হর্ষর দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে বললেন, যা, দরজার ওপাশে আমার লোটা আর কম্বলটা আছে, নিয়ে আয়।

ছোটকাকার সত্যি সত্যি যে ফিরে যাবার মতলব ছিল, গত চার পাঁচদিন ধরে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল হর্ষরা। বাড়ির সকলের ক্রমাগত অনুরোধেও ছোটকাকার কঠোব ব্রহ্মচর্য শিথিল হলো না একচুল।

পরনে যা এনেছিলেন তাই রইল, শোওয়া বসাও সেই একখানা মাত্র কম্বল সম্বল করে। খাওয়া দাওয়া, মার ভাষায়, পাখির আহার। একাহারী, মানে একবেলা নয়, এক রকমের আহার। নিরামিষ তো বটেই, তাও একাধিক ব্যঞ্জন চলবে না। হর্ষর মা খাবারের বাটিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে রোজ চোখের জল মোছেন। প্রাণ ভরে রকমারি খাওয়াবেন সে সাধও তাঁর মেটে না।

ছোটকাকা কথা বলেন খুব কম। নিজে থেকে প্রায় 'না' বললেই চলে। বেশির ভাগ সময়ই হাঁটু মুড়ে বসে থাকেন গম্ভীর হয়ে। ঘুম প্রায় নেই বললেই চলে। দুপুর রাতেও মাঝে মাঝে কম্বলের ওপর সোজা বসে থাকেন অন্ধকারের ভেতর।

তা কথা বলুন আর নাই বলুন, হর্ষ আর মন্দিরা ছোটকাকার দুপাশে দুটো ছায়ার মতো বসে থাকে। ছোটকাকা তাদের ভালোবাসেন খুবই, কাঁচের জিনিসের মতোই তবু একটু দূরে দূরে, একটু আলগোছে রাখতে চান। পাছে মায়া পড়ে যায় আবার, সেই ভয়।

হর্ষর কাছে ছোটকাকা যে কোন বিদেশী পর্যটকের চেয়ে কিছু কম নন, যাঁদের গল্প বইয়ের পাতায় জায়গা নিয়েছে। তিল তিল করে ভারতবর্ষের সিকিভাগ জায়গা অন্তত: ছোটকাকার দেখা হয়ে গেছে, পায়ে হেঁটে হেঁটে দুর্গম অদুর্গম অনেক জায়গা। অসংখ্য গ্রাম, অসংখ্য জাতের মানুষ। কত ছোটবড় নদী, পাহাড়, বন।

এত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সুন্দর অসুন্দর এত জিনিস দেখেছেন যে মনটা আর চঞ্চল হয় না। দু:খের মধ্য দিয়ে অনেক জানা হয়ে গেছে ছোটকাকার, তপস্যা ফপস্যার কথা বাদ দাও। কত মানুষকে জেনেছেন, কত মানুষের সুখ-দু:খকে। জীবনটা দিনরাত্রিময় হয়ে পথ আর পান্থশালায় রূপ নিয়েছে। সেই গান আছে না—আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ!

টুকরো টুকরো গল্প শোনে রেললাইনের ধারের, জনপদের বাইরেকার, নানা তীর্থপথের। চটিতে রাত কাটানোর গল্প। শ্মশানের কথা, মহাবনের নিচেকার সাধন সর্বস্ব সন্ন্যাসি-অবধূতের কথা। সে সব অনেক কথা।

কিন্তু আরও সপ্তাহ খানেক পরে ছোটকাকার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল, অর্থাৎ সংসারের অপরিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের কাছে একটু একটু করে আত্মসমর্পণ করলেন।

বাবা জোর করে কিছু বলেন নি, শুধু এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন: সংসারে যখন ছিলে না তখন রীতিনীতির প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সমাজে যখন এসেছ, যে কটা দিন অন্তত: এখানে আছ পোশাক-আশাক, চালচলন কিছুটা তো বদলাতেই হবে। সেটা তোমার নিজের জন্যেই নয়, পরের জন্যও।

ছোটকাকা তাঁর দাদার মুখের ওপর কোন জবাব দেন না, চুপ করে শোনেন। বাবা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার আস্তে আস্তে বলেন, মানুষের কল্যাণ তুমি চাও, শুধু নিজের কল্যাণ নিশ্চয় নয়, নিজের কথাটাই তো স্বার্থমুক্ত নয়। তা হলে এই যে অগণিত মানুষ এখানে কষ্ট পাচ্ছে, দু:খে শোকে বিদীর্ণ হচ্ছে, তাদের জন্যে কিছু কর। চাকরি বাকরি কিছু করতে বলছি নে, তুমি এখানে থেকে ডাক্তারি কর। সন্ন্যাসীও মানুষের চিকিৎসার জন্যেই বনে যান, তুমি সংসারেই থাক।

কথাটা হয়ত মনে লেগেছিল। নইলে জোর করে ছোটকাকাকে কিছু করানো কখনও সম্ভব হতো না। বড়োকাকা সংবাদ পেয়ে সাগতা থেকে ছুটে চলে এলেন। চিরকালই তিনি কিছুটা একগুঁয়ে প্রকৃতির। যে কথা সেই কাজ করলেন, ছোটকাকার মাথা থেকে টিকির গোছা কাটা পড়লো, পরনে ন্যাকড়ার ফালির পরিবর্তে ধুতি উঠলো। মানে ছোটকাকা শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেন।

তবু বাড়ির সকলের আশঙ্কা দূর হলো না, হর্ষকে সব সময় ছোট-কাকার পাহারায় থাকতে হলো, পাছে চলে যান।

—ভিখ মাঙ্‌তা বাহারসে মাঙো, অন্দর মে কিঁউ ঘুষা!—কথাটা বলে ছোটকাকা কিছুক্ষণ বাইরের বাগানের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন।

হর্ষ বসেছিল পাশে, নিজের উক্তিটাকে ছোটকাকার মুখ থেকে আবার শুনে লজ্জিত হলো।

লম্বা মুখ, বাবড়িচুল লোকটা নরম চোখে তাকিয়ে থাকলেন ছোটকাকার দিকে। ডাক্তার ঘোষাল বাড়ি ছিলেন না, বাগানে প্যারালাল বার আর বারবেল গুলো রোদ্দুরে পড়ে রয়েছে, নরম রাঙা ধুলো-মাটির আখড়ায় কুস্তি শেষ করে ছেলের দল চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আর ডাঃ ঘোষালের এই বৈঠকখানা ঘরে এখন তারা আর রজতবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। রজতবাবুকে ছোটকাকা খুব পছন্দ করেন। হর্ষরও ভালো লাগে, লোকটা আর্টিস্ট, বসে বসে যখন তখন ছবি আঁকেন।

—বড়ো দামী কথা, সংসার আর সাধন-তত্ত্বের সার কথা বলে দেওয়া হয়েছে কত সহজে।—ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে শুরু করলেন, অথচ রজতবাবু, এই কথাটা আমি প্রথম শুনি একটি ছোট ছেলের মুখে, যে নিজের অজ্ঞাত-সারেই বলেছে সন্দেহ নেই। আমি প্রথমটা শুনে চমকে গিয়েছিলাম, তারপরে স্তম্ভিত হয়েছি।

রজতবাবু কি বুঝলেন কে জানে, একটু মাথা দোলালেন হাওয়ায়, মুখে চোখে কিছুটা উৎসাহ প্রকাশ পেল। ছোটকাকা অবশ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যায় নামলেন না, এক টিপ নস্যি নিয়ে অন্য কথায় ফিরে গেলেন, যাক, আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন, এবার সেই কথাই বলি।

হর্ষ খুসী হয়ে ইঞ্চিটাক এগিয়ে বসলো। রজতবাবুও চৌকির ওপরে দেওয়ালে ঠেঁস দিয়ে দীর্ঘক্ষণের জন্যে জুত হয়ে বসলেন।

—আমি যখন প্রথম কলকাতা ছাড়ি, ভ্রমণের উদ্দেশ্য বা মন কোনটাই যে আমার ছিল না একথা ডাঃ ঘোষালের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন। সুতরাং পথের দুধারে চোখ মেলে চলিনি, চলতে চলতে যা চোখে পড়েছে এবং সেই চোখে পড়ার যেটুকু মনে পড়ছে, তা থেকেই বলবো। আমি লেখক নই, সাজিয়ে গুজিয়ে বলতেও পারি না। তাই আমার বেশ সন্দেহ আছে যে আমার কথা শুনে আপনি আনন্দ পাবেন, বা আপনার কৌতূহল মিটবে।

—আপনি যে ভাবেই বলবেন আনন্দ পাবো। ভ্রমণ কাহিনী পড়লেই যে অনেক কৌতূহল মিটতে পারে তা জানি, এবং পড়েছিও। কিন্তু আমার জানা চেনা একজন, বিশেষ করে আপনার মতো একজন, যখন নিজের কথা বলবেন

তখন তিনি হয়ত সব গুছিয়ে বলবেন না, ভৌগোলিক বিবরণও হয়ত নিখুঁত হবে না, তবু সেটা হবে তাঁর নিজের কথা। তাতে অন্য স্বাদ। বলুন আপনি।

রজতবাবু বেশ আবেগের সঙ্গেই কথাগুলি বলে হাসি মুখে চুপ করলেন। আর সত্যি বলতে কি, ডাঃ ঘোষালের এই জিমনাষ্টিক আখড়ায় যতজন যাওয়া আসা করে রজতবাবু তাদের ভিতর বিশেষভাবেই আলাদা। ঘোষাল প্রথম জীবনে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবেই জড়িত ছিলেন। তারপর নানা কারণে তাঁর মত এবং পথের ঈষৎ পরিবর্তন হওয়ায় তাঁর পূর্বতন সহকর্মীদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমাজ সেবা বন্ধ হলো না। নতুন কালের তরুণদের নিয়ে তিনি একটি সঙ্ঘ গড়লেন, নাম দিলেন, শক্তি সঙ্ঘ। প্যারালাল বার বসলো, রিং ঝুললো, ভারি ভারি বারবেল এলো। একটি দুটি করে ছেলের দলও ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠলো। শুধু শক্তি চর্চাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রিলিফ ওয়ার্কও চললো। ধীরে ধীরে জানা গেল ঘোষাল আধ্যাত্মিক দিকেও ঝুঁকেছেন। মঠ-মিশনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন। অনেকে আজকাল তাঁর কাছে সেইজন্যও যাতায়াত করে। অর্থাৎ ছেলের দলের কাছে ডাক্তারদা একটু ঝাপসা হয়ে গেলেন। তবে তা নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করলো না। রজতবাবু ঠিক এই সময় থেকে এখানে আনাগোনা শুরু করেছেন। তিনি কোনদিন আখড়ার মাটি ছোঁন নি, তত্ত্ব আলোচনার বৈঠকেও যোগ দেন নি। অথচ তিনি নিয়মিত এসেছেন, নিয়মিত আজও আসেন। তুলি আর রঙ সব সময় সঙ্গে থাকে। ছোটকাকার মুখেই সব জানা গেছে। চুলে যত্ন নেই, জামা কাপড়েও উদাসীন। কখনো জামায় বোতাম লাগাতেই ভুলে যান, কখনো বা জামায় আদৌ বোতামই থাকে না। অথচ খুবই বড় ঘরের ছেলে, গাড়ি আছে, একাধিক বাড়িও আছে।

এতসব জানবার পর থেকে ডাক্তার ঘোষালের ওপর যতটা না শ্রদ্ধা বেড়েছে হর্ষর, রজতবাবুর ওপর তার চতুর্গুণ।

এক মিনিট ভেবে নিয়ে ছোটকাকা শুরু করলেন, সব তেইশ বছর বয়সের সঙ্গে সব তেইশ বছর বয়সের সেণ্টিমেণ্টের মিল হয় না এতো জানা কথা, আমার বেলায় ওই বয়সের আক্ষেপ যে আকৃতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা এযুগের বাংলা দেশে কদাচিৎ কিনা আমি বলতে পারবো না। যাক ভূমিকা বাড়িয়ে কাজ নেই—যাত্রা শুরু করি। একদিন সূর্যোদয়ের কিছু আগে গেরুয়া কাপড় পরে নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে পড়লাম। পুরাতন জীবনকে বিস্মরণ করে হেঁটে চললাম, দিনে আন্দাজ দশ মাইল। খাবার চেয়েছি কখনো, বাধো বাধো আড়ষ্ট হাতে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ দেয় নি, হয়ত সেটা আমার চাইতে না পারার অক্ষমতা। রাত্রে ভাঙা বাড়ি কিংবা মন্দিরের দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছি। পৌষমাস। গায়ে শুধু একখানা কাপড়। তিনদিন অনাহারে

এবং ঠাণ্ডায় মুমূর্ষু অবস্থায় তো তারকেশ্বরে পৌঁছান গেল। ওখানকার মোহান্ত তখন জগন্নাথ আশ্রম। তাঁর হুকুমে ভরপেট প্রসাদ খাওয়া গেল।

এক সময় স্বামীজী আমাকে ডাকলেন। অনেক কথা হলো। আমি নাকি ইচ্ছা মতো গেরুয়া পরেছি, শাস্ত্রে বিধান উল্লঙ্ঘন করেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর বেদান্ত পাঠের কথায় তিনি বললেন, আমার এখনো অধিকার জন্মায় নি। আগে কবছর পাণিনি পড়তে হবে এবং আরো কত কি সব। আমার মন সন্তুষ্ট হলো না। আবার বেরিয়ে পড়লাম।

পথে মুণ্ডেশ্বরী নদী, দামোদরের নিকটে। তার তীরে এক সাধু— রুক্ষ শীর্ণ দীর্ঘ মূর্তি। গাঁজা টানে—শাক্ত। তার এক কদাকার ভৈরবী আছে। সন্ধ্যে বেলায় গাঁজা টেনে হাসে আর বলে, আমি তো সব ব্রহ্মই দেখছি!

ঐ অঞ্চলে মায়াপুর গ্রামে কয়েকজন গ্রাম্য যুবক আমাকে এক বাড়িতে নিয়ে গেল। গৃহস্থরা রামকৃষ্ণের ভক্ত। বাড়িতে প্রকাণ্ড বেদীতে ঠাকুর এবং তাঁর ভক্তদের বড়ো বড়ো ছবি। আরতি হোল, মূল্যবান তানপুরা ইত্যাদির সঙ্গে ভজন। সকলে মিলে সে রাতে আমরা খুবই মেতেছিলাম। তার পরদিন আরামবাগে এক ডাক্তারের আশ্রয়ে কাটে। পথে এক নাপিত আমার মাথা ন্যাড়া করে দেয়। এক বাস কোম্পানি আমাকে পৌঁছে দেয় বিষ্ণুপুরে। সেখান থেকে রেলে করে রাণীগঞ্জে, চেকার নামিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার রেলে চেপে গয়া। তারপরে বুদ্ধগয়া, সাতমাইল দূর। সেখানে এক চীনা ধর্মশালা, বড়ো নোংরা জায়গা। আবার গাড়ি করে মোগলসরাই সেখান থেকে প্রায় আট মাইল হেঁটে কাশী। গ্রাম্য গেরস্ত লোক এবং চাষীরা দলে দলে চলেছে এলাহাবাদ কুম্ভমেলায়। আশী মাইল পথ, মাঘ মাস। তার ওপর ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ। হেঁটে হেঁটে চলেছি। সে যে কি কষ্ট বোঝাতে পারবো না। কিন্তু মন তখন শক্ত।

এই সেই তা হলে কুম্ভমেলা! যার কথা ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছি, ইতিহাসে উল্লেখ পেয়েছি। বিরাট ব্যাপার। চারপাশে গেরুয়া আর গেরুয়া। নানা সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা তাঁবু পড়েছে, নানা রঙের। নাগা সন্ন্যাসীরা উলঙ্গ থাকে। তাদের বড় আখড়া—মোটা টাকা। যেখানে যায় চোখ রাঙিয়ে সেবা আদায় করে। সকলে ভয় পায়, শ্রদ্ধাও করে। ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধার একটা সম্পর্ক আছে বোধ হয়। যাই হোক, নাগাদের আধ্যাত্মিক পথ নয়। শঙ্করাচার্য নাকি তাঁর নব প্রচারিত ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য এই নাগা দল রচনা করেছিলেন, যেমন পুলিশ বা মিলিটারী।

কুম্ভমেলার বর্ণনা অনেক পড়েছেন, তাছাড়া আমি বলতেও পারি না, এরপর হরিদ্বার এবং হরিদ্বার থেকে কুড়ি মাইল হেঁটে হৃষীকেশ পৌঁছালাম। ইচ্ছা, শাস্ত্র পড়বো। গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি মঠ বা সঙ্ঘের মধ্যে আর

যেতে চাইনা। হঠাৎ দেখি এক কুঁড়েঘরে এক বৃদ্ধ দণ্ডীস্বামী বসে আহ্নিক করছেন। ভাঙাভাঙা হিন্দীতে মনের কথা জানালাম।

তিনি বললেন, 'আমি তো শিষ্য করি না। একটু আগে কেশবাশ্রম আছেন, তাঁর কাছে যাও।'

কেশবাশ্রম আমাকে আদর করে রাখলেন ও একটা কুঁড়ে ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। এইখানেই স্থায়ীভাবে শেষ পর্যন্ত ছিলাম।

ঠাণ্ডায় আমার শরীর শুকিয়ে যেতে লাগলো। জ্বরে অজ্ঞান হয়েও পড়ে ছিলাম দিন দুই। কেউ কেউ ভয় দেখাতো, এখানে থাকলে মারা যাবে। দু একবার ভয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু সামলে নিয়েছি।

চার বৎসর হৃষীকেশে থাকা কালে বার দুই বৃন্দাবনে গিয়েছি বেড়াতে। ওখান থেকে পাঁচশো মাইল, প্রায় পায়ে হেঁটেই গেছি। সেখানে কাণপুরের এক বিধবা ভক্ত বাড়ি করে দিয়েছেন সাধুসেবার জন্য। সুন্দর ব্যবস্থা। সেখানে থেকেছিলাম মোট প্রায় তিন মাস। যখন ফিরে আসতাম বেশ ভালো লাগতো। সর্বদাই বেদান্তের ক্রীড়া, আলোচনা ইত্যাদি হতো। তীর্থ মন্দিরের প্রবল মোহ আমার ছিল না।

শঙ্করাচার্য তাঁর ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষে পাঁচটি মঠ নির্মাণ করেন, এবং প্রত্যেকটিতে একজন করে মোহান্ত নিযুক্ত করেন। সেই নিয়ম এখনও চলেছে পাকা। রামেশ্বরে শৃঙ্গেরীমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, উড়িষ্যায় গোবর্ধনমঠ আর উত্তরখণ্ডে অর্থাৎ বদ্রিনারায়ণের উনিশ মাইল নিচে জ্যোতির্মঠ, কাশীর বিজ্ঞানমঠ পঞ্চম। মঠগুলির অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করেন মোহান্ত। একথা কেন বললুম পরে বলছি। একবার ইচ্ছে হলো কেদারবরি বেড়াতে যাবো। আমার স্বামীজীর কিন্তু ভারি অনিচ্ছা।

ছোটকাকা থেমে গেলেন, হর্ষ তাকিয়ে দেখলো একটি ছিপছিপে সতের আঠার বছর বয়সের মেয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। নাকের এক পাশে কালো জরুলের দাগ।

* —রজতদা, আপনার আঁকাটুকু শেষ করবেন, না আজ থাকবে ?

মৃদু গলায় বললেও একটা ধমকের স্বর প্রচ্ছন্ন ছিল, হর্ষ টের পেয়ে গেল।

রজতবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, ওঃ হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, দুলু। আচ্ছা তুমি যাও আমি মিনিট পনের পরে যাচ্ছি।

মেয়েটি চলে যেতেই রজতবাবু একটু লজ্জিত হেসে বললেন, ওই দীপালীর একটা বড়ো স্কেচ এঁকে দিচ্ছি। বড্ডো নাছোড়। আপনি শুরু করুন—

ছোটকাকা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, না, আজ থাক, বেলা হল।

শিউলিকে সেদিন হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে শিউরে উঠলো হর্ষ। অনেক বড়ো হয়ে গেছে, ফ্রক ছেড়ে কাপড় ধরেছে, অথচ—হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাতটা ডুবিয়ে হর্ষ ভাবলো, কতই বা ওর বয়স। শাড়ি পড়লে এমন বড়ো আর ভালো লাগে ওকে দেখতে যে, কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না, দিন পনের আগেও ওকে সাদা ফ্রকে সুন্দর মানিয়েছিল।

কিন্তু এ বড়ো আশ্চর্য। গিরগিটি যেমন পলকে পলকে রঙ বদলায়, মেয়েরা তেমনি কখন কখন পাল্টে যায়, সুন্দর থেকে আরো সুন্দর হয়, তুমি বুঝতেই পারবে না। পার্কের সেই ফুলগাছটার মতো, মাঘ শেষে দেখেছো একটা পাতা নেই গাছে, ডালগুলো শুকনো কালো কালো লম্বা আঙুল বাড়িয়ে রেখেছে আকাশের দিকে। গাছটা হয় তো মরে গেছে, দেখলে এমনিই সন্দেহ হবে। তারপর হঠাৎ একদিন বৈশাখ মাসের ভোরে উঠে চমকে যাবে সবাই, যারা কাল রাত্রেও দেখেছো একই রকম, তারা চোখ রগড়ে তাকাবে আর একবার ভালো করে। জামরুলের ফুলের মতো ঝুমকো সাদা ফুলে আকাশ আলো করে তুলেছে। পাতা নেই যদিও, তবু ফুলের ফোয়ারার নিচে ডালগুলো পর্যন্ত চাপা পড়ে গেছে।

শিউলি তেমনি অবাক করে দিল হর্ষকে, মনে হলো চোখে ধাঁধা দেখছে, বিন্নী-বরণের ধানের মতো গাজনার বিলের দমকা জলের বুকে রাতারাতি হাতখানেক বেড়ে গেছে যেন।

শিউলি আজ আর পালিয়ে গেল না। সেই ঘুম-ঘুম চোখ দুটো তুলে বললো, মামা তো বাড়ি নেই।

মাথা নিচু করে ফিরে যাচ্ছিল হর্ষ, শিউলি এগিয়ে এলো, বসুন, যাবেন না। ছোট মামা হয়ত এখুনি এসে যাবেন।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো হর্ষ, কোথায় বেরিয়েছে গজেন, বলে গেছে?

—দিদিমা আর মামীমাকে নিয়ে ভবানীপুরে গিয়েছেন সেই সকাল বেলায়, ওঁরা ওখানেই থাকবেন আজ, কিন্তু ছোটমামার তো দুপুরেই ফিরে আসবার কথা। এখনো—

একটুও গলা কাঁপলো না অতগুলো কথা বলতে। পাখাটা খুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে, বিমূঢ় হর্ষ ফশ্ করে ডেকে বসলো, শিউলি!

ডালিমফুলের মতো রাঙা টকটকে শাড়িটা থমকে দাঁড়ালো কয়েক সেকেণ্ড, তারপরে ফিরে দাঁড়ালো। তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে নিজেকে অপ্রস্তুত বোধ করলো হর্ষ। কি বলবে, কি জন্যে সে ডেকেছে ?

একটু হয়ত অবাক হয়েছিল শিউলি, কিংবা হয়নি। হর্ষর মুখ চোখের অবস্থা দেখে হাসি চাপতে নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ঘাড় ফিরিয়ে মুখটা আড়াল করলো একটুখানি। সেটা দেখতে পেয়ে গিয়ে আরো কথা যোগালো না হর্ষর মুখে।

শিউলি কিন্তু ঘাবড়ায় নি একটুও। অবস্থাটা একটু লঘু করে দেবার জন্যে হলেও, একটা মৃদু ঠাট্টার সুর যেন তার ঠোঁটে ফুটলো, জল খাবেন, এক গ্লাস জল এনে দেবো ?

নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো এই উপলক্ষটার ওপর হর্ষ যেন দু-হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তারপর শুধু জল নয়, প্লেটে করে দুখানা সন্দেশ নিয়ে আসতে শিউলির যতটুকু সময় লেগেছিল সেইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। টাল সামলে নিয়ে শক্ত হয়েছে হর্ষ মনে মনে, আর বেচাল হবে না এত সহজে।

আবার এসব কেন, বা এই ধরণের একটা কিছু প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই শিউলি স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দিয়ে বসলো—সন্দেশ দুখানা খেয়ে তবে অন্য কথা।

কি বিপদ! স্বচ্ছন্দে টেবিলের ওপরে জলের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে চলে যেতে পারতো শিউলি, কিন্তু গেল না। গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সামনে। আর তাই তাড়াতাড়ি কোন রকমে মিষ্টিদুটো গিলতে গিয়ে বিষম খেয়ে সে এক যাই-যাই কাণ্ড ঘটে গেল।

শূন্য গ্লাসটা হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে নিতে নীরবতা ভাঙলো শিউলি, আপনি আমাদের বাড়িতে আর আগের মতো আসেন না কেন ?

কই আসি তো, বলতে যাচ্ছিল হর্ষ, কিন্তু জীবনের প্রথম 'আপনি' ডাকের সম্মান সে হেলায় হারাতে রাজী নয়। গম্ভীর হবার ভান করে বললো, নানা কাজ, সময় পাইনে আজকাল আগের মতো।

—হবে। নিশ্বাস মেশা গলায় শিউলি উপেক্ষা করলো কথাটাকে। তারপর চলে গেল ভেতরে।

হর্ষ বসে বসে ভাবতে লাগলো গোড়া থেকে, ঠিক কি কি সে বলেছে, কেমন ভাবে বলেছে। এবং সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত কি ধারণা নিয়ে গেল ও। আজ প্রথম তার সঙ্গে কথা বলেছে শিউলি, আজ প্রথম তাকে সহজ মনে হয়েছে, স্বাধীন মনে হয়েছে। পারুলপিসী থেকে শুরু করে অনেক অনেক মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে আজ পর্যন্ত, বন্ধুত্বও হয়েছে, কিন্তু কোনদিন মনের

অবস্থা এমন তো হয়নি এর আগে। এমন অসহায়ভাব, এমন মাথা ঝিমঝিম করা, এমন বুকের ভেতরটা চিলের ডাকের মতো চমকে ওঠা, এমন তো হয়নি। শিউলি কি তাদের থেকে আলাদা? সে কি তাদের চেয়ে বেশী সুন্দর?

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। তবু হর্ষর মাথায় একবার একটা ভাবনা ঢুকলে ধাবাপাতের নামতার মতো বেড়ে চলবে তো বেড়েই চলবে; তখন বাইরের কিছু চোখে পড়বে না, কোথায় আছে, কেন আছে, ভুলে যাবে একদম। পথ চলতে চলতে এমন হলেই হয়েছে আরকি !

নিচে রাস্তায় একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই, এবার সেইটে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অনেক লোক জমেছে বোধ হয়, বোধহয় ছোটখাটো মারামারি হচ্ছে, যেমন এপাড়ায় প্রায়ই হয়ে থাকে, দুপক্ষে সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে থেমে যায় সেদিনকার মতো। নয়ত কোন মিছিল বেরিয়েছে তার শ্লোগান দূর থেকে এমন শোনাচ্ছে। হর্ষ কোলাহলটাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করলো।

শিউলি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো, চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ, ঘনঘন নিশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে, ঠোঁট দুটো ঈষৎ খোলা, দাঁত দেখা যাচ্ছে। হর্ষ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, কি হয়েছে?

একটা হাতে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আর একটা হাতের ইশারায় একটু সময় চাইল শিউলি।

বুকের ওঠাপড়া একটু কমলে ভয়ার্ত গলায় কাঁপা কাঁপা স্বরে বললো, বাইরে ভীষণ কাণ্ড হচ্ছে! শিগগীর দোতলার বড়ো দরজাটা বন্ধ করে দিন, আমার বুক কাঁপছে .....

—কেন, কি হয়েছে? ফ্যাকাশে গলায় আবার সেই একই প্রশ্ন করলো হর্ষ।

—বাইরে মারামারি হচ্ছে।

—ও:।—হর্ষ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাসবার চেষ্টা করলো।

—হাসির কথা নয়।—প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো শিউলি, দোহাই আপনার, দেরি করবেন না আর, বাইরে খুন... ..

—খুন!

আর বলতে হলো না, একলাফে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল হর্ষ ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করতে। বাইরে তখন হুলস্থূল চিৎকার, দৌড়োদৌড়ি পড়ে গেছে। কি হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফিরে এসে দেখলো শিউলি সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। ওর দিকে করুণ জিজ্ঞাসাভরা চোখ তুলে তাকালো।

—বন্ধ করে দিয়েছি।

—বড়ো মামাও বাড়ি নেই আবার,...বেনারস...

তার কথায় কান না দিয়ে হর্ষ দৌড়ে গিয়ে জানালাটা খুললো, বাইরের অবস্থাটা দেখা দরকার। কিন্তু এঘরের জানালা থেকে রাস্তা দেখা যায় না।

—শোওয়ার ঘরে গেলে...

—যাবো ?

—হ্যাঁ।

—চলো।

ওর পিছন পিছন শোওয়ার ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে যে দৃশ্য দেখলো, ভয়ে মুখ শুকিয়ে যেতে দেরি হলো না তার। দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। লুটপাট হচ্ছে, দোকান তছনছ করে, আগুন ধরিয়ে দিয়ে যে যা পাচ্ছে নিয়ে সরে পড়ছে। কয়েকটা লাস পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টাটকা রক্তে রাস্তাটা কাদা হয়ে উঠেছে। গুণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার একদল লোক লাঠি সড়কি ছোরা যে যা পেরেছে হাতে নিয়ে খুঁজি খুঁজি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মধ্যে মধ্যে এক জোট হয়ে, বন্দেমাতরম্! জয়হিন্দ্! কালী মাঈকি—জে! নানা রকম জিগির ছাড়ছে। কি ভীষণ চেহারা তাদের, একেবারে ক্ষেপে গেছে।

—মা: গো। মেরে ফেললো বুঝি—পাশের জানালাটায় শিউলি আর্তনাদ করে উঠতেই হর্ষ ছুটে গেল ওর কাছে। একটা করুণ ছবি দেখতে পেলো পথের ওপর। একটা ছাতাওয়ালা বোধহয় এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল কোন বাড়ির মধ্যে, তাকে খুঁজে বের করেছে। সাগতার দিলু মিঞার মতো চেহারা, তেমনি টাক, তেমনি চাপ দাড়ি, শুধু হাতে ছিপ নেই, বদলে এক বাণ্ডিল ছাতার বাঁট আর শলা। সেগুলি ছাড়েনি তখনো।

দাড়ির গোছা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো একজন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি পড়লো ধমাধম। মাথায়, ঘাড়ে। যেন ইঁদুর মারছে। আল্লা বলে বসে পড়লো বেচারী, জোড় হাত করে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে হাঁউমাউ করে সেকি কান্না। হর্ষর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কিছু ভাববার আগেই কে একজন চোখের নিমেষে সড়কি বসিয়ে দিল ছাতাওয়ালার গলার কাছটায়। বুকফাটা একটা চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়লো লোকটা, ফিনকি দিয়ে রক্তের পিচকারী ছুটলো।

আর দেখতে পারলো না, সরে এলো জানালা থেকে। শিউলি ততক্ষণে বসে পড়েছে মেঝের ওপর। ঝি, ঠাকুর কেউ আসেনি, ফ্ল্যাটটা মনে হচ্ছে লাস-কাটা ঘরের মতো নির্জন। দেওয়ালে একটা ঘড়ির টিকটিক। বাইরে, নিচে, মাতাল রাস্তা। হয়ত সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে তার হিংস্র উল্লাস। ছাতাওয়ালার মতো কত নিরীহ লোক হয়ত যেখানে সেখানে লুটিয়ে পড়ছে, বাড়িতে

খবর পৌঁছে দেবারও কেউ নেই। পুলিশ? পুলিশই বা কোথায় গেল আজকের দিনে?

বাড়ির কথা মনে হতেই সারা শরীর অবশ হয়ে এলো। বাড়ি যাবে কি করে? সন্ধ্যে হতেও বড় দেরি নেই। এতটা রাস্তা, অসম্ভব! অসম্ভব তার পক্ষে বাড়ি যাওয়া। কে কোথায় মাথায় ডাণ্ডা কষিয়ে দেবে, শত চেঁচালেও শুনবে না তার কথা। তাদের পাড়ায় এতক্ষণ কি হচ্ছে কে জানে। মা কত ভাবছেন, মন্দিরা কাঁদছে। ভগবান, এমন করে দাও, এটা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের দেখা হয়, জাগা-দেখা যেন না হয়, আরো আরো অনেক রাত্রে যেমন হয়েছে, মোষে তাড়া করেছে কিংবা ডাকাতে, অথচ ঠিক বেঁচে গেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ঘুম ভেঙে যেতেই। তেমন হয় না আর একবার?

—কি ভাবছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

—অ্যাঁ? ও! ভাবছি বাড়ি যাবার কথা।

—আমাকে একা ফেলে? শিউলি শুকনো মুখে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লো। এত ভয় পেয়েছে যে কাঁদতে পারলো না, নইলে হয়ত বা কেঁদেই ফেলতো।

সে রাত্রিটা ভোলবার মতো নয়, ভোলা যায় না। এমন আর একটি রাতও আসেনি, এমন তক্ষকের ফনার মতো ভয়ঙ্কর রাত। উপন্যাসের গল্পের মতো রোমাঞ্চকর। অসম্ভব সম্ভব করা, দুরুদুরু রাত। বাইরে সাতশো রাক্ষস মানুষের গন্ধ পেয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। দরজায় খিল তুলে দিয়ে ইজি চেয়ারে দুধরাজ একা প্রহর জাগছে। হাতে তরোয়াল নেই, আছে গল্পের বই। সেটা মিথ্যেই খোলা। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা একখানা লোহার শিক। পাশের খাটে রাজকন্যে জেগে চুপটি করে শুয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পের নীলচে আলোয় তার লাল শাড়িটা আবছা মাত্র দেখা যায়।

কি করে সম্ভব হলো এমন ভোজবাজীর মতো কাণ্ড।

দাঙ্গার কথা আজো যখনই মনে পড়ে, আকাশ ছোঁয়া ভয়ের সঙ্গে একবিন্দু আনন্দের শিহরও ছড়িয়ে পড়ে মনের মধ্যে। কিশোর বয়সটাই এমন আশ্চর্য।

পরদিন সকাল বেলায় কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে গজেন যদি বড়োবাজারের বাসায় এসে না পৌঁছতো, আর নেপালী দরোয়ানটাকে একটা টাকা দিয়ে বশ করে যদি না হর্ষর সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা করে দিত, তবে কি যে হতো।

বাড়িতে তখন মৃত্যুরোল উঠেছে। মা পাগলের মতো চেঁচিয়ে কাঁদছেন। মন্দিরা কাঁদতে পারছে না, কেমন যেন হয়ে গেছে। শুধু মাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে আছে। নতুনবৌদি হাত পাখা দিয়ে মার মাথায় হাওয়া করছেন আর মাকে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, তাঁর চোখেও জল। ছোটকাকা

একটা লাঠি হাতে পায়চারী করছেন, কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শুধু বাবার ঘরের দরজাটা ভেজানো। গীতবিতানের একটা পাতা খুলে ভোর বেলা থেকেই নাকি চুপ করে বসে আছেন। গান গাইছেন বলে মনে হয় না।

এমন নিষ্ঠুর। মা এই দিনের কথা উঠলেই এই মন্তব্যটা করেছেন সব শেষে।

হর্ষ বাড়ি ঢুকতেই ছোটকাকা প্রথমে দেখতে পেলেন কিন্তু যেন চিনতে পারলেন না, লাঠির ডগায় চিবুকটা রেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তো তাকিয়েই থাকলেন। তারপর হর্ষ যখন একেবারে কাছে গিয়ে পড়েছে তখন ছোটকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন তারস্বরে, আরে এই তো !

কিন্তু এই সকাল বেলাটা ছাড়া আর সবই খাপছাড়া লাগে তার কাছে। দাঙ্গার সেই আতঙ্কগ্রস্ত দিনগুলো জুড়ে অর্থহীন এত ঘটনা ঘটেছে যে তাদের ধারাবাহিক স্মৃতি হর্ষর আজ নেই। শুধু কলকাতার পরিসর কত ছোট হয়ে গিয়েছিল সেই কথা মনে পড়ে। কলকাতা মানে যে কতকগুলো পাড়া মাত্র. অফিস নেই, আদালত নেই, গাড়ি নেই. এমনকি প্রথম কয়েক দিন পুলিশও নেই।

বদ্ধ জলার মতো লোক জমে রয়েছে পাড়ায় পাড়ায়, তারা নড়ছে না, চড়ছে না। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে নয়ত বসে গজলা করছে, গুজব ছড়াচ্ছে। লাঠি-সড়কি ঘুমোবার সময়ও হাত থেকে খসে না, পরশুরামের কুঠারের মতো। বাজারে ফালি কুমড়ো পাওয়া যায়, আর লুকিয়ে লুকিয়ে রেশানের চাল। রাত্রে বোমের শব্দ অফুরন্ত ভেসে আসে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল থেকে। লাল হয়ে ওঠে কোন কোন দিকের আকাশ। তারপরই একটা জিগির ওঠে অনেক দূর থেকে, সেইটেই বাঁশির শব্দে, শাঁখ আর ঘণ্টার আওয়াজে অভিনন্দিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাড়া পাড়ায়। মাঝরাত্রে হলেও বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে সবাই, জড়ো হয় গলির মোড়ে মোড়ে। ছাতেও ইঁটের স্তূপ, বোতল, আরো নানা রকম ব্যবস্থা থাকে। সেখানে বাড়ির মেয়েদের আর ছোট ছেলেদের টহলদারী। বিউগিল বেজে ওঠে : তেনারা এসে গেলেন বলে। ক-হাজার আসছেন তাও মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েরা ভয়ে কাঁদতে শুরু করে। জয়হিন্দ্ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ ছেয়ে যায়। তারপরেই হয়ত হুড়মুড় করে ঘরের লোক আবার ঘরে ফিরে আসে, ফটক বন্ধ হয়, রাস্তার আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এসেছে, মিলিটারী পুলিশ।

তখন ছাতে উঁকি দেওয়াও ঠিক নয়, সঙ্গে সঙ্গে সীসের গুলিতে মাথাটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবার ভয়। টর্চের আলো, মস্‌মসে জুতোর ভারি আওয়াজ হর্ষদের কাণাগলিরও মুখ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। দু-চারটে ফায়ার

হয়। পরদিন দেখা যায় হয়ত নতুনবৌদিদের ছাদে রাস্তার দিকে বসানো কলাবতী ফুলের টবটা ফুটো হয়ে রয়েছে গুলি লেগে।

পাড়ায় পাড়ায় ডিফেন্সপার্টি তৈরী হলো। রাত জাগবে তারা, চা চাই, পান বিড়ির ব্যবস্থাও রাখতে হবে। নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডাদেরও কদর বেড়ে গেল রাতারাতি। বাড়ি বাড়ি থেকে তারা প্রকাশ্যেই চাঁদা আদায় করতে থাকলো বুক ফুলিয়ে।

পুরো স্বায়ত্তশাসনের এমনি পঙ্গু, বিকলাঙ্গ দিনগুলো। চিমসে গন্ধে আকাশ ভরপুর। ভাতের গ্রাস মুখে তুললেই রাস্তায় ফুলে ঢোল হওয়া লাসগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

সেদিন নতুনবৌদিদের বাড়ি এসে অবাক হয়ে গেল হর্ষ। পাঁচটা সাতটা ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ উঠোনে নাবানো। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সদরে দাঁড়িয়ে রিক্সাওলার সঙ্গে বচসা করছেন, পাশেই অনিরুদ্ধদা দাঁড়িয়ে। হর্ষর দিকে চশমার ভেতর দিয়ে হাসলেন একটু।

ওপরে একেবারে নতুনবৌদির শোওয়ার ঘরে এসে দেখলো চশমা-পরা গোল গোল চোখ এক ভদ্রমহিলা তাঁর বর্তুলাকার শরীরে ঢেউ তুলে তুলে গল্প করছেন। গল্পের একমাত্র শ্রোতা নতুনবৌদিকে কিন্তু খুব উৎসাহিত বোধ হলো না। শুধু সতর্কভাবে গল্পের প্রয়োজনীয় জায়গায় হাঁ-না যুগিয়ে চলেছেন।

ঘরের অন্যপাশে তাকাতেই দুটি মেয়েকে দেখতে পেল হর্ষ। এই প্রৌঢ়ার মেয়ে নিশ্চয়। মুখের মিল নেই যদিও, তবু ভেবে নিতে পারা যায়। একটি তো ড্রেসিং টেবিলে বসে ইতিমধ্যেই তার মৌখিক উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হয়েছে। বছর পনের বয়স হবে তার, আয়নায় প্রতিফলিত মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল হর্ষ, মনে হল পাউডারের পাফ্‌টা চিবুকের ওপর বুলিয়ে নেবার সময় মুখ ভেংচালো একবার তাকেই লক্ষ্য করে।

বড়ো মেয়েটির বয়স বোঝা যায় না, এমন একটা শান্ত চেহারা যে, তাকিয়ে থাকলেও মনে হয় জেগে নেই। মেয়েদের সব চেয়ে চঞ্চল হয় চোখ, সেই চোখও মনে হয় নিষ্কৌতূহল, স্তিমিত। পোশাক-প্রসাধন সম্বন্ধে উদাসীন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছবি আর ফটোগ্রাফ দেখছিল, একবার ঘাড় ফিরিয়ে হর্ষর দিকে তাকালো।

নতুনবৌদি মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, এখন তার দৃষ্টি অনুসরণ করে হর্ষকে দেখতে পেলেন।

—এসো হর্ষ, এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি—বর্তুলাকার মহিলাটির দিকে দৃষ্টি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন নতুনবৌদি—তোমার দাদার পিসতুতো দিদি আর—

তাঁর কথার মাঝখানেই ভদ্রমহিলা প্রায় গর্জন করে দোক্তা হাসি হাসলেন, দুই গালের ওপর চর্বির ভাঁজ পড়লো, ছোপ ধরা দাঁতের সারির পিছনে জমাট রক্তের মতো জিভটা নড়ে উঠলো, এবং হাসির পিঠ ছুঁয়ে তাঁর বক্তব্য প্রায় হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো, অনেকটা যেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

—ওই নামেই পিসতুতো, নইলে আমাদের ভাইবোনের সম্পর্কটা কিছু দূরের নয়। ছোটবেলায়—প্রকাণ্ড একটা ঢোঁক গিলে ফের বললেন, অনিরুদ্ধকে তো আমিই কোলে পিঠে করে মানুষ—বাকীটা সম্পূর্ণ করলেন না, বোধহয় ক্লান্ত বোধ করলেন, আর তাই একটা হাই তুলে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন।

নতুনবৌদির সুরেলা গলা আবার শোনা গেল, আর ওই শমিতা বড়ো, রমিতা ছোট, এঁর মেয়ে। ওরা থাকতো রাজাবাজারে। ভগবানের দয়ায় ভালোয় ভালোয় যে পালিয়ে আসতে পেরেছে এই যথেষ্ট।

আপাতত যে এরা এখানেই থাকবে হর্ষ সহজেই তা বুঝে নিল। নতুন-বৌদি এবার হর্ষকে পরিচিত করালেন, পাশের বাড়িতে থাকে, বড়ো ভালো ছেলে। আমাকে এত ভালোবাসে যে একদণ্ড-ও ছেড়ে থাকতে পারে না। আর —বৌদি দুষ্টু হাসলেন, বেশ সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখে, কিন্তু লুকিয়ে।

ঘাড়টা আপনি লজ্জায় হেঁট হয়ে এলো, চোখ তুলতে পারলো না সকলের সামনে। কবিতার খাতাটা সম্প্রতি ঘর থেকে হারিয়ে যাবার কারণটা স্পষ্ট হলো এবার। এখন মন্দিরাকে একবার হাতের কাছে পেলে হতো। যা রাগ হচ্ছে তার।

অবজ্ঞাভরে ভদ্রমহিলা একটা প্রকাণ্ড হাঁচলেন, তারপর আবার সেই শরীর কাঁপানো হাসির গর্জন তুলে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার গুণাবলী নিয়ে পড়লেন, আমার মেয়েদের বাপু ওসব বাজে নেশা নেই। আর আজকালকার বেহায়া কবিতাগুলোর যা ছিরি। কেবল তুমি আর আমি। ওই আমার রমি—তেরো যাই যাই বয়েস হলো তো মোটে, এরই মধ্যে যা সুন্দর এসরেজ বাজাতে শিখেছে তোকে কি বলবো, নাচ, নাচও জানে ভালো, তোকে দেখাবে একদিন বউ, আগে সুস্থির হয়ে নিক। এবার কেলাসে আধুনিক গানে তো মেডেলই পেতো, কিন্তু বরাত! হিন্দু মুসলমানে যা কাণ্ডটা হলো—একটু হাঁপালেন, একটু আনন্দে চোখ বড়োবড়ো করলেন—কিন্তু থামলে চলবে না, তাঁর বড়ো মেয়েটি বাকীই রয়েছে তখনো—আচ্ছা ওর বয়স কতো মনে হয় তোমার, বউ? সতর আঠার? আরে না না, তোমার কি মাথা খারাপ হলো! চেহারাটা একটু পরিপুষ্টি তাই, একটু ঢ্যাঙা, নইলে পনের বছর বয়েস তাকি বলে দিতে হয়!

—ইস্, তুমি কি মা।—ছবি থেকে মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বললে শমিতা, সেদিন বাবাকে যে বললে এই ফাল্গুনে আমি আঠারোয় পড়েছি?

মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় কি ঔদ্ধত্যে বোঝা গেল না, শমিতার মা কয়েক সেকেণ্ড মেয়ের মুখের দিকে হাঁ করে থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন, তুই বড়োদের কথার মধ্যে মুখ বাড়াস কেন লা? বলি তোর পেটে আমি হয়েছি, না—ফের দোক্তার ঢোঁক গিলে—বলি বয়সের তুই বুঝিস কি? যা, এখন ওঘরে যা—

যাবার আগে, শমিতা বলা নেই কওয়া নেই হর্ষর হাত ধরে টানলো। পেরেকআঁটা পা দুখানা একচুল সরলো না মেঝে থেকে, লজ্জিত মুখটা তুলে শমিতার দিকে তাকালো হর্ষ। চোখের ইসারা করে শমিতা তাকে ডাকলো, এসো, আমরা যাই। মার গল্প শুনতে তোমার ভালো লাগবে না।

এত আস্তে আস্তে কথা বললো যে মনে হলো ঠিক শুনতে পায়নি কথাটা। ওপাশে তাকালো হর্ষ, শমিতার মা আবার কন্যা প্রশস্তি জুড়ে দিয়েছেন দ্বিগুণ উৎসাহে। আর নতুনবৌদি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেও, হুঁকার হাঁকারে ব্যস্ত থাকলেও, ঠোঁটের সেই দুষ্টু হাসিটা চিনতে পেরে লজ্জিত হলো আরো।

কিন্তু পাশের ঘরে যাবার বিন্দুমাত্র বাসনা দেখা গেল না শমিতার মনে। আঙুল বাড়িয়ে সহজ গলায় বললো, ঐটে ছাতের সিঁড়ি না?

উত্তর দেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ শমিতা ছাদের সিঁড়িটা বিলক্ষণ চিনতে পেরেছে। ওর হাত ধরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো শমিতা, কাঠের সিঁড়িতেও একটু শব্দ হলো না, এমন নরম পায়ে। হর্ষ ভাবছিল তাদের ছাদে মন্দিরা যদি এই সময় ওঠে তাহলে মার সামনে রোজ ঠাট্টা করবে এই নিয়ে, ভাবতেও বিশ্রী লাগে ব্যাপারটা।

আকাশে মেঘ ছিল না। নীল কাঁচের মতো শরতের স্বচ্ছ আকাশ একমুঠো উড়ন্ত কাগজের টুকরো নিয়ে খেলা করছে, কাগজ নয় লক্কা পায়রা এক ঝাঁক, বিকেল চারটের রোদ্দুরে অনেক উঁচুতে ঘুরে ঘুরে ডিগবাজী খেয়ে উঠছে। কখনো তাসের মতো গুছিয়ে আসছে কাছে, মনে হচ্ছে একটা মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে, আবার পর মুহূর্তেই ঝিকমিক করতে করতে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশময়।

সকালে এই দৃশ্য দেখেছে অনেকবার কিন্তু বিকেলে, এই নির্জন, শ্যাওলার গন্ধভরা ছাদে, চারপাশে ঘনসবুজ পাতাছাওয়া ঝাউ, চীনেবাঁশ আর গন্ধ মাতাল ফুলের টবের মধ্যে দাঁড়িয়ে কী যে ভাল লাগলো তার! মনে হল সটান আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

—তোমার নাম কি ভাই? শমিতা তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললো।

মনটা আবার চমক খেয়ে ফিরে এলো। নিমের বাঁকা পাতাভরা ডালটার দিকে তাকিয়ে হর্ষ তার নামটা বললো।

—না না হর্ষবর্ধন টর্ধন নয়, অত শক্ত আর বিদঘুটে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারবো না, শমিতা জানালো।

হর্ষ অপ্রসন্ন মুখে ওর দিকে তাকালো, মেয়েটির মধ্যে একটা দিদি-দিদি ভাব আছে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছে।

—তোমার নাম বেশ মেঘনা।

—কেন? আপত্তিভরা গলায় হর্ষ জানতে চাইল।

—এমনি। স্খলিত কণ্ঠে শমিতা বলে, নামটা আমার ভালো লাগে তাই।

এত নাম থাকতে হঠাৎ মেঘনা নামটা তার ভালো লাগতে গেল কেন কে জানে। কিন্তু এ তো বেশ মজা, অপর একজনের ভালো লাগবে বলে নিজের নামটাই পাল্টাতে হবে তাকে। কেন, তার নামটাই বা খারাপ কিসের, নতুন-বৌদি পর্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন মনে আছে। তা যদি বলো তবে শমিতাই বা কি এমন একটা নাম, মানেই হয় না কোনো।

—তোমার লজ্জা করছে নাকি?—নিজের হাতের মধ্যে ওর হাতটা আবার টেনে নিল শমিতা।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিমগাছটার ডালের দিকে চোখ সরিয়ে হর্ষ বলে, লজ্জা করে না আমার।

—করে না? ইস! ঠোঁট দুটো গোল করে হাসে শমিতা, তবে যে যাদুমণি অন্যদিকে তাকিয়ে—

—যাদুমণি টনি ভালো লাগে না আমার, আগে থেকে বলে দিচ্ছি।

—আর বলবো না তাহলে। তোমার কে কে আছেন, মেঘনা?

এবার আব প্রতিবাদ করলো না, ডাকুক যা খুশি নামে!

—মা, বাবা আর একবোন, আর আমার ছোটকাকা।

—কোন ক্লাসে পড় তুমি?

বাব্বাঃ! আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে যাহোক। হয়ত এরপর জিজ্ঞেস করবে তোমার বাংলা বইয়ের নাম কি, ইংরেজী বইয়ের নাম কি, তোমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম কি? তোমার বাবার মাইনে কত, ক-ঘণ্টা করে তুমি পড়াশোনা কর রোজ, তোমার বোন তোমাকে ভালোবাসে কিনা। জিজ্ঞাসা করবার আগেই সবগুলোর উত্তর নিজে থেকে বলে দেবার ইচ্ছে হলো একবার, কিন্তু অতিকষ্টে রাগ চাপালো হর্ষ. শান্ত গলায় জানালো কোন ক্লাসে সে পড়ে।

—আমিও। শমিতা আবেগভরা গলায় বললো, আমিও ঠিক অদ্দূর পর্যন্তই পড়েছি। কিন্তু জানো, চোখদুটো ছলছলিয়ে শমিতা বললো, বাবা-মা আমাকে আর পড়ালেন না। আমি নাকি বড্ডো বড়ো হয়ে গেছি—আমি নাকি বিশ্রী রকম বড়ো হয়ে—গলার স্বর বুজে এলো শমিতার।

এত নরম মন মেয়েটার, সামান্য ব্যাপারেই কেঁদে ফেলে। অবাক হয়ে তাকায় হর্ষ। কি বলা উচিত ভেবে পায় না। বড়ো সরল মেয়েটা, রমিতার যেন উল্টো পিঠ।

যত সহজে গলে গিয়েছিল, সামলেও নিল তত সহজে। মোমের মতো, তাপ পেলে গলে যায়, আবার জমে শক্ত হতেও সময় লাগে না।

—মামীমা বললেন তুমি নাকি খুব ভালো কবিতা লিখতে পার, আমাকে পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু।

ঘুমপালানো চোখে অনেকরাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে শমিতার কথাই ভাবলো সেদিন। নতুনবৌদির মনের বয়েস অনেক বেশী। চোখের দৃষ্টিটায় কেমন একটি সবজানি ভাব, ঠোঁটের পাতলা হাসিটাও কেমন যেন কি-বলতে চাওয়া। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না তাঁকে। কিন্তু শমিতা তার কাছে কাঁচ কাগজের মতো স্পষ্ট। তার দুঃখ, তার ইচ্ছে কাছে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়।

তাই সামান্য কিছুক্ষণের আলাপেই কতকালের পরিচয় হয়ে গেছে যেন। মনেই হয় না এতদিন তারা কেউ কাউকে চিনতো না।

মনের কথাটা সোজা মুখের ওপর বলে দেয় বলে হয়ত তখন তখন একটু কেমন লাগে কিন্তু পরে ভেবে দেখলে খারাপ কি আর লাগে ? মেঘনা নামটাও ভাবতে গিয়ে ভালোই লাগলো। উত্তরে ব্রহ্মপুত্রেরই আর এক নাম মেঘনা, কিন্তু নামটার মধ্যে মেঘের ছায়া লুকোনো আছে। মেঘের গুরু গুরুও বুঝি বা। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির দিনে, মেঘনার কালোজলে যখন ইলিশ মাছের রূপোলী উলসানী দেখা দেয়, মনে হয় সাদা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। বকের পাঁতি উড়ে যাচ্ছে ঘনকালো মেঘের বুকের ওপর দিয়ে, বেলফুলের মালার মতো। একটা নামের মধ্যে এতটা ছবি লুকোনো ছিল আগে কে জানতো।

বারবার এপাশ ওপাশ করছিল হর্ষ। ঘুম নেই। পাশের ঘরের দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজলো। নরম শ্যাওলার মতো অন্ধকার রাত্রি। ঝিরঝির বাতাস দিচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে। একটু শীত শীত করছে। মাথা উঁচু করে তাকালো। নতুনবৌদিদের শোবার ঘরের এপাশের জানালাটি নিঃশব্দ, নিভে রয়েছে। দূর থেকে বোমের শব্দ আসচে এক ঘেয়ে, একটার পর একটা। দাঙ্গার আতঙ্কটা এ কদিনে অনেকটা কমে গেছে এপাড়ার বাসিন্দাদের মন থেকে।

—এখনো ঘুমোস নি হর্ষ ? পাশের খাট থেকে মার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন ভেসে এলো। বোঝা গেল অন্ধকারের মধ্যেও মা তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মন্দিরার নাক ডাকছে ওপাশে।

উসখুস করলো একটু, তারপর সঙ্কুচিত গলায় বললো, ঘুম আসচে না মা।

—আসচে না মা ! আসবে কি করে—মা কঠিন গলায় বললেন, তোকে বলছি হারু, এটা কক্‌খনো ভালো নয়। এই বয়সে এত ছাই পাঁশ ভাবা, এত রাত জাগা, কক্‌খনো ভালোর লক্ষণ নয়।

শেষটায় গলায় হতাশার সুর ফুটলো। কোন উত্তর দিল না হর্ষ। বিরক্ত হয়ে নিঃশব্দে মুখ গুঁজলো বালিশে।

গজেন ইদানীং অনুভব করতে পারছিল হর্ষ সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে, গম্ভীর হচ্ছে, লুকোতে শিখছে অনেক কিছু। কিন্তু কেন? গজেনের চোখটা আর একটু ট্যারা হলো সন্দেহে, একটা অস্পষ্ট অনুমানে। রায়টের সময় থেকে যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাদের মধ্যে সে ব্যবধান আর ঘুচে যায় নি। বাড়িতে যদি বা এসেছে কোন কোন দিন, বেশী কথা বলেনি। সব সময় কি যেন ভাবে হর্ষ। কিন্তু তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অতই কি সহজ!

—আজকাল তোর কি হয়েছে রে—দুকাঁধে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বললো, আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলিস কেন সব সময়!

—কি আবার হবে। এড়িয়ে এড়িয়ে চলি, এসব কি বলছিস তুই? হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে হর্ষ!

—মিথ্যে বলেছি কি খুবই? একটা চোখ ছোট করে শিকারীর মতো তাকায় গজেন, তারপর নাক ফুলিয়ে বলে, পলিটিক্স করা খারাপ তা বলছি না আমি, তবে ভাল করে না বুঝে না জেনে একটা দলে হুট্ করে ভিড়ে পড়া—সেটা কি ভাল কাজ হচ্ছে রে?

চমকে ওঠে হর্ষ, গজেনের তো এসব জানবার কথা নয়। নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে খোঁজ নিয়েছে তার। যাক, জানতেই যখন পেরেছে তখন আর লুকো-ছাপার কি আছে। সব সময় তাকে মেনে চলতে হবে এমন কথা লেখা-পড়া নেই, গার্জেনী ফলাতে হয় শিউলির ওপর ফলাক, তার কাছে কেন!

—ভালোমন্দ বুঝবার বয়স আশা করি আমার হয়েছে, গজেন? তবু তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।

মর্মাহত হলেও বাইরে চটলো না গজেন বরং আরো নরম হলো, এমনিই ওর চিরকালের স্বভাব।

—পার্টি আছে অনেক, প্রত্যেকেই একটা না একটা আদর্শকে ফলো করে, নিজেকে প্রত্যেকেই একমাত্র এবং অভ্রান্ত মনে করে—এই পর্যন্ত বলে হুইল থেকে সুতো ছাড়ার মতো আর খানিকটা সময় দিল গজেন, তারপর আরো মোলায়েম করে বললো, কিন্তু তুই-আমি তার দোষগুণ সব বুঝতে পারবো এতটা ভাবিস কেন। একটা বিশেষ দলের মোহজালে পড়লে কি তাকে বোঝা যায়?

গজেনের গুরুগিরি হর্ষর অসহ্য লাগে। এমন অধ্যাপক অধ্যাপক ভঙ্গিতে ও এই সব কথা বলে যে ভালোকথা বললেও গা জ্বলে যায় তার। তবু পুরনো বন্ধু, বলবার অধিকার তার আছে বৈকি।

কথাটাও তাহলে স্বীকার করতে হবে তোমাকে যে, বাইরে থেকে কোন কিছুই সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। অথচ সম্পূর্ণ করে না জানলে তোমার জানাটাই অসম্পূর্ণ থেকে গেল, যাকে জানলে না, তার কিছু ক্ষতি হলো কি তাতে?

—তাই বলে একেবারে কিছু না ভেবে চিন্তে—

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু, তোর কথা মেনে নিয়েই বলছি, যখন গলদ কোথায় নিজের চোখেই দেখতে পাবি তখন কি ফেরবার সময় থাকবে? তখন কি, একেবারে পার্টির মধ্যে জড়িয়ে পড়বি না?

—বাজে তর্ক থাক। আমার যা ভালো লাগে আমি তা করবোই! চুলচেরা বিচারে সেটা ভাল কিংবা মন্দ অতোয় আমার দরকার কি!

—তবে আর আমার বলবার কিছু নেই—গজেন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললো একটা, তবে তোর সঙ্গে কোনদিনই আমি একমত হতে পারব না এবিষয়ে।

—দুঃখিত সেজন্যে। আচ্ছা চলি—আরো একটা আঘাত দিয়ে হর্ষ গ্রে স্ট্রীটের ট্রামটা ধরলো।

আসলে গজেনটা হয়ত মনে মনে খুব ভীতু, হাতে কলমে দেশের কাজে নামতে তার সাহস নেই, খালি তোতা পাখির মতো বইয়ের বকুনি বুলি ঝাড়বে। পার্টির কথা ভাবলে মনে গর্বই হয় হর্ষর, এমন একটা আলোর খবর এতদিন জানা ছিল না বলে আপশোষও হয়। অন্ধকারে দিন কাটিয়েছে বসে বসে। নতুনবৌদির সঙ্গে লুডো আর ক্যারমে অপব্যয় করেছে দামী দামী বিকেল গুলো। তবু অনেক ভাগ্য তার, দৈবাৎ ছিটকে এসে পড়েছে এই দলের মধ্যে, অভাবনীয় ভাবে।

অবশ্য, গজেনের কথাগুলো আর একবার ভাবলো হর্ষ, পার্টির সমস্ত ইতিহাস সে জানে না। সমস্ত ব্যাপার তার মাথায় ঢোকেও না। তাই বলেই খারাপ কিছু সন্দেহ করতে হবে? তাছাড়া, সে তো একটা তুচ্ছ ছোট ছেলে, কত বড়ো বড়ো লোক যাতায়াত করে সেখানে। কত হীরের টুকরো ছেলে। স্কলারশিপ পায়, ফার্স্ট হয়, এমন ছেলেরও অভাব নেই। তারাই বা আসে কেন তা হলে?

নতুন কিছু, ভালো কিছু করতে গেলেই লোকের মনে সন্দেহ জাগবে, বাধা দেবে দু-হাতে। এমনই আমাদের দেশের অবস্থা। রামদার কথাটাই হুবহু মনে পড়লো।

সেটা ছুটির দিন ছিল, হাতে কাজ ছিল না কোন। হর্ষর বাবাও ছিলেন না বাড়িতে। মনটা হাল্কা লাগছিল কেন জানি।

নোতুনবৌদির দেখা পেতেই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো, বৌদি একটা খুব ভালো সিনেমা এসেছে—ছেলেরা বলছে দেখতে যাবে। খু-উব নাকি ভালো, অদ্ভুত।

রান্না করতে করতে সবে এঘরে এসে ঢুকেছেন, এমন সময় হর্ষ তাঁকে লক্ষ্য করে কথা গুলো বললো। খবরের কাগজের মর্মর ধ্বনি তুলে অনিরুদ্ধদা জানিয়ে দিলেন তিনিও ঘরের এক কোণে শুয়ে আছেন। শমিতার চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখালো সিনেমার কথায়।

—অদ্ভুত ?—নতুনবৌদির ঠোঁটের মসৃণ হাসিটা দাঁড়িয়ে পড়লো একমুহূর্তে, তা আমাকে বললে তো কোন কাজ হবে না, ভাই। আমার কথা শুনছে কে বলো, বলে অনিরুদ্ধদাকে কটাক্ষ করলেন।

কিন্তু খবরের কাগজে মুখ ঢাকা থাকলেও তাঁর কথা, অনিরুদ্ধদা মনে হলো খুব মনোযোগ দিয়েই শুনছিলেন। হাতের কাগজ নামিয়ে রেখে, চোখ থেকে চশমা খুলতে খুলতে উঠে বললেন,—অভিমানের মহড়ায়, বুঝলে ভাই, তোমার বৌদি বেশ হাত পাকিয়েছেন, আই মীন, গলা পাকিয়েছেন।—একটু উঁচু পর্দায় হাসলেন ঢেউখেলিয়ে, তোমার বউদির কোন কথাটা আমি রাখিনে, বলো তো ভায়া ? এক কথায় বাড়তি টিউশানী দুটো এই তো সেদিন—

—আহা কি আনন্দ ! নতুনবৌদি কৃত্রিম শ্লেষ মেশালেন গলায়, আর, যখন তখন অমন যা তা শব্দ করে তুমি হেসো না বলে দিচ্ছি।

—ওই জন্যেই—অনিরুদ্ধদা একেবারে হৈ হৈ গলায় সমর্থন করলেন, শাস্ত্রে তোমাদের বলেছে রমণী, আমাদের পুরুষ। মানে বোঝ ?

—মোটেই না। চাপা হেসে ঘাড় নাড়লেন বৌদি।

—আহা এতো সোজা কথা, তোমরা রমণীয় আর আমরা পরুষ বলে। তোমাদের মতো অমন মিহি টুথপেস্ট হাসি যদি ভগবান আমাদের বিলোতেন, তাহলে তো আদ্দেক বর দিয়েই ফেলতেন ভুলে ভুলে। তখন এত কষ্ট করে আর চাকরিবাকরি করতে হতো নাকি আমাদের ?

—অনেক রসিকতা করেছো, এবার হর্ষ কি বলছে শোন।

—সেই ভালো—হর্ষর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার সেই অদ্ভুত ছবিটির নাম বাতলাও দেখি চটপট, আমি আমার রায় দিয়ে ফেলি।

তারপর দল বেঁধে সেই ছবি দেখতে যাওয়া হয়েছে। আবছায়া ঘরের মধ্যে যন্ত্র সংগীতের তালে তালে পর্দা উঠেছে, কাহিনী শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তঝরা ইতিহাস। মাস্টার দার নেতৃত্ব। কত নীরব আত্মবলি-দানের কাহিনী।

দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় হর্ষ। একটা যেন ইসারা দেখতে পায়, নিজের জীবনেও। রামদাকে মনে না পড়ে পারে না। অনেকটা

এই মাস্টারদা সূর্য সেনের মতো চেহারা। চুলে তেল-যত্ন নেই, জামাকাপড়ের দিকেও অদৃষ্টি।

রামদাও এমনি আস্তে আস্তে অথচ জোরালো গলায় বলেন, স্বাধীনতা আমরা পাইনি। দেশের বুকে ছুরি চালিয়ে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ! মানচিত্রখানাকে দুখণ্ড করে দেশকে অপমান করা যায়, দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।

কেন, পূব বাংলায় কি মানুষ বাস করে না, তোমাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও কি লড়ে আসেনি এতদিন? বলতে বলতে রামদার গলার শিরাটা ফুলে ওঠে, মুখে ছড়িয়ে পড়ে যন্ত্রণার চিহ্ন, বলেন—দ্যাখোনি শেয়ালদা স্টেশনে, মানুষের আত্মার অপমানের নমুনা দ্যাখোনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত?

দেখেছে বৈকি হর্ষ, কিছুই দেখতে বাকি নেই তার। যেদিন শুনেছে তাদের সাগতা গ্রাম, তাদের পাবনা জেলা, তাদের সমস্ত উত্তরবঙ্গ একটা কলমের খেয়ালী আঁচড়ে কাটা পড়ে গেছে ম্যাপ থেকে সেদিন প্রথম দেশের কথা, দেশের লোকের কথা ভেবেছে গভীরভাবে। প্রথমটা কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি, একটা কলমের নিবের এত কি ধার যে চিরকালের জেনে-আসা মেনে-আসা সত্যিটাকে মিথ্যে করে দেবে এক খোঁচায়। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি তাদের তেঁতুল গাছের আগ-ডালে সব প্রথমে যে রোদটুকু এসে পিছলে পড়বে, এখন থেকে সে আর তাদের নয়। বেতের ফল পাকবে থোকা থোকা, নির্জন দুপুরে তার টকটক আস্বাদ আর তাদের জন্যে নয়। উঠোনে চোখ মোছা ভোরে ঘুঘু ডাকবে মিনতি করে: ঠাকুর গোপাল ওঠো ওঠো! সেও অন্য কারো জন্যে।

কিন্তু অ্যাকসিডেণ্টে সব সম্ভব, সব সয়ে নিতে হয়। কোমর থেকে পা কি কাটা যায় না কারো?

কতদিন স্কুল পালিয়ে পিচ গলা রোদ্দুরে শেয়ালদা স্টেশানটা ঘুরে এসেছে হর্ষ। রিলিফ সোসাইটির হয়ে 'রুটি গুড়' বিলোতে গেছে সেই অসংখ্যবাহু ক্ষুধার মধ্যে। ছেঁড়া জামাকাপড় বাড়ি বাড়ি থেকে ভিক্ষে করে নিয়ে গিয়েছে। অসহায়, নিরাশ্বাস, পংগু মানুষগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, তাদের চোখে কোন দৃষ্টি নেই, ঠিক যেন পাথরের চোখ।

এক এক সময়ে ঘৃণা হয়েছে মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই আবার করুণায় ভরে গিয়েছে মন। বুঝেছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অপমানে হতাশায় এরা এত স্থূল হয়ে উঠেছে।

এর আগে এরা কখনো হাত পাতে নি, দেশের মাটিতে জায়গার অভাব হয় নি, মোটাভাত মোটা কাপড় চিরকালই জুটে গেছে না চাইতে। তাই আজ টাল সামলাতে পারছে না।

হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়। একটা ঠাণ্ডা কোমল হাতের নাড়া খেয়ে সম্বিত ফিরে পেল।

পরমুহূর্তেই হাতটা শমিতার কোলের ওপর থেকে লজ্জিতভাবে টেনে নিতে নিতে দেখলো আবছা চোখে শমিতা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

তাদের এই মুহূর্তের চোখাচোখির কথা কেউ জানলো না। না নতুন-বৌদি, না অনিরুদ্ধদা, এমন কি শমিতার মাও না।

শীত এসে গেছে। দিনগুলো রূপোলী ইলিশের মত একটুখানি ঝিলিক দিয়েই রাত্রির অগাধ অন্ধকার জলের অতলে তলিয়ে যায়। নিমগাছের ছায়াটা ছাদের ওপর পড়তে না পড়তে শুকিয়ে যায়, শুকনো মাটিতে জলের ছিটের মত।

মন খারাপ করে দেয় সন্ধ্যে বেলাটা। মনে হয় সব ফুরিয়ে গেল, আলো, হাসি, উৎসব। এখন শুধু পৃথিবীর চোখের ওপর নামবে গলিত অবয়ব-হীন অসুস্থ অন্ধকার। তারই পূর্বভূমিকা এই ধোঁয়াটে সন্ধ্যেটার, মাকড়সার মত বিষাক্ত আকা বাঁকা পা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে গলির আকাশ।

পরীক্ষা এসে গেছে, একেবারে বাৎসরিক পরীক্ষা। মনের মধ্যে কোন উৎসাহ জাগলো না হর্ষর, কোন উদ্দীপনাই খুঁজে পেল না পড়াশোনার মধ্যে। এখন তার সামনে আর একটা কঠিন পরীক্ষা পায়ে পায়ে নির্ভুলভাবে এগিয়ে আসচে। সেটা ডিঙোতেই হবে।

তবু আর পাঁচটা ছেলের মতই সচিৎকারে পরীক্ষার মুখোমুখি হলো সে, স্কুলের কথাটাও একদম ভুললে চলবে কেন। মার চোখ আছে না।' তার জানালায়ও অনেক রাত অবধি আলো জ্বললো।

কত রাতে বই থেকে হঠাৎ চোখ তুলে হর্ষ দেখতে পেয়েছে সামনের জানালায় আরো দুটো চোখ জেগে রয়েছে গোপনে। সেই শান্ত স্থির চোখ যেন বলছে, তুমি পড়ো, তুমি আরো পড়ো মেঘনা, এগিয়ে যাও, আমার মত থেমে পড়ো না।

ওমনি আর একটা ঘরের কথাও মনে পড়েছে হর্ষর। জানালা বন্ধ। দরজা বন্ধ। কাঠের পুতুলের মত সারিসারি ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে রামদা বলছেন, থেমে পড়ো না, এগিয়ে চলো, এখন শুধু ওই একটি মাত্র পথই আছে। আজ তোমাদের সকলের সম্মতি পেয়ে আমি সত্যিই খুশী হয়েছি। আমাদের ওপর সরকার থেকে যে প্রতিবন্ধক জারী করা হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য তোমরা যে জীবন পণ করে এগিয়ে এসেছো সেটা সত্যিই আনন্দের কথা, কিন্তু তবু আমি তোমাদের একবার ভেবে দেখতে বলবো।

একটু থেমে আবার শুরু করেন রামদা, এখনো সময় আছে, এখনো যদি তোমাদের কারো মনে কণা মাত্র দুর্বলতা এসে থাকে, দ্বিধা এসে থাকে, তবে এই বেলা সরে যাও। দেশের প্রতি আনুগত্য তাতে কিছু কম বলে মনে করবো না, বরং এই ভেবে আনন্দ পাবো, পার্টির সঙ্গে তোমরা প্রতারণা কর নি। কিন্তু তা এখনি, নইলে আর কখনো নয়। একবার ঝাঁপিয়ে পড়লে আর পেছুনো চলবে না, ফেরা চলবে না। বিপদ যত বড়ো হয়েই আসুক তখন বুক পেতে দাঁড়াতেই হবে। নইলে বুঝবো তোমরা শুধু অক্ষম নও, ক্ষমারও অযোগ্য। কারো কিছু বলবার আছে ?

ছায়ামূর্তিরা স্থির, অপলক, অবিচলিত।

রামদা সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, বেশ। তারপর নিজের আসন ছেড়ে এগিয়ে আসলেন সকলের পিছনে, থেমে দাঁড়িয়ে হর্ষ আর লালমোহনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, কিন্তু ভাই, তোমরা থাক, তোমাদের সময় আসেনি এখনো।

চোখের সামনে সিনেমার একটি দৃশ্য ভেসে উঠলো। আনন্দ, আনন্দও তো তাদেরই বয়সী ছিল, সেও মাস্টারদার জন্যে কেমন অক্লেশে প্রাণ দিয়েছে; বয়সটাই কি সব !

হর্ষই জবাব দিল দৃঢ় গলায়, তা হয় না রামদা, আমরা মনস্থির করে ফেলেছি।

পড়া কখন থেমে গিয়েছিল, বই খুলে রেখে জানালার বাইরে তাকিয়ে ভবিষ্যতের একটা অত্যন্ত অচেনা অথচ অত্যাসন্ন দিনের কথাই মনে মনে ভাবছিল হর্ষ। সামনের জানালা থেকে একটা মিষ্টি গলা শোনা গেল, খুব আস্তে।

—কি সব যা তা ভাবছো মেঘনা, বই খুলে রেখে ! তোমাকে না এবার ফার্স্ট হতে হবে।

দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে অন্ধকারের মধ্যে শমিতার শান্ত উজ্জ্বল মুখখানা খুঁজলো হর্ষ। লোহার দুটো গরাদের ওপর দুটো গাল রেখে দাঁড়িয়ে আছে, অনিরুদ্ধদার শোওয়ার ঘরের সেই রঙিন বৌদ্ধ-বালিকার ছবিটির মত। চুলটা মাথার ওপরে চূড়ো করে বাঁধা।

একটুখানি শব্দ করে হেসে ফেলে হর্ষ বললো, কি ভাবছি জানো ?

—তাই তো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।

—ভাবছি অন্ধকার। তুমি কখনো অন্ধকার ভাবো, শমিতা ?

একা পেলে শমিতাকে নাম ধরে ডাকে হর্ষ, তাতেই ও খুশী হয়। সকলের সামনে যখন ওকে দিদি বলতে হয়, শমিতাই অস্বস্তি বোধ করে সব চেয়ে বেশী।

—তোমার কি মাথা খারাপ হলো, বড়ো বড়ো চোখে শমিতা বললো, এমন আবোল তাবোল বকছো কেন আজ ?

—আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পারবে না, শমিতা। আমার মনের মধ্যে ঠিক এই মুহূর্তে কি ঝড় যে বয়ে চলেছে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তাই মনে তো হবেই আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমি আবোল তাবোল বকছি।

শমিতা শঙ্কিত হয়ে উঠলো, হর্ষর চোখের এলোমেলো ভাব দেখে। এক মুহূর্তে সে সাবধান হয়ে গেল। এতটা সে আশা করে নি, কথাটার এবার মোড় ফেরানো দরকার।

—না না, আমি ঠিক সে কথা বলিনি। পড়বার সময় ভাবনা চিন্তাটা দূরে সরিয়ে রাখাই ভালো নয় কি? তোমার বাবা মার কথা ভাবো একবার, কত আশা করে—

—আমার চিন্তা করবারও যদি স্বাধীনতা না থাকে—

শমিতা হঠাৎ সরে গেল জানালা থেকে। পিছনে মার গলা শুনে চমকে উঠলো হর্ষ।

—ওকি, কার সঙ্গে কথা বলছিস জানালা দিয়ে? পিছন থেকে সাঁড়াশির মত প্রশ্নটা এগিয়ে দিলেন মা। হর্ষ জানে শমিতার সঙ্গে তার অত মেলামেশাটা পছন্দ করেন না মা।

প্রশ্নটা যেন শুনতে পায় নি এমনি ভান করে তার নিজেরই অসম্পূর্ণ বাক্যটার জের টেনে জানালাটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চললো হর্ষ, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।

মা এগিয়ে এসে দরাম করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, হুঁ, ঢের হয়েছে, এবার দয়া করে চাট্টি গিলে নেবে চলো।

এক এক সময় হর্ষর মা সাবিত্রীবালার মরে যেতে ইচ্ছে যায়। এই সংসারে কেন যে তিনি আছেন সেই সদুত্তরটা খুঁজে পান না মনের ভেতর। এই যে যন্ত্রের মত খেটে চলেছেন সেই পনের বছর বয়স থেকে সে কার জন্য? নিজের জন্যে নয় তা তিনি জানেন, নিজের জন্যে আজ পর্যন্ত কিছুই তিনি করেন নি। করবার সুযোগও আসেনি। এ সংসারে তাঁর জন্ম হয়েছিল পরের জন্য, তাঁর মা তাঁর বাবা, কোন দিন চোখে দেখেনি তাঁদের। পুরো দু বছর বয়স হতে না হতেই তাঁদের চলে যাবার তর সইল না। এমন হতভাগী কে আছে তাঁর মত, যে এ জীবনে তার মা-বাবার চেহারাটাও ভাবতে পারলো না একবার। একটা ফটোও যদি থাকতো!

তারপরে পরের ভাতে আর চোখের জলে বেড়ে উঠেছেন পরেরই জন্যে, বিয়ে হয়েছে, সেও নিজের প্রয়োজনে বলে আজ আর বিশ্বাস হয় না। একখানা খড়োঘরের নিচে মাথা গুঁজে শ্বশুরঘর করেছেন, কেন না স্বামীর ছোট ছোট ভাই বোনদের মানুষ করে তুলতে হবে, শাশুড়ী পংগু, নিজে কিছুই দেখা শোনা করতে পারেন না। নিজের জীবন পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এই পরিবারের জন্য। আজ বুঝতে পারছেন, তারও কোন মূল্য পান নি তিনি।

কিসের দুঃখ ছিল আজ তাঁর। ছেলে মেয়ে হয়েছে, দেওররা মানুষ হয়েছে, স্বামীর আয়ও বেড়েছে চতুর্গুণ। কলকাতায় বাসা করে আছেন, দেশের বাড়ির তুলনায় কাজের চাপও কিছু না। তবে? তবে কিসের দুঃখ আজ তাঁর? কিন্তু দুঃখ থাকলেই হয়ত ভালো হতো, দুঃখকষ্ট তাঁর সয়ে গেছে ছোট বেলা থেকে। এখন যদি মনে অশান্তি না থাকতো তাহলে কি আর ধিক্কার আসতো নিজের জীবনের ওপর। শান্তিটাই আসল, আর তাই পেলেন না তিনি, পাবার আশাও নেই। স্বামীকেই পুরোপুরি পেলেন না, তার—দমবন্ধ হয়ে আসতে চাইল তাঁর। ছোটবেলা একবার জলে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি, মরবার ঠিক আগের মুহূর্তটা জানতে পেরেছেন কেমন লাগে। একটা অন্ধকার চেপে বসে বুকের ওপর, ফাঁপর খেয়ে শরীরটা তালগোল পাকিয়ে আসাড় হয়ে যেতে চায়, মনে হয় ধীরে ধীরে শ্যাওলার মত আলগা হয়ে নরম হয়ে শরীরটা ছড়িয়ে পড়বে। সমস্ত চিন্তা ফুরিয়ে যাবার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে পাশাপাশি অনেক কালের পুরনো ছবি বন্ধ চোখের পরদায়।

এক এক সময় সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে যখন তাঁর মরে যেতে ইচ্ছে হয়, এমনি ফাঁপর খেয়ে, তখনই তিনি ভেসে ওঠেন। গলায় দড়ি দেওয়া কি গঙ্গায় ডুবে মরা কোনটাই কাজের কাজ বলে মনে হয় না আর, যখন শেষ মুহূর্তে হর্ষ আর মন্দিরার কথা দপ্ করে মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে। ঠিক তখনই সংসারে বাঁচার একটা মানে পাওয়া যায়। তাঁর মুখ চেয়ে কেউ আছে জানলে তবেই তিনি বাঁচতে পারেন, নইলে নিজের কোন অর্থ হয় না আলাদা করে।

সেই অনেক দুঃখের ছেলে মেয়ে যদি আবার তাঁকে নতুন করে দুঃখ দেয় তবে তিনি সইবেন কি করে। মেয়েটা অবশ্য তাঁকে বেশী ভোগায় নি, কিন্তু ছেলেটা? মাঝে মাঝেই একটা অসুখ বাধিয়ে বসে এমন যে, যমের সঙ্গে তাঁর টানাটানি পড়ে যায়। ভগবানের মনে কি আছে কে জানে, হেলাফেলা করে এতদিন পরে ওকে দিলেনই যদি তবে মাঝে মাঝেই ভয় দেখান কেন? ও যদি প্রাণে বেঁচে থাকে, লেখাপড়া না হয় না হবে, তাতেই তিনি শান্তি পাবেন চোখ বোজবার সময়। ভয় করে শুধু ছেলেটার মধ্যে তাঁর শ্বশুরের লক্ষণ দেখে।

এই যে আজ পরীক্ষা দিয়ে এলো, এসে যেই দেখেছে মা বাড়ি নেই, অমনি অভিমান হয়েছে ছেলের, না খেয়েই খেলতে বেরিয়ে গেছে। মন্দিরা খাবার নিয়ে এসে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছে, পায় নি। পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন একটু বেড়াতে এরই মধ্যে এত কাণ্ড।

আটটা বাজলো পাশের বাড়ির ঘড়িতে। শেলাইটা সরিয়ে রেখে সাবিত্রীবালা উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানলেন হর্ষ ফেরে নি। খুব আশ্চর্য লাগলো তাঁর। শীতের রাত, আটটা বেজে গেল এখনো ফেরার নাম নেই, অথচ কালও পরীক্ষা আছে। গেলো কোথায়। ভয় ভয় করলো কেমন যেন। খালি বাড়ি, হর্ষর বাবাও বাড়িতে নেই। এখন কি যে করেন তিনি।

এমন সময় পাশের বাড়ির জানালা থেকে নতুনবৌ তাঁকে ডাক দিল, শুনছেন?

সাবিত্রীবালা কেমন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটে গিয়ে জানালা খুললেন, বুক ধড়ফড় করে উঠলো, কথা কইতে পারলেন না, শুধু জিজ্ঞাসু চোখ তুলে নতুনবৌয়ের দিকে তাকালেন। অনিরুদ্ধর বৌ সুনন্দা একটুখানি হেসে বললো, আমি বলতে ভুলে গেছি মাসিমা, হর্ষ আজকে আর বাড়ি আসবে না, কাল সকালে বাড়ি ফিরবে। কাল রাতে আমাকে চুপিচুপি বলে রেখেছিল আপনাকে যেন বুঝিয়ে বলি।

—কেন, কোথায় গেছে সে? কাল না তার পরীক্ষা। সাবিত্রীবালা ভয়ে ভয়ে বললেন।

—কেন, বাড়িতে কি কিছুই বলেনি ? সুনন্দা আশ্চর্য্য হলো, দমদমে পিকনিক করতে গেছে যে। আর পরীক্ষা বোধহয় কাল নেই, আমাকে বলতো তাহলে।

আমাকে বলতো তাহলে, কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করে সাবিত্রীবালার রাগে দু:খে চোখে জল এলো। মাকে বলা গেল না, মা এতই পর হলো, পাড়া প্রতিবেশীর চেয়েও। পরমুহূর্তেই মনটা শক্ত হয়ে উঠলো, না:, কিসের মায়া এই সব সন্তানের ওপর। পেটে করে শত্তুর ধরেছিলেন তিনি। তাঁরই কত জন্মের পাপের ফল এসব।

ছেলের স্পর্ধায় কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বাইরে রাত কাটাবে, মায়ের অনুমতিটা পর্যন্ত নেবার দরকার করে না, এতটা সাহস বেড়েছে! আচ্ছা ফিরুক আগে কাল, পীরিতের বৌদিদিই সব করে কিনা দেখবেন। জামাকাপড় কেচে দেওয়া, সময় মত শুতে বলা, খেতে দেওয়া, হাত খরচা যোগানো কিছুই আর করবেন না তিনি।

পরদিন ভোরবেলা জনার্দনবাবু খবরের কাগজ হাতে বাড়ি ফিরলেন। রেলের চাকরী, দুদিন বাইরে কাটাতে হয়, দুদিন ঘরে। ঘরে ফিরেই সকলের আগে লক্ষ্য করলেন হর্ষ নেই। কিন্তু অত্যন্ত চাপা মানুষ, স্ত্রীকে বললেন না কিছুই।

প্রতিদিনকার মত যথারীতি রান্নার এটা ওটা ফরমাস দিলেন। মন্দিরার সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন। গম্ভীর মুখে কাগজ পড়লেন, এমন কি গীতবিতান নিয়ে যথাপূর্ব গানও করলেন কিছুক্ষণ গুণগুণ করে।

সাবিত্রীবালা বারকতক ইতস্তত: করলেন কথাটা স্বামীকে যেচে বলতে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভেবে। ছোটোও নেই এখানে, থাকলে সেই তার দাদাকে বলতে পারতো কথাটা। সকালও হয়েছে এখন নয়। অথচ ছেলেটা বাড়ি ফিরলো না, ভাবনারই কথা।

সাবিত্রীবালা চৌকাঠ পার হবার উদ্যোগ করতেই নৈর্ব্যক্তিক সম্বোধনে প্রশ্ন করলেন জনার্দনবাবু, কিছু বলবে ?

সুযোগ পেয়ে গেলেন সাবিত্রীবালা। ছেলের দিকটা বাঁচিয়ে বলতে গিয়ে অনেকটা বানিয়েই বলতে হলো তাঁকে। শেষে বললেন, দমদম তো কাছে নয়, ফিরতে একটু দেরীই হবে, কি বলো ?

জনার্দনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, তা তোমার ছেলে যেখানে গেছে সেখান থেকে ফিরতে একটু দেরীই হয় বৈকি।

কথার সুরটা অচেনা ঠেকতেই সাবিত্রীবালা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে শুধালেন, তুমি কি দমদমের কথা বলছো ?

জনার্দনবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, না, আমি আলিপুরের কথা বলছি। তোমার ছেলে চিড়িয়াখানায় ভর্তি হয়েছে, বোধ করি।

বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন সাবিত্রীবালা। ঠাট্টাটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না যেন। কাগজখানা স্ত্রীর চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, সারা ভারতে কাল হাজার খানেক ছেলে ধরা দিয়েছে সত্যাগ্রহ করে। কাগজে লিখেছে—দেখছো না ?

—কিন্তু—

স্ত্রীর বিহ্বলতা লক্ষ্য করে জনার্দনবাবু সহসা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে তোমার গুণধর ছেলে। জেলে গেছে।

স্ত্রীকে অসম্ভব রোগা মনে হলো হঠাৎ, দুচোখের অর্থহীন দৃষ্টিটা জনার্দন-বাবুকে প্রহার করলো। তিনি চোখ বুজলেন, বুঝি দূরের কাউকে দেখবার চেষ্টা করলেন মনে মনে।

আর ঠিক ততক্ষণে সাবিত্রীবালা পাথর হয়ে গেছেন। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। খুব জোরে ঝাঁকুনি লাগা ঘড়ির মত বন্ধ হয়ে গেছেন যেন। শূন্য হয়েগেছে তাঁর বুকের কাছটা, নিজেকে একান্ত একা, আর অসহায় মনে হলো।

জনার্দনবাবু চোখ না খুলেই ধূসর গলায় বললেন, আগেই ওর হাবভাব দেখে সন্দেহ করেছিলুম আমি, হতভাগা কিছু একটা করতে যাচ্ছে।

—অনুমানের ওপর এতটা ভেবে বসা—সাবিত্রীবালা নিজেকে ভরসা দেবার জন্যেই বললেন ফিসফিস গলায়।

—অনুমান! খোঁচা খাওয়া বাঘের মত জনার্দনবাবু চোখ মেললেন, আমার নিজের ছেলে, আমি ওকে চিনিনা ? ওর স্যুটকেশ থেকে যেদিন ঐসব কাগজপত্র পেলুম, সেইদিনই বুঝেছি ও কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কোনদলে মিশেছে।

শীতের রোদ্দুরে একটা ছায়া এসে পড়লো ঘরের মেঝেয়, কেউ লক্ষ্য করলেন না সেটা। দরজার পাশে মন্দিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলো। একটা চড়ুই ডাকছে কাছেই কোথায়।

—সেদিনই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল! করুণভাবে জনার্দন-বাবু মাথাটা দোলালেন বার কতক। ভবিতব্য!—শেষে উপসংহার টানলেন।

একটা ভয় শেষ পর্যন্তও হর্ষর মনের মধ্যে আনাগোনা করেছে, হয়ত তাদের গ্রেপ্তার করা হবে না, তাদের গ্রুপ-ইনচার্জ শচীনদার আশঙ্কাই ফলে যাবে অল্প বয়সের জন্যেই হোক আর সক্রিয় ভাবে সামান্যতম ক্ষতিকর কিছু না করার দরুণই হোক, পুলিশ তাদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থাটুকুও করবে না, শুধু

একটু শিক্ষা দেবার জন্য গাড়ি করে দূরে কোথাও নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে শীতের মাঝরাত্রে। কিন্তু বিপদ তো তাতে নয়, তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে হর্ষ। মার লক্ষ্মীর পটের পেছনকার গুপ্তভাণ্ডার থেকে আসবার আগে একখানা করকরে নোট হাতিয়ে এনেছে। তারপরের দিন নিয়েই যা কিছু দুশ্চিন্তা, কি করে বাড়ি ফিরবে। একটু আগেই যে দুখানা চিঠি পোস্ট করে এসেছে, কাল বিকেলের আগেই তারা সব কিছু ফাঁস করে দেবে বাড়িতে, এতদিনের ভেতরে ভেতরে যে ষড়যন্ত্র চলছিল তা আর লুকোছাপা থাকবে না। তাদের পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবার জন্যেই সে স্বেচ্ছায় জেলে চলেছে, কিছু খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে না, কারো মাথা হেঁট করে, বংশের সুনামে চুণকালি মাখিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে তো নয়ই। এই কথাটাই বইয়ের ভাষায় এমন দৃষ্টান্ত তুলে লিখেছে যে, কারো কাটবার সাধ্য নেই কোন যুক্তি দিয়ে। রোধ করবারও উপায় নেই, ডাকপিওন নির্ভুল ভাবে হর্ষর বাড়ি পেঁ ৗছবার আগেই সেটা যথাস্থানে পেঁ ৗছে দেবে। আর তাই ভাবনা, ফিরে গেলে শুধু তো লজ্জা নয়, কঠিন শাসনও, বাইরে বেরোনো হয়ত বা বন্ধই হয়ে যাবে বেশ কিছু কালের জন্য।

চিঠি অবশ্য মাকে লেখেনি, বাড়ির কাউকেই না, শুধু নতুনবৌদিকে আর শমিতাকে। নতুনবৌদিকে চিঠি লিখতে হয়েছে, মাকে লিখতে পারে নি বলেই। অতবড় আঘাতটা মাকে দিলে, হর্ষর ভয় হয়, মা হয়ত সহ্য করতে পারবেন না। তাই এমন একজনকে চাই যে ঠিক আপনজন না হয়েও তার আপনার কেউ, তার সমস্ত কার্যকলাপ যে স্নেহ দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে; যতটা সম্ভব নিরাপদ করে মাকে বোঝাতেও পারবে। এবং তা একমাত্র নতুনবৌদিই পারেন, যদিও কালরাত্রে তাঁকে একটা মিছে কথা বলে এসেছে, দমদমে পিকনিকের কথা। কিন্তু সেও তো মায়ের জন্যই, মার ভাবনা, দুর্ভাবনা, কিছুতেই সহ্য করতে পারে না হর্ষ, মনে হয়, মা মনে মনে এত দুর্বল আর অসহায় যে, একটু জোরে আঘাত লাগলেই মরে যাবেন নিশ্চিত। আর, বাড়িতে এক মন্দিরা ছাড়া মাকে ভালোবাসবার মত কেউ নেই। মাকে তাই যতটা না ভালোবাসে, করুণা হয় তার চেয়ে ঢের বেশি। তাই যতটা সইয়ে, একটু একটু করে, গরম দুধের বাটির মত জুড়িয়ে জুড়িয়ে, আঘাতটা দেওয়া যায়।

নইলে পাশের ঘরে যে একজন দুঃসম্পর্কের এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাস করেন, যাঁকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ভাবতে পারলেই বেশি খুশী হতে পারতো হর্ষ, সেই কে এক জনার্দনবাবু, যাঁর সঙ্গে ইদানীং তার মানসিক সম্পর্কটা খুব কিছু মধুর চলছিল না তাঁকে ভুলতে পারলেই হয়ত ভালো হয়। তাঁর কাছ থেকে, তাঁর নিঃশব্দ অস্বস্তিকর অস্তিত্ব থেকে, দূরে পালাতে পারলে হয়ত আর কোন কষ্টই থাকবেনা তার। অথচ মাত্র ক-বছর আগে, বৃন্দাবন যখন

ঘরের বেড়া থেকে চামড়ার চাবুকটা টেনে নামিয়েছিল পৈতৃক স্মৃতির উদ্দেশে, সেদিন এই হর্ষরই স্তম্ভিত হয়ে যেতে বাধে নি।

দ্বিতীয় চিঠিটার কথা আলাদা, সেটা খামের চিঠি, সেটা শমিতার চিঠি। যে শমিতা তাকে নাম ধরে ডাকবার সাহস দিয়েছে, ক্লাসে ফার্স্ট হবার ভরসাও; যেটা কখনোই সম্ভব ছিল না। বরাবরই একটা জিনিস লক্ষ্য করে অস্বস্তি পেয়েছে হর্ষ, কেউ না কেউ তার সম্বন্ধে এমন একএকটা অন্যায় রকম ভালো ধারণা জমিয়ে বসেছে, যা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। এই যে শমিতা তার লেখাপড়া সম্বন্ধে এমন একটা অটল উচ্চধারণা করে বসে আছে, কোন সঙ্গত কারণ আছে এর পেছনে? সে নিজে তো ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে লেখাপড়া তার দ্বারা হবে না, অন্তত: আপাতত হবে না। যে ছেলে দেশের জন্যে একটুও অন্তত: সত্যি করে ভাবে, তারই হবে না। ছোটকাকার কথাটা নির্মম রকম সত্যি বলে মনে হয়, এটা দেশের সঙ্কট মুহূর্তের সন্ধিক্ষণ, এই সময়ে যারা ছাত্র, আঠারোর আশে পাশে যাদের নাকি বয়েস, যে বয়সটা সব চেয়ে মারাত্মক, তারা কি করে খবরের কাগজের পাতা ছেড়ে, বাঁচা মরার প্রশ্নপত্র রেখে, অন্যদিকে চোখ ফেরাবে? আলাউদ্দিন খালজির চরিত্রের চেয়ে আরো ঢের বেশী দরকারী জানবার কথা প্রতিদিন সকালে মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। অল্প কটা বছরের সঙ্কীর্ণ ইতিহাস, মন্বন্তর–মহাযুদ্ধ–দাঙ্গা–দেশভাগ–স্বাধীনতা, এই যে একের পর এক ঢেউ এসে ভেঙে পড়েছে, ছাত্র সমাজের বুকে যদি তার ধাক্কা না পড়ে থাকে তবে কোথাও পড়ে নি।

তাই শমিতা যতই ভাবুক না কেন, হর্ষর হবে না। আজ প্রথম দিন পরীক্ষায় বসে ইংরেজীর খাতায় যা করে এসেছে, শমিতা শুনলে চোখ কপালে তুলবে। জীবনে প্রথম যে ঝাঁপ দিতে গেছে খুব উঁচু থেকে, তার কাছে ধীরে সুস্থে হেঁটে বেড়ানো মানুষগুলোকে পুতুলের মত অক্ষম মনে হয়। তাই যারা ভীষণ সিরিয়াস হয়ে তার চারপাশে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাদের দেখে হাসি পাচ্ছিল, করুণা হচ্ছিল। অপদার্থ মনে হচ্ছিল গজেনটাকে, যে বাড়তি কাগজ চেয়ে নিচ্ছিল ঘণ্টায় ঘণ্টায়। আর হর্ষ, যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই উল্কার মত কোথায় ছুটে যাবে নিজেই জানে না, সে যতটুকু না লিখেছে পাতায় পাতায় চিত্রবিদ্যা ফলিয়েছে তার চেয়ে বেশী। ডেভিড কপারফিল্ডের জীবনকথা লিখতে গিয়ে পেগটির এমন একখানা ছবি সে এঁকে রেখে এসেছে যে, খাতা দেখবার সময় আঁতকে উঠবেন রাসবিহারীবাবু, আর নম্বর যা পাবে, নাকের বদলে নরুন পাওয়ার চেয়ে তা কিছু কম মর্মান্তিক হবে না। তাই ক্ষমা চেয়ে রাখা উচিত শমিতার কাছে, কারণ শমিতা তার জন্যে সত্যি সত্যিই ভাবে।

কিন্তু হর্ষর ভয়টা শেষপর্যন্ত বাস্তবে কার্যকরী হলো না, সত্যাগ্রহী দলটিকে পুলিশ ততটা অবহেলার চক্ষে দেখলো না, যতটা সে ভেবেছিল। দলের এক–

জনকে আগে থেকেই চিঠি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল থানায়, সে আর ফেরে নি। দলের বাকি সকলেরও নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে বারকতক শ্লোগান দেওয়া মাত্রই, এক যাত্রায় পৃথক ফল না পাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

পুলিশের গাড়িতে উঠে থানায় যাবার পথটুকু হর্ষ এই কথাটা ভেবেই অবাক হয়েছে আজকের স্বাধীন দেশেও গ্রেপ্তার হবার জন্য এর চেয়ে বেশী গুরুতর কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। একটু আগেও সে নিজের ইচ্ছেয় যেখানে খুশী যেতে পারতো, যা খুশী করতে পারতো, তার ভালোলাগা মন্দলাগার একটা মানে ছিল, মর্যাদা ছিল; কিন্তু এখন এই মুহূর্ত থেকে সে পরাধীন, নিজের উপরেও আর তার দাবী নেই। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হলো না কথাটা।

থানায় নিয়ে গিয়ে যখন প্রত্যেকের নাম ঠিকানা লেখা হলো, কেস লেখা হলো, সার্চের নাম করে সারা শরীর হাতড়ানো হলো, পকেটের পেন্সিল থেকে শুরু করে পাই পয়সা পর্যন্ত আলাদা আলাদা কাগজের মোড়কে জমা রাখা হলো, তখন হর্ষর বেশ মজাই লাগছিল। লালমোহনের পকেটে গোটা চারেক লবঙ্গ আর কয়েকখণ্ড সুপুরি ছিল তাও রেহাই পেল না। ইন্সপেক্টর গজেনের মতই সিরিয়াস হয়ে সব কিছু করে গেলেন, সমান গাম্ভীর্য নিয়ে, যেন বোমার মামলার আসামীদের হাতে পেয়েছেন।

হাজতে জায়গা হলো না অতগুলি ছেলের, চোর ছ্যাঁচোরে লক-আপ আগে থেকেই ঠাসাঠাসি ছিল। থানার অফিস ঘরেই তাদের বসবার জায়গা হলো। জন ত্রিশেক ছেলে কোন রকমে খান দুই চেয়ার আর একটা বড় টেবিলের ওপরে জায়গা করে নিল।

হর্ষর কোন চেতনা ছিল না দুঃখ বোধের, সে শুধু তন্ময় হয়ে দূরের টেবিলের সাবইন্সপেক্টর ভদ্রলোকের কাজ দেখছিল। এবং যতক্ষণে দলের সকলে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠেছিল অপরিচিত পরিবেশকে ভুলে থাকার জন্যে, তার ঢের আগেই সে নিজের কথা ভুলে গিয়ে ভাবছিল থানার চেয়ে অদ্ভুত জায়গা বোধ হয় আর নেই। মড়া কাটা ডাক্তার, অপারেশন টেবিলের সার্জেন কিংবা বদ্ধউন্মাদ, প্রত্যেকেই নির্মম রকম ভাবলেশহীন জীবনের কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কিন্তু পুলিশে যিনি চাকরি করেন, তিনি হার মানিয়েছেন সকলকেই।

সাবইন্সপেক্টর ভদ্রলোকের কথাই ভাবছিল হর্ষ। আঠাস উনত্রিশ বছর বয়স হবে ভদ্রলোকের, গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ, চুলে এবং চোখে বেশ কবি-কবি ভাব। সুশ্রী একজোড়া গোঁপের নিচে হাসির আভাস লেগে থাকে। ইউনিফর্ম ছাড়া সাদামাটা পোষাকে টেবিলে বসে বসে খাতা লিখছেন, আর দুষ্টু ছেলের কড়া নাড়ার মত ফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই বেজে উঠছে, সেটাকে

সামলাচ্ছেন। ফাঁকে ফাঁকে পাশের টেবিলের কালো, মোটা, বেঁটে, টাকগ্রস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসি তামাসা করছেন। দেখলেই মনে হবে ইনি ফুটফুটে হাসিখুশী কোন ছেলে কিংবা মেয়ের অবশ্যই দাদা মামা অথবা কাকা, যা হোক একটা কিছু। এবং কোন কলেজে যদি এক্ষুণি এঁকে অনিরুদ্ধদার মত পড়াতে দেখে তাহলে কিছুতেই মনে করতে পারবে না ইনি এখনো থানায় বসে পুলিশের কাজ করছেন বা কখনো করেছেন।

কিন্তু একটু পরেই যখন পাশের হাজত থেকে সদ্য ধরে আনা কোন কয়েদীকে তাঁর সামনে হাজির করবার জন্য হাঁকবেন, দরবাজা।

তখন তাঁর সেই বাজের মত গলা শুনে শুধু হর্ষর বুকের ভেতরটাই নয়, দরবাজা আখ্যাত দরজার পাশের প্রহরীটাও চমকে উঠে সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়াবে। স্বর এবং সুরের কি আকাশ পাতাল পরিবর্তন এক মুহূর্তে। অথচ লোকটা রেগে উঠবারও অবকাশও পান নি।

তারপরে যখন মরা ইঁদুরের মত থেঁতো রক্ত মাখা মুখ নিয়ে কোন আসামী হাজির হবে তাঁর টেবিলের সামনে এবং তিনি তাকে জেরা করে করে তথ্য উদ্ঘাটন করবেন, কেস-বুকে বিবৃতি লিখবেন, তখন হর্ষ অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বধির হতে চাইবে।

এক একটি ধমকে তিনি দমকা বাতাসের মত এগিয়ে যাবেন অনেকটা পথ, আর কলাপাতার মত হাঁটু দুমড়ে নুয়ে পরে কাঁপতে থাকবে লোকটি। প্রয়োজন হলে হাতও চলবে। মুখে চলবে কাঁচা হরফের গালাগাল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মত। এতেও না হলে কচাই আছে, মধ্যযুগীয় প্রথায় কথা আদায় হবে। সে দৃশ্য চোখের আড়ালে ঘটলেও গায়ে কাঁটা দেবে।

মানুষ যন্ত্রের মত হয়ে গেলে তার আত্মায় এবং অন্তরে এমনি ছন্দপতন ঘটে। তখন করুণা হয় সেই মানুষের জন্যে হর্ষর, যার অভিনয় ব্যর্থ হয়ে বাস্তব হয়ে উঠছে। যার দুটো সত্তার দ্বন্দ্ব ক্রমশ: অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

রাত প্রায় একটা পর্যন্ত ঐভাবে বসে থেকে থেকে যখন চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছে, সেই সময় জানা গেল, অন্য কোন এক থানায় তাদের জনা। হাজত খালি হয়েছে, বাকি রাত সেখানে উদযাপন করতে হবে।

এবার তাদের জন্য ঢাকা-গাড়ির বন্দোবস্ত হয়েছে।

শুয়ে শুয়ে এই হাসপাতাল থেকে ওয়ার্ড আর ইয়ার্ডে ভাগ ভাগ করা গোটা জেল-টাকে একটা বিরাট ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌ মনে হয়। জ্যামিতির আঁকাবাঁকা রেখা যেন আয়ত ক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র এঁকে চলে গেছে পাশার ছকের মতো, প্রাচীরের পরে প্রাচীর আছে দাঁড়িয়ে, চোখ যায় না তাদের ডিঙিয়ে, ভেতরে কোথায় কি হচ্ছে, কারা যাচ্ছে কারা আসছে জানবার উপায় নাই। শুধু তুমি জেলে ঢোকবার মুহূর্তে যেটুকু দেখে ফেলেছ অথবা এই শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো হাসপাতালে আসবার পথটুকুর মধ্যে জীবনযাত্রার যে রহস্যটুকু কয়েক টুকরো ছবির আকারে দেখা দিয়েছে সেইটুকুই তোমার কল্পনাকে সাহায্য করবে। রুগ্ন শরীরটাকে ভুলে থাকবার জন্যে তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমার বারো আনা সময় চোখের সামনের দৃশ্যকে দিয়ে চোখের বাইরের অদৃশ্যকে ধরবার চেষ্টা করবে। এতে তোমার লাভই হবে। হাসপাতালে আছি, এই কথাটাই যদি একটা মানুষের মনের মধ্যে দিবারাত্র জেগে থাকে তাহলে নীরোগ হওয়া দুষ্কর, তার ওপরে যদি জেল হাসপাতালে থাকার কথাটা ভুলতে না পারা যায়, বাঁধনের ওপরে আর একটা বাঁধন, একটা শরীরে আর একটা মনে, এমন দাগ কেটে বসবে যে তুমি আর উঠতেই পারবে না।

হর্ষ তাই ভাবে, গোটা জেলের চেহারাটা ঠিক কেমন আজগুবি দেখতে, ঠিক কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া, নাকি হাঁসের ডিমের মত গোল, কটা উঠোন আর কটা ইয়ার্ডের দরজা আছে মোটমাট, এই সব ভাবে। যে লোকটা আয়নায় কখনো নিজের চেহারা দেখে নি, সে যদি তার দীর্ঘ দিনের প্রিয় আর পরিচিত শরীরটা মুখ চোখ নাক সব মিলিয়ে ঠিক কেমন দেখতে তা ভাবতে চেষ্টা করে, তাহলে যেমন অবস্থা হয় হর্ষর দশাও খানিকটা সেই রকম।

প্রথমদিন জেল ফটকে যখন গাড়ি এসে পৌঁছে ছিল তখন রাত হয়েছে, চারপাশের অন্ধকার উঠেছে কালির দোয়াতের মতো জমাট বেঁধে। আশেপাশের বাড়িঘর কিছুই স্পষ্ট করে চেনা যায় নি। শুধু প্রেসিডেন্সী জেলটাকে মনে হয়েছে একটা দুর্গ, প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীরের ঘের টানা। বিদ্যুতের আলোয় আরো থমথমে। মাঝখানে লোহার একটা চাপা দরজা, ফোকর দিয়ে ভেতরের অফিসঘরটা দেখা যাচ্ছে, দেয়ালে সারি সারি লোহার হাতকড়ি, পায়ের বেড়ি, শেকল, টোকন, আগুন নেভানো মেশিন আরো কত

কি। বাইরে খাড়া পাহাড়ের মতো প্রাচীরটা যেখানে বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা সার্চলাইট বসানো।

বিশ্বাস হয়নি সত্যিই শেষ পর্যন্ত জেলে ঢুকতে যাচ্ছে তারা। তারা মানে গ্রুপ ইনচার্জ শচীনদাকে নিয়ে ত্রিশটা ছেলে। কাল বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে একটা বানানো গল্পের মতো মনে হয়েছে। স্বাভাবিক নয়, অথচ অসম্ভব কিছুও নয়। প্রিজন ভ্যানের কালো পেটের ভেতর থেকে এক এক করে বেরোতেই লোহার দরজাটা কচ্ছপের মুখের মতো একবার খুলেই আবার তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। তারা ভেতরে অফিস ঘরে এসে দাঁড়ালো। হর্ষ মেঝের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, ট্রামের লাইনের মতো এক জোড়া লাইন সদর ফটকের তলা দিয়ে ঢুকে অফিস ঘরের পাশের প্যাসেজটা দিয়ে ভেতরে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।

সেরাত্রে আর কিছুই ঠাহর হয় নি ভালো করে। নিজেদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থেকেই কেটে গেছে সময়। অফিসের কালো মোটা খাতাটার পিছনে বেঁটে রোগা একটি লোক কলম হাতে বকের মতো বসে ছিল, সে ইঙ্গিত করতেই দুজন জমাদার এগিয়ে এসে তাদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে সার্চ করলো। সার্চ শেষ হলে প্রকাণ্ড দাঁড়ি পাল্লায় তুলে তুলে প্রত্যেকের ওজন নেওয়া হলো। যতদূর মনে পড়ে, জেলার ভদ্রলোক তাঁর মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নিচে নেমে এলেন তক্ষুনি। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করলো সমস্ত, সশস্ত্র দুজন কনেষ্টবল পাথরের মূর্তির মতো আগাগোড়া দাঁড়িয়ে থাকলো অফিস ঘরের সামনের প্যাসেজটার ওপরে।

নাম, বাবার নাম, ঠিকানা সমস্ত খাতায় উঠলো এবং প্রত্যেকের নামে রেশন কার্ডের মতো একখানা করে কার্ড তৈরি হয়ে গেল, তাতে বয়স, ওজন, তারিখ ইত্যাদি লেখা। তারপরে ভেতরে একটা বটগাছ তলায় দাঁড় করিয়ে গুদাম-ঘর থেকে কম্বল আর অ্যালুমিনিয়মের থালা বাটি মগ দেওয়া হলো। সে রাত্রির কথা তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে মনে নেই। দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে, অনেকগুলি প্রহরী জাগা দরজা পার হয়ে সে রাতটা অস্থায়ীভাবে একটা নিম্ন শ্রেণীর কয়েদীদের ঘরে আশ্রয় পেল। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো তারের জালে ঘেরা খাঁচা, তার মধ্যে আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে মানুষ শুয়ে আছে সারি সারি। দেখে তো হর্ষর চক্ষু চড়কগাছ, এ কোন চিড়িয়াখানায় এলো তারা। সেরাত্রে অনাহারে থাকতে হলো বলাই বাহুল্য।

তারপর দিন ভোর বেলায় পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে তাদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া হলো। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হল ঘর, তারের খাঁচা টাচা কিছু নেই, বেশ ভদ্র জায়গা। রাজবন্দীদের সাধারণত এখানে রাখা হয়।

কিন্তু রাজবন্দীদের মতো রাখা হলোনা তাদের। একটা হল ঘর খুলে দেওয়া হলো বটে কিন্তু সেই মাথা পিছু দুখানা করে কম্বলের বেশি আর একখানাও জুটলো না। সেই দুর্জয় শীতে সোয়েটার কোট পরে না শুলে ঠকঠক করে কাঁপতে হয়। জলের ব্যবস্থাটা সব চেয়ে বেশি পীড়া দিল মনকে। জলের প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল তাদের-কে মানুষ বলে গণ্য করা হয় নি। একটা হাত দেড়েক চওড়া ও একফুট পরিমাণ গভীর সিমেণ্টের নালা প্রত্যেক ইয়ার্ডের উঠোনের মাঝখান দিয়ে সারা জেল কম্পাউণ্ডটা ঘুরে গেছে। দুপাশ ঢালু. ওপরে কোন আবরণ নেই। সকালে বিকেলে তাতে পাম্প করে জল ছাড়া হয়ে থাকে, সেই জল তর তর করে বয়ে যায় একটা ছোট নদীর মতো। সেই জলই তোমার সারাদিনের তিনপ্রস্থ কাজে লাগবে। ভাবতেও গা গুলিয়ে আসে।

সকালবেলা দুমুঠো লাল লাল মোটা চালের মুড়ি আর এক টুকরো ভেলি গুড়। দুপুরে পচা আধ পচা কড়াইশুটি সিদ্ধ, কড়কড়ে আধ পেটা ভাত, একটা শেকড়বাকর সুদ্ধু অদ্ভুত তরকারী, যার কোন স্বাদ আবিষ্কার করতে পারে নি হর্ষ, খোসা সমেত তিনভাগ জল কড়াইয়ের ডাল এবং সব শেষে বাসন মাজা তেঁতুলের একটুখানি গোলা। বিকেল ছটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে সেলের মধ্যে ঢুকতে হবে, উঠোনটার মেয়াদ দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

দিনে রাতে মোট তিনবার ছাগল ভেড়ার মত জোড় বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুণতি করবে। একটু কম বেশি হলেই লোক চলে আসবে ফের গুণতে। রাতে দুজন অন্তত: লোক থাকবে তাদের সঙ্গে। মাঝরাতে জমাদার উঠোনে এসে হাঁকবে, রাতের শেয়ালের মতো।

'মেট' দুজন তাদের তন্দ্রা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে চেঁচাবে, সব ঠিক হ্যায়!

শচীনদা বললেন, অসম্ভব এভাবে দিনের পর দিন থাকা, অসুখ করে যাবে সবার আর দু একদিন এই খাবার খেলে। তাছাড়া পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসেবে আমাদের যতটুকু সম্মান এবং স্বাধীনতা প্রাপ্য, তা আদায় করে না নিলে অন্যায় হবে।

—আমাদের যেহেতু এখনো বিচার হয়ে যায় নি সেহেতু, দলের একজন শচীনদার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে বললেন, 'সি-ক্লাস' কয়েদীদের খাবার এবং থাকার বরাদ্দ আমাদের ওপরে ওরা চাপাতেই পারে না। আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনার হিসেবে আমাদের পিটিশান করতেই হবে।

কিন্তু পিটিশান করে কোন ফল হলো না, জেলর এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসিমুখে জেল পরিদর্শন করতে এসে তাদের অভিযোগ স্বকর্ণে শুনে বিনীত ভাবে প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে গেছেন কিন্তু তিনদিনেও অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। নতুনত্বের মধ্যে তৃতীয় দিনে মাথায় মাখবার জন্যে ছোট একবাটি

তেল পাওয়া গিয়েছিল যা সমান ভাগে ভাগ করে নিলে মাথা পিছু ফোঁটা চার পাচের বেশি দাঁড়ায় না। সবাই সেদিন সেই সরষের তেলটুকু ঠোঁটে আর মুখে মেখেছিল মনে আছে।

সেইদিনই বিকেল বেলা ছোট একটা বৈঠকে স্থির হয়ে গেল হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করা হবে, নইলে অনুনয় বিনয়ে কাজ হবে না। হর্ষ আর লালমোহন দলের মধ্যে সব চেয়ে ছোট, অতএব শচীনদার ইচ্ছে তারা অনশনের বাইরে থাকে। কিন্তু রামদার আপত্তি যেমন টেকেনি, শচীনদাকেও শেষ পর্যন্ত তেমনি রাজী হতে হলো। তিনি দু:খিত ভাবে মত দিলেন, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানেন শেষ পর্যন্ত ওরা অনশন ভঙ্গ করে বসবেই। হর্ষর নিজের মনেও সেই ভয় ছিল, মুখে যাই বলুক। বাড়িতে কতদিন মার ওপরে রাগ করে ভেবেছে ভাত খাবে না, কিন্তু একবেলাও থাকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। তবে সে ছোট বেলার কথা, জেলের প্রথম রাতটা তো না খেয়েই কেটে গেছে দিব্যি।

পরদিন ভোরবেলা থেকে অনশন শুরু হলো, সারি সারি যে যার বিছানায় বসে। বেশি কথা কওয়া একদম বারণ। শচীনদা লুকিয়ে লুকিয়ে নুন যোগাড় করেছিলেন কোথা থেকে, পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল হীরালাল সিংয়ের নাম। জেলের সেপাই সে, প্রতিদিন সকালে তাদের ইয়ার্ডের উঠোনের এককোণে তেলকুচকুচে শরীরে আড়াইশো করে ডন ফেলে।

বিকেলের দিক থেকে শচীনদা, যাদের গা বমি বমি করতে শুরু করলো, অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে করে নুনজল খাওয়াতে লাগলেন। হর্ষর কিছু হয়নি তখনো, শুধু পেটের ভেতরটা জ্বালা করে উঠেছে থেকে থেকে, গুড়গুড় শব্দ হয়েছে মাঝে মাঝে। সন্ধ্যে বেলায় জেলের ডাক্তার এসে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করে বিফল হয়ে শেষে শাসিয়ে গেলেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে নাকের ভেতরে নল দিয়ে খাওয়াবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যে ব্যবস্থা ছিল। কথাটা শুনে বুকটা কেঁপে উঠলেও ভরসা হারালো না কেউ। অনশন অক্ষুণ্ণ থাকলো।

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা শচীনদাকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলে। যাবার আগে সকলকে তিনি বলে গেলেন, দেখো মুখ রক্ষা করো। বাজে কথায় কান না দিয়ে শেষ পর্যন্ত যুঝে যাওয়া চাই।

সবাই চোখ বুজে পড়ে রইল যে যার বিছানায়, উনত্রিশটা ছেলে অথচ একটি কথা নেই। মনে মনে আশ্চর্য যোগ, নইলে একা কেউ পারতো না এভাবে চালিয়ে যেতে, অন্তত: হর্ষ তো নয়ই।

হর্ষর মনে হলো, প্রথম দিন আর দ্বিতীয় দিনের অর্ধেকটাই সবচেয়ে কষ্টকর। সেইটুকু পেরিয়ে যেতেই আর যেন ক্ষিদে থাকলো না। শুধু কেমন যেন একটা আচ্ছন্নভাব, একটা তন্দ্রার আবেশ। শরীরটা ঘুড়ির মত হাল্কা

হয়ে গেছে, মাথার ভেতরটা কেমন যেন। মাকে মনে পড়ছে, বাড়ির কথা স্মরণ হচ্ছে একটু একটু। ভয় হচ্ছে সে আর বাঁচবে না, তাদের দাবী মেনে নেবার আগেই, অনশন শেষ হবার আগেই, সে মরে যাবে। রক্তের শব্দ শুনতে পাচ্ছে যেন বুকের ভেতর।

জেল কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডালড়াই শুরু করে দিয়েছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টিনের ট্রে ভর্তি পাতলা চিঁড়ে আর আখের গুড় রেখে যাওয়া হয়েছে সকাল থেকেই. যে প্রহরী ছিল তাদের সেলের মধ্যে সেও সরে গেছে। কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে পারো খাও। তোমার নাগালের মধ্যে খাবার রয়েছে, তুমি কেন এত কষ্ট করবে। কিন্তু ভুল, মস্ত ভুল এমন ভাবা। কেউ দেখুক আর না দেখুক, ওই লোভনীয় আহার্যের এককণা যদি তুমি গ্রহণ করেছ তাহলেই তুমি গেছ। তোমার মানসিক সততা একবার যদি একটুও স্খলিত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার শক্তি যাবে, সাহস যাবে, সহ্য করার ক্ষমতা নষ্ট হবে। তুমি তখন আর একমুহূর্তও থাকতে পারবে না।

বিকেলের দিক থেকে ওজন নেওয়া আরম্ভ হলো। দুজন ডাক্তার এবং জমাদার এসে উপস্থিত হলো ঘড়ির মত একটা যন্ত্র নিয়ে। তাতে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওজন দিতে হলো প্রত্যেককে। আর ঠিক তখনই, ঘড়ির মত যন্ত্রটার ওপরে দাঁড়াতে গিয়েই চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে গেল হর্ষ।

তারপরে কি কি ঘটেছে মনে নেই। জ্ঞান ফিরেছে যখন তখন দেখেছে এই হাসপাতালে শুয়ে আছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে অনশনের কথা, আর অমনি দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়েছে। ডাক্তার নার্স সবাই হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন, একটু ফলের রস পর্যন্ত গেলাতে পারেন নি তাকে। তারপরে খবর এলো, দাবী মেনে নেওয়ায় অনশন মিটে গেছে।

হর্ষ শুধু ক্ষীণ গলায় জানিয়েছিল সে বিশ্বাস করে না। শেষে শচীনদাকে আসতে হল কথাটাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে। সেবার অবশ্য হাসপাতালটাকে ভালো করে লক্ষ্যই করতে পারে নি, পরদিন সকালেই ফিরে গেছে তাদের ওয়ার্ডে।

পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে হর্ষর। জেলের মাঠে খেলতে গিয়ে কি করে গোড়ালী পেকে উঠে পুরু চামড়ার তলায় পুঁজ জমেছে। কাটাতে হবে।

নিজের বেডে শুয়ে শুয়ে জেলের চেহারাটা আবার ভাবতে চেষ্টা করলো। প্রথমে জেল ফটক, দোতলায় জেলরের কোয়ার্টার, নিচতলায় অফিসঘর, গোডাউন, ইণ্টারভিউ রুম। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে এসো, একটা বট গাছ দাঁড়িয়ে আছে পিছনে একটা ডোবার সগোত্র পুকুর নিয়ে। পুকুরের ওপারেই মাঠ, ঘাসে ঢাকা একখণ্ড জমি। সকালে হর্ষদের দল কুয়াশার ঘোর

না কাটতেই সেখানে নেমে পড়ে পি, টি, করতে। রোদ উঠলে নানা রকম খেলাধুলো শুরু করে। দুপুরে নির্জন মাঠটা খাঁ খাঁ করে। বিকেলে নেট টাঙিয়ে ভলিবল খেলে অন্যান্য রাজবন্দী আর সিকিউরিটি প্রিজনাররা।

মাঠটাকে তিনদিকে অঙ্কের থার্ড ব্র্যাকেটের মত ঘিরে রেখেছে প্রধান জেল বিল্ডিংটা। প্রকাণ্ড আর বিরাট পরিসরের একটানা এই দোতলা বাড়িটার সারি সারি জানালা গুলো মাঠের দিকে খোলা। রাত্রে মনে হয় একটা আলোর সাঁড়াশি অন্ধকার মাঠটাকে চেপে ধরেছে।

জেল বিল্ডিংটার ঠিক মাঝের অংশের মাঝ বরাবর, যেখানে একটা বড়ো দরজা আছে মাঠে ঢোকবার জন্যে, সেই ফটক সোজা ছাতের ওপর জেলের ঘড়ি-ঘর। ওই নামেই 'ঘড়িঘর', আসলে একটা পেটা ঘণ্টা ছাড়া ঘড়িও নেই, ঘরও না। রাতদিন সেখানে একজন করে ঘড়িয়াল প্রহরী থাকে, যে নিয়মিত প্রহর ঘোষণা করে অফিস ঘরের বেল্ বাজা শুনে। প্রয়োজন হলে পাগলা ঘণ্টা বাজানোর দায়িত্বও তার।

ফুলের গন্ধ আসচে হাসপাতালের সামনের লনটা থেকে। রাত হলো। উইমেন্স ওয়ার্ড থেকে মেয়েদের গলা একটু একটু ভেসে আসচে যেন। ওখানে কথা বলায় বাধা কি, প্রহরী থেকে কয়েদী সব মেয়ে, পুরুষের ছায়াও পড়ে না ধার ঘেঁষে। অদ্ভুত লাগে হর্ষর, মেয়েদের চোর ভাবতে, খুনী ভাবতে, পকেট-মার ভাবতে। কেমন তাদের চেহারা না জানি। কিন্তু তারা তো মেয়ে! ভাবতে খুব খারাপ লাগে কথাটা।

হীরালাল সিংয়ের গলা শোনা যায়। নার্স ভদ্রলোক দুজন উসখুস করে ওঠেন। তাঁরাও কয়েদী, কিন্তু ভদ্রলোক, কোন অফিসের কেরাণী ছিলেন যেন। চঞ্চল হয়ে ওঠেন তাঁরা, হীরালাল সিং এসেছে। হাসপাতালের ডাক্তার এখন তাঁর ঘরে। নেশার যোগাড় হতে পারে এইবার।

হীরালাল সিংয়ের ইতিহাস শোনবার মত। একদিন আসামী আমেদের সঙ্গে গল্প করছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে ফেলেছে হর্ষ। বড়বাজারে গাঁজার চোরাই ব্যবসা ছিল হীরালালের। হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে সে সময়। মোষের খাটালও ছিল কোথায় যেন। পনের বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসে রুটির খোঁজে, দেশ পূর্ণিয়া জেলায়। এখন বয়স হলো ষাট। এই সাড়ে ছ-ফুট টকটকে পাকা বাঁশের মত শরীরটায় এখনো বুনো ভঁইসের মত তেজ।

ধরা পড়লো নিজের দলের বেইমানীতে, সমস্ত টাকা লুটপাট হয়ে গেল দলেরই লোকের মধ্যে। তলে তলে এতদূর এগিয়েছে কল্পনা করতে পারে নি হীরালাল। যখন টের পেল একটা আঙুল তোলবারও সময় পেলো না। আচ্ছা, একশো বছরের আগে সে মরছে না, এক একটা করে খুঁজে বার করবেই।

দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদী হয়েই ঢুকেছিল প্রথম। স্বাস্থ্য এবং স্বভাবের গুণেই এখন সে সেপাই। শুধু জেলের পোশাক পরতেই হয়। এই একটা দু:খই হীরালালের মনের মধ্যে আঁচড় কাটে এখনো।

জেলের কয়েদীদের মধ্যে যে কোন রকম নেশার জিনিসই নিষিদ্ধ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে একটা বিড়ি কিংবা সিগারেটের জন্যে এরা সারা জীবন গোলাম হয়ে থাকতে পারে, আবার গলাও টিপে ধরতে পারে। হীরালাল লোকটা যাই হোক পরোপকারী বটে। যাদের সে ভালো বেসেছে, নেশার জন্যে তাদের ভাবনা নেই। বিড়ি চাও বিড়ি, সিগারেট চাও সিগারেট, আর যদি আসল চাও, তাও পাবে, তবে সেটা আনানো একটু কঠিন, নিয়মিত হয় না।

হাতের প্রকাণ্ড মাদুলিটার মুখ খুললেই সপ্তাহে কোন একদিন হয়ত আসল বেরোয়, কিন্তু খাবে কি করে? আমেদ হাসে মিটি মিটি, দোস্ত, মাটি দিয়ে আমি পুতুল বানাই।

এমন অদ্ভুত পুতুল হর্ষ দেখে নি, যা গাঁজার কলকে হয়ে ওঠে রাত্তির বেলায়। কাঠের ঘোড়া জল খেত রূপকথার রাত্রে, এ মাটির পুতুল, ধোঁয়া খায়।

কিন্তু সাবধানে, খুব সাবধানে। ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। আমেদ খুব বেশী দিন আসতে পারেনি, কিন্তু যে কদিন এসেছে বাতাসের মতই সাবধানে এসেছে।

জেলের নাপিত ইন্দর ব্যাটা মহা পাজী। জেলের বাইরেও নাপিত ছিল, এখানে এসেও নাপিতগিরি করছে। বানিয়ে বানিয়ে গাঁজাখুরী গল্প বলবে আর নিজের মিথ্যা কথায় খুশী হয়ে নিজে হাসবে, খ্যাঁ, খ্যাঁ করে ভাঙা ভাঙা গলায়। ভুরুর মোটা মোটা লোমগুলো শিয়ালকাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠবে হাসবার সঙ্গে সঙ্গে।

তবু ইন্দর আসলেই গল্পের আসর জমে ওঠে সব চাইতে বেশী।

একদিন এই দলের মধ্যে একটা চেনা মুখ হঠাৎ নজরে পড়তেই হর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাদের পাড়ার ক্লাবে এই লোকটা তবলা চাঁটাতে আসতো মাঝে মাঝে, খুব ভালো করেই চেনে হর্ষ। যদিও কোনদিন কথা বলেনি, তবু হর্ষও লোকটির অচেনা নয়।

আজ এই লোকটিকেই কত ভালো লাগলো দেখে। দূর বিদেশে বাঙালী-মুখ দেখলে যেমন হয়। কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাট থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল হর্ষ। চন্দর চমকে উঠলো ওকে দেখে, তুমি কে বাওয়া সোনার চাঁদ? আড়ি পাততে আইস্‌ছ

—এই মাত্ত বোলো। ও খোঁকাবাবু আছে!

হীরালাল সিং ধমকে দিল চন্দরকে, হর্ষকে সে বিলক্ষণ চেনে। ভালোও বাসে। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিদিন দেখা হতো সকাল বেলায়।

—নাড়ুদা!

হর্ষর ডাক শুনে লোকটি চমকে তাকালো।

—নাড়ুদা আপনি?

—ছি ভাই!—নাড়ুদা মুখ ঘুরিয়ে নিল। কয়েদীর পোশাক পরা নাড়ুদার হঠাৎ কি অভিমান হল বোঝা গেল না।

প্রায় সিকি মিনিট পরে আবার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নাড়ুদা বললো, ছিঃ। লেখাপড়া ছেড়ে শেষে এই পথ ধরলে গো!

ভয়ানক হাসি পেল হর্ষর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার নিজের বেডে ফিরে গেল সে।

তারপর রাত বাড়বে। গুমটির সিপাহী মেহের আলীর মত জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে যাবে এক এক দিকে মুখ করে। বোল-ও-ও। গিণ্‌তী মেলানো শেষ হবে। নাইট ডিউটির সিপাহীরা নিজের নিজের ওয়ার্ডের দরজায় এসে চার্জ বুঝে নেবে। অনেকগুলি জুতোর বর্বর শব্দ মিলিয়ে যাবে দূরে। চাপা হাসি, কথাবার্তা, খৈনি পেটার আওয়াজ কানে আসবে। লোহার লক-আপ ঝন্ ঝন্ করে উঠবে কুস্তী লড়া হাতের নাড়া খেয়ে। এই উঠো! তিন নম্বর!

তারপর ডাক্তার আসবেন হাসপাতালে নাইট ডিউটি দিতে। কম্পাউণ্ডার ব্যাজার মুখে সাধের তন্দ্রাকে প্রত্যাখ্যান করে উঠে পড়বেন। আবার থিতিয়ে আসবে তিমির-তরঙ্গ। পাগড়ি খুলে টুলের ওপর বসে সিপাহী মৌজ করবে। গাছ-ঘড়ি পেঁচাটা পেয়ারার নির্দিষ্ট ডালে কর্কশ চিৎকার করে থেমে যাবে প্রহর ঘোষণা করে। তারায় জলজল করছে আকাশ। হর্ষর হয়ত তখনও ঘুম আসবে না।

সেল অবশ্য নয়, আপার ডিভিশন ওয়ার্ড। সাদা বাংলায় যাকে বলে রাজবন্দী ফাটক। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে হর্ষর আরো ভালো করে পরিচয় হলো যেন এই বাড়িটার সঙ্গে। ডিভিশন সি-র গঞ্জামো নেই, যাদের আর—আই হয় তারাও এখানে থাকে না সম্ভবত। শুধু আণ্ডার ট্রায়ালদের অস্থায়ী আশ্রয়, আর কিছু সিকিউরিটি প্রিজনার।

সোরগোল এমনিতেই এদিকটায় খুব কম। প্রতি ওয়ার্ডে ওপরে নিচে মিলিয়ে হল ঘরের সংখ্যা তিন থেকে চার। এক হলঘর থেকে অন্য হলঘরে যাবার পথ বা বাধা একটি করে লোহার দরজা। সচরাচর বন্ধ থাকাই রীতি। হর্ষদের বেলায় খুলে দেওয়া হয়েছে ভদ্রতা করে। জেলর সাহেব লোক চড়ানো

ব্যবসা করেন, মানুষের চরিত্র নিয়েই তাঁর কারবার। এদের মোটিভটা বুঝে নিয়েছেন কয়েকদিনের মধ্যেই। তালা খুলে রাখলেও এরা পালাতে চেষ্টা করবে না, উল্টে এরা থাকতেই চায়। এরা চায় না যে খামকা এদের ছেড়ে দেওয়া হোক। তাছাড়া অধিকাংশই ছাত্র, স্কুল কলেজ থেকে সটান চলে এসেছে। কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল, কেউ বা মেডিক্যালের ছাত্র। সুতরাং এদের একসঙ্গে থাকতে দিতে এবং সকাল বেলায় বিনা পাহারায় মাঠে যেতে দিতে তিনি আপত্তির কিছু খুঁজে পান নি।

ভেতরের দরজাগুলি খুলে দেওয়ায় ওপরে পরপর চারটি হল ঘর লম্বালম্বি জোড়া লেগে স্কুলের স্পোর্টসের মাঠের মত বড়ো মনে হয়। তারা আসলে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে থাকলেও দুপাশের ওয়ার্ডেরই ওপর তলার একখানা করে হলঘর তাদের ব্যবহারে এসেছে। সিপাহী ওপরের হল ঘরগুলোর মাঝখানকার জংধরা দরজা টেনে টেনে খুলবার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হর্ষ ও লালমোহনকে বলেছিল গত আগস্ট আন্দোলনের পর থেকে নাকি এগুলো আর খোলাই হয় নি। দরকারই বা কি। আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বন্দী আর কতই বা আসেন। পাঁচ দশ পঁচিশজন এসে থাকেন কোন কোন সময়।

টানা হলঘরের মাঝখান দিয়ে সারি সারি থাম, দুপাশে ঈষৎ ঢালু হয়ে চওড়া মেঝে। থাম শিয়রি হয়ে সারি সারি বিছানা পড়ে, পায়ের দিকে থাকে প্রমাণ সাইজের জানালাগুলো। আবছা ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে তাকালে, যখন কোথায় শুয়ে আছে বিন্দু বিসর্গ মনে পড়ে না, জানালা গুলিকে মনে হয় আয়না বুঝি।

সাড়ে চারশ ছেলের জীবন এমনিভাবে গড়িয়ে চলেছে। সকালে পি,টি, দুপুরে লেকচার ক্লাস। লেকচার ক্লাস শেষ হতে না হতে ইণ্টারভিউ লিস্ট এসে যায়। তালিকাটা প্রত্যেক গ্রুপ ইনচার্জ একবার করে তাঁর গ্রুপের সামনে চেঁচিয়ে পড়েন। যাদের নাম থাকে তারা তৎক্ষণাৎ ছুটি পায়। নিচে নেমে গিয়ে বিকেলের জল খাবার পেয়ে যায় তাদের ওয়ার্ডের কিচেন থেকে। গরম দুধ আর সিদ্ধ ডিম। খেয়েই ছোটে জমাদারের পিছু পিছু, অন্ততঃ গোটা তিনেক দরজা পেরিয়ে তবে পৌঁছুতে হয় অফিস ঘরের সামনে। তিনটে থেকে পাঁচটা ইণ্টারভিউয়ের সময়। বাড়ি থেকে এসে অভিভাবক আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব যাঁরা দরখাস্ত করে অপেক্ষা করে আছেন এতক্ষণ, এইবার তাঁরা অফিস ঘরের ভেতরে দুজন চারজন করে ঢুকবার অনুমতি পাবেন। দুটি জানালার জালের ওপিঠে তাঁরা, এপিঠে তারা, কথাবার্তা হবে। কিছু দেবার হলে অফিস ঘরে নাম লিখিয়ে জমা দিতে হবে। পরীক্ষার পর সেগুলি প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইণ্টারভিউ রুম একটা অবশ্য আছে, কিন্তু সেটি আর, আই—কয়েদীদের জন্য। সেখানে আগন্তুক এবং বন্দীদের

মধ্যে ব্যবধান থাকে একহাত দূরত্বের পর পর দুটি লোহার জালের। এখানে তবু আঙুল গলিয়ে পরস্পরকে ছোঁয়া যায়, ওখানে একেবারে অস্পৃশ্য ব্যবস্থা।

এর আগের দিন হর্ষর মা দেখা করতে এসেছিলেন, কান্নাকাটি করে ফিরে গেছেন। আজ ইণ্টারভিউ লিস্টে হর্ষর নাম ছিল না। লালমোহন চলে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল, শচীনদার কথা একবিন্দুও আর কানে গেল না। চুপ করে কি সব ভাবছিল। রোজকার মত ফালতুটা এসে জানালার গরাদে গুলোর ওপর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বেহালার ছড় টানার মত টান মারলো, ঘট ঘট ঘটাং! হর্ষর চমক ভাঙলো।

সাড়ে তিনটে বাজে, লেকচার ক্লাস শেষ হলো, জলখাবারের ঘণ্টা পড়লো। ছেলেরা হুড়মড় করে অ্যালুমিনিয়মের মগ নিয়ে নিচে ছুটলো। হর্ষ গেল না, জানালায় গিয়ে বসলো। মাঠে তখন পাশের ওয়ার্ডের কম্যুনিস্ট পার্টির বন্দী কজন নেট টাঙিয়ে ভলিবল খেলবার আয়োজন করছেন। দুজন সদ্য আগত সিকিউরিটি প্রিজনার কোরা ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরে তাদের সঙ্গে খেলতে নেমেছেন। দুজনই বেশ বয়স্ক। দেহের কাঠামোটি দেখলেই বোঝা যায় প্রৌঢ় বয়সে এই তাঁদের প্রথম খেলতে নামা।

বটগাছের ডগায় শীতের সোনালী রোদ তখন একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। কতদিন এমনি ভাবে মিলিয়ে গেছে। অ্যালুমিনিয়মের থালাবাটির গায়ে কত অজ্ঞাত কয়েদীর খোদাই করা শিল্পকাজ এবং নাম পড়তে পড়তে হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেছে চারপাশ। শীতের আকাশ যেন একটা হাই তুলে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়ে দিয়েছে।

আজ বার বার বাড়ির কথা মনে পড়ছে হর্ষর। শমিতার কথা, মন্দিরার কথা, নতুনবৌদির কথা। মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই লক্ষ্মী পুজোর যোগাড় করে পুজোয় বসে গেছেন। কে জানে আজ হয়ত বৃহস্পতিবার। পটের লক্ষ্মী মালা গলায় দিয়ে, সিঁদুরের টিপ কপালে পরে, ধূপের সুগন্ধ ধোঁয়ার মধ্যে আবছা হয়ে বসে আছেন। বাঁদিকে পিলসুজে জ্বলছে সর্ষের তেলের প্রদীপ। মন্দিরা বসে আছে কাছে। তারপর ধীরে ধীরে পুজো শেষ করে মা কিসের যেন পাঁচালী পড়তে সুরু করবেন, যার একটা জায়গায় সেই অদ্ভুত লাইন দুটো আছে—

ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষি বাসা করে॥

নিতান্ত পয়ার ছন্দ কিন্তু ওই প্রথম লাইনটা পড়তে গিয়ে আজ মার গলাটা কেঁপে যাবে নিশ্চয়। কারণ হর্ষ বাড়ি থাকলে ওই লাইনটি শোনা মাত্র হেসে উঠতো, মা এর জন্যে কতদিন বকেছেন।

একটা দুঃস্বপ দেখে হর্ষর ঘুমটা ভেঙে গেল। কোন এক দুর্গম পাহাড়ে বেড়াতে গেছে সে আর গজেন। পাহাড়ে উঠতে উঠতে খেয়াল নেই কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হঠাৎ বাঘের ডাক শুনে হুঁস হলো। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। চারপাশে কালি গোলা অন্ধকার। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না।

ভয়ে ভয়ে ও-ই প্রথম কথা বললো, গজেন, এখন উপায়?

কিন্তু কোথায় গজেন আর কোথায় কে। অন্য একজন কে আস্তে করে তার হাতটা চেপে ধরে কানে কানে বললো, মেধনা, ভয় কি, আমি আছি। আমি তোমাকে পথ দেখাবো।

বিস্ময়ে আনন্দে হর্ষ তার নাম ধরে চিৎকার করতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখে তার সামনে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। তারপরেই পাহাড় বন কাঁপিয়ে সেই গর্জন। হর্ষর ঘুমটা তার প্রতিধ্বনিতে ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসেও বার দুই বাঘের ডাক শুনলো সে। মনে পড়লো একটু দূরেই আলিপুরের চিড়িয়াখানা, বাঘের ডাক সেখান থেকেই আসছে।

হলের আলো গুলো সমানে জ্বলছে। সারারাত এমনি জ্বলে, দিনেও কোন কোন দিন। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে এত বিশ্রী লাগে যে বলবার কথা নয়। একটু অন্ধকারও যে সময় সময় কত দামী হয়ে ওঠে, রাত্রে যে অন্ধকারে ঘুমোতে পায় নি সেই বোঝে।

হর্ষ আস্তে আস্তে উঠে পাশের হলে উঁকি মারলো। মলয়দা আর সমীরদা জানালার কপাট দুটো একটুখানি ফাঁক করে বসে নিচু স্বরে গল্প করছেন। একটু দূরে নীল টুপি খুলে রেখে পাহারা দুজন মেঝেয়, সিন্দুকের ডালার মত নিচে যাবার দরজাটার ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সেপাই নিচের দিক থেকে তালা দিয়ে গিয়েছে।

হর্ষ এগিয়ে গেল, কি সমীরদা, আজ আপনাদের ডিউটি নাকি?

—হ্যাঁ, এই বারোটা থেকে শুরু হয়েছে—তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ যে?

—ঘুম পাচ্ছে না, তাই।

মলয়দা তাড়াতাড়ি বললেন, বসবে নাকি? কম্বলখানা তবে নিয়ে এসে গায়ে জড়িয়ে বসো। জানালার ধারে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

হর্ষ ইতস্তত: করে বললো, না:, শুতেই যাই। আবার তো ভোর পাঁচটায় পি. টি।

সে পিছন ফিরতেই সমীরদা বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করগে। বাড়ির কথা ভাবনা চিন্তা করো না।

মুচকি হাসলো হর্ষ। তারপর যাবার পথে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে পাহারা দুজনকে দেখে নিল। মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। একজনের নাক ডাকছে

ভাঙা গলার ঘর ঘর শব্দের মত। শেষের অংশটুকু দুঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে—ফুর্-র্-র্। ও নিশ্চয়ই বনমালী। বনমালীর সত্যিই এলেম আছে। রোদ পোহানো কুমিরের মত হতচেতন পড়ে পড়ে এই ঘুমোচ্ছে তো সেই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু যেই ওয়ার্ডের উঠোনে রাত একটার ফ্লাইং গার্ড উর্ধ্বমুখী হয়ে হাঁক ছাড়বে অমনি বনমালী পাশ ফিরে শুতে শুতে নামতার মত কি সব জড়িয়ে জড়িয়ে বলে গিয়ে শেষে স্পষ্ট করে ব্রেক কষবে উঁচু গলায়—সব ঠিক হ্যায়।

এবং তারপরের মুহূর্ত থেকেই আবার···

বনমালীর সঙ্গে হর্ষ বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিল কিছুদিন যাবৎ। চমৎকার গল্প বলিয়ে লোকটা। বাইরে কোন দোকানের নাকি সেলস্‌ম্যান ছিল। ক্যাশ ভাঙার অজুহাতে মালিক ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কথাবার্তা শুনে কিন্তু দুটোর কোনটাই বিশ্বাস হয় না।

হর্ষরা কাগজে কলমে তখন এ-ক্লাস প্রিজনার। পুরোপুরি সুবিধে এবং প্রাপ্য জিনিসপত্র অবশ্য সম্পূর্ণ তাদের হাতে এসে পৌছায় না। সেটা অবশ্য নানা কারণে। প্রথমত: তাদের সংখ্যাধিক্য। দ্বিতীয়ত: হরিদাসদার বিচার বিবেচনা। যেমন খাট বিছানার কথাই ধরা যাক। প্রত্যেক বন্দী একটি করে লোহার খাট আর লেপ তোশক বালিশ পাবে, পাশবালিশ অবধি। জেলর সাহেবের দোষ নেই, প্রথমে একশো খাটবিছানা পাঠিয়েছিলেন, বাকিটা বলেছিলেন কয়েকদিনের মধ্যে যোগাড় করে দেবেন।

হরিদাসদা ছেলেদের ডেকে বললেন, সে হবে না। জেলে আমরা আরাম খেতে আসিনি। অন্যান্য জেলের কথা ভাবো। সেখানে আমাদের অন্য বন্ধুরা খুব কিছু আরামে নেই। বিশেষ তো দমদম সেণ্ট্রাল জেলে।

খাট আবার ফিরে গেল যথাস্থানে, শুধু খান সাতেক রয়ে গেল ফাস্ট এড্ এ্যাণ্ড হসপিট্যাল-এর জন্য। মেডিক্যালের ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায় খুলে ছিল এই বিভাগটা।

হরিদাসদা আদর্শবাদী হলেও কাজের লোক। বুঝেছিলেন বিছানাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো শত্রু। মনের মধ্যে আরাম ঢোকাবার ওর চেয়ে শর্ট-কাট রাস্তা আর নেই।

তবে খাওয়া দাওয়ায় পুষিয়ে যেতো। নিজেদের তদবিরে রান্না হতো, যথেষ্ট পরিমাণে বিলি হতো। মাখন কলা দই দৈনিকের বরাদ্দ ছিল। হর্ষ তার থেকে কিছু কিঞ্চিৎ লুকিয়ে নিয়ে আসতো বনমালীর জন্যে। বিনিময়ে গল্প শুনতো। বনমালী দারুণ খুশী। সারাদিন দাঁতখিঁচুনি খেয়ে বেড়ানোর পর দুদণ্ড সুখ দু:খের গল্প করতে এমনিতেই ভালো লাগে, তার ওপর আবার উপরি লাভ।

হর্ষ হয়ত জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বনমালীবাবু, হলদে টুপী পরা কয়েদীরা কি বলুন তো ?

বাবু শব্দটিতেই বনমালী গলে জল, জবাব দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করে না. একটু ডেঞ্জারাস টাইপের আর কি। হয়ত পালাবার চেষ্টা করেছিল কিংবা মারপিট। তাই সব সময় নজরে রাখবার জন্যে ওই রঙের টুপী—

—আচ্ছা, আপনি তো হলেন গিয়ে 'মেট' ?

—হুঁ। তা বলা যায় বৈকি।—একটু রসিকতার ঢঙে বনমালী সাহা জানায়।

—আচ্ছা জেলের গেটের সামনে যে ট্র্যাম লাইনের মত রয়েছে—ওটা গেছে কোথায় ?

বার কতক চোখ পিটপিট করে বনমালী তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, কোথায় আর যাবে, পাশেই সেণ্ট্রাল জেলের কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে গেছে প্রথমে—

—তারপরে কোথায় গেছে ?

—এই আলিপুর ব্রিজের গায়ে, ট্র্যাম লাইনের কাছ বরাবর।

—সেণ্ট্রাল জেলটাও কি প্রেসিডেন্সী জেলের মতই ?

একটা হাই তুলে বনমালী উত্তর করে, না, একটু অন্য রকমের।

—কি রকম ?

—বিল্ডিংটা লালরঙের, আর উঁচু—তা তেতলা হবে। নর্দমার জল ব্যবহার করতে হয় না, চৌবাচ্চা আছে। তিন তলায় প্রেস। জেলের খাম পোস্টকার্ড ফর্ম সব ওখান থেকে ছাপানো হয়। আর লিপ্ট আছে। বনমালী আরও একটা হাই তোলে।

হর্ষ আর বিরক্ত করে না। বুঝতে পারে এর পরও যদি প্রশ্ন করে তাহলে বনমালী হয়ত ডাহা মিথ্যে কথাই বলা শুরু করবে।

অথচ এই বনমালীকেই শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করলেন হরিদাসদা, তাদের ওয়ার্ডে যখন রাত্রিবেলা রোজ জামা জুতো চুরি যেতে লাগলো। ওয়ার্ডারদের হাত দিয়ে ও সম্ভবত গভীর রাতে পাচার করে দেয় দোতলার জানালা দিয়ে। সেই থেকে ছেলেরা পালা করে রাত জেগে পাহারা দিতে শুরু করলো।

ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—কথাটা এখানে যতটা মানায়, পাষাণকায়া নগরী সম্পর্কে ততটা মানায় কিনা সন্দেহ। রাজধানী যতই পাষাণী হোক তার হৃদয় আছে, রূপ আছে। গোটা কতক উদার অ্যাভিনিউ আর রোড-স্ট্রীট অন্ততঃ আছে, যে পথ দিয়ে তার নিশ্বাস এবং বিলাস দুই-ই চলেছে। পার্ক, দীঘি আর লেক আছে অবসর দেখে, তপোবন-কুঞ্জবন

না থাক দু-দশটা গাছের ছায়াপাত দণ্ডকয় মুখোমুখি বসবার বেঞ্চগুলিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে।

জেলখানায় আর আলিপুরের পশুশালায় সামান্য তফাত যেটুকু তা গাছ-পালার। গাছপালার কোন বাহুল্য নেই এখানে, শুধু ইঁট, পাথর আর লোহা, প্রাচীর আর প্রাচীর। কথায় কথায় পথ গেছে বেঁকে, কথায় না কথায় অদরাজ দরজার মুখ বাঁকানি। মোটামোটা গরাদে পুষ্ট জানালা, অতিসাবধানী শুঁড়িখানার মত তালার বাহুল্য। মানুষ কীট যদি বাস করে তো এইখানেই, আর কোথাও না। শুধু কি এর দেয়ালগুলিই ইঁটের, প্রাচীরগুলি পাথরের; এর মানুষগুলিও তাই, নিয়মকানুনও পাথরের মত ভারি। আর তার চাপে পড়ে শির দাঁড়া গেছে বেঁকে, মনের সবুজত্ব ইঁট চাপা ঘাসের মতই মরা হলদে রঙ নিয়েছে।

একটা শহরেরই ক্ষুদ্র অথচ ঘনীভূত সংস্করণ হলে কি হবে, সব সময় মনে হবে কি যেন নেই, কি যেন নেই! আছে কি কি আগে দ্যাখ খাতিয়ে। রাস্তা আছে, হাসপাতাল আছে, কল আছে ,আছে কারখানা। তবে নেইটা কি? সারাদিন ছুটোছুটি, সারা দিন কাজকর্ম। পথ দিয়ে লোক চলাচল, মাল আনা নেওয়া থামছে কি? কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে মিলনান্ত প্রহর। তবে কি নেই? প্রাণ নেই! বুকের ঘড়িতে আর হাতঘড়িতে যেটুকু তফাত আর কি। চলাচল আছে, ধুকধুকিও আছে--কিন্তু প্রাণ নেই! মুক্তি নেই, স্বাধীনতা নেই; বিষের উদ্বৃত্তি বন্ধ করতে গিয়ে বাঁধনের পর বাঁধন রক্তস্রোতকেই আটক করে বসেছে, বিষক্রিয়া বন্ধ করতে পারে নি।

আগে আগে, যখন তাদের কোনদলেরই বিচারপর্ব চোকেনি, হর্ষর কেমন ভয় ভয় করতো। লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিনের বৈচিত্র্যহীন মূর্তি এক এক সময় মনকে খুবই দমিয়ে দিত। মনে হতো ভুল পথে এসেছে, এভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের টনক নড়ানো দূরে থাক তাঁদের বিশ্রম্ভলাপের এক চুল ব্যাঘাত করতে পারবে বলে মনে হয় না। একটি মশা যেমন ষাঁড়ের শিঙের ওপরে বসে হঠাৎ মনে ভেবেছিল বেচারীর কতই না জানি কষ্ট হচ্ছে, তারাও তেমনি ধারণা করেছিল দলে দলে জেলে যেতে শুরু করলে সরকারের বিচলিত হতে দেরি হবে না। কিন্তু কোথায় কি। বাইরের খবর বিশেষ পাওয়া যায় না, খবরের কাগজ তখনও পর্যন্ত তাদের ওয়ার্ডে নিষিদ্ধ বস্তু। সুতরাং এক এক সময় মনে হত তাদের আন্দোলন বাইরের নাগরিক জীবনে যে একটু ঢেউ মত তুলেছিল, তাও এতদিনে থিতিয়ে এসেছে। অনেকেই ধীরে ধীরে হয়ত তাদের ভুলতে বসেছে, অফিসের বাবুরা আগের মতই পান চিবুতে চিবুতে অফিসে বেরুচ্ছেন, সিনেমার কিউতে যথারীতি লোক জমছে। শুধু তারা নেই। এই সময় হর্ষর ভয় হতো। মনে হতো এই গোঁয়ার্তুমি

করে ভালো করে নি। হয়ত এক বছর দু-বছরের সাজা হবে, থাকতে হবে এমনি ভাবে দিনের পর দিন। যদি সশ্রম হয়, তো এর সঙ্গে হাড়ভাঙা খাটুনি উপরি পাওনা হবে।

সেদিন সকাল বেলায় প্রতিদিনকার মত ডোবার ধারের ছোট্ট মাঠটুকুতে তাদের খেলাধুলো চলছিল এমন সময় কাণ্ডটা ঘটলো।

লালমোহন আর হর্ষ কপাটি খেলায় আউট হয়ে লাইনের বাইরে বসে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ তাদের সামনে এক টুকরো কাগজ উড়ে এসে পড়তেই তারা মুখ তুলে তাকালো। দ্যাখে তাদের পাশ দিয়ে একজন কয়েদী হন হন করে চলে যাচ্ছে, তার আগে আগে একজন মেট। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ করে যেতে হলে এই মেঠো পথ দিয়ে অনেকে শর্ট কাট করে যায়। ওরাও কোন কাজে তেমনি যাচ্ছে। কিন্তু কাগজ এলো কোথা থেকে? হর্ষ কয়েদীটির দিকেই তাকিয়ে ছিল, চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। ও, তবে এরই কাজ। কিন্তু কি ব্যাপার!

লালমোহন ততক্ষণে কাগজের টুকরোটা ভাঁজ খুলে মেলে ধরেছে। পোস্টকার্ড সাইজের এক টুকরো কাগজ। তাতে পেন্সিলে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লেখা। একটু তাকিয়ে থাকতে লেখাটি বোধগম্য হলো।

'ডিগ্রি সেলের পাঁচ আর ছয় নম্বরে আমাকে আর অমলেন্দুদাকে আটকে রেখেছে। বড়ো কষ্টে আছি। অসিত।'

কাগজের অপর পিঠে শচীনদার নাম লেখা। হর্ষ আর লালমোহন এক সঙ্গে চমকে উঠলো। এই তো দিনদশেক আগেও অসিত তাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে, জালের ওপিঠে দাঁড়িয়ে অভিভাবক আত্মীয়স্বজনের মত অসিতও ইণ্টারভিউয়ের বরাদ্দ সময়টা কাটিয়ে গেছে। তার মুখ থেকেই শুনেছে অমলেন্দুদা বাইরে থেকে পার্টির কাজ করছেন। বিকেল বেলায় তিনি গাইডের কাজ করেন, বিডন স্ট্রীটের পুরসুন্দরী ধর্মশালার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে। চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কলিকাতার বাইরে থেকে কোন সত্যাগ্রহী দল এলে কিংবা সংবাদ আদান প্রদানের প্রয়োজন হলে ধর্মশালার উল্টো দিকে পেট্রোল-পাম্পের সামনে সঙ্কেত স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সেখান থেকে আগন্তুককে নিত্য নতুন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া বা খবরাখবর দেওয়া অমলেন্দুদার কাজ ছিল। কারণ পার্টির অফিসগুলি তখন পুলিশে সিল করে দিয়েছে। চিঠিটা পড়তে পড়তেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ একটানা ঘণ্টার আওয়াজে চমক ভাঙলো হর্ষর। দমকলের ঘণ্টার মত একটানা বেজে চলেছে গুমটি থেকে। জেলফটকের অফিসঘর থেকেও কলিং বেলের মত একটা একটানা সরু আওয়াজ পাল্লা দিচ্ছে তার সঙ্গে।

লালমোহন লাফিয়ে উঠলো চক্ষের পলকে, পাগলী ঘণ্টী, দৌড়ো।

শচীনদাও চেঁচিয়ে সকলকে নিজেদের ওয়ার্ডে ফিরতে বলছেন। চতুর্দিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে, দুদ্দাড় দৌড় ছুট। সিপাহী আর মেট যে যে অবস্থায় ছিল ছুটছে, কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে কিছুই না। কেউ আদ্দেক ইউনিফর্ম পরতে পেরেছে, কেউ বেল্ট আঁটতে আঁটতে দৌড়চ্ছে। দিক বিদিক থেকে উপর্যুপরি তীক্ষ্ণ হুইসল কানে আসছে। সাবধান। সাবধান। গেট সামলাও, ওয়ার্ড সামলাও। গিনতি মিলিয়ে নাও। ঠিক ভূমিকম্পের সুরুতে যে অবস্থা হয় তারই যেন উল্টো পিঠ। সে সময়ে লোকে ঘর থেকে পথে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়ে, এর গতি ঘর মুখো। বোধহয় আধমিনিট সময়ের মধ্যে মাঠ ফাঁক হয়ে গেল, প্রতিটি সেল এবং হলের দরজা লক-আপ করা হয়ে গেল। গিনতি পর্ব চলতে থাকলো ভেতরে ভেতরে।

হর্ষরা দোতলার হলঘরে উঠবার পর্যন্ত সময় পায়নি, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে নিচের হল ঘরটিতে জমায়েত হয়েছে। আসবার সময় প্যাসেজে হীরালাল সিং হুসিয়ার করে দিয়েছে কেউ যেন বাইরে না থাকে, এমন কি ওয়ার্ডের উঠোনেও না। বিপদ হবে তাহলে।

পাঁচ নম্বরের হলঘরগুলির জানালা জেল ফটকেব মুখোমুখি। প্রথমে মাঠ, তারপর ডোবাটি, এবং তারও পরে খানিকটা খোয়ামেশানো মাটির আঙিনার পরেই জেলফটক। জানালা দিয়ে হর্ষ আর লালমোহন মুখ বাড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল, অফিস ঘরের বাঁ পাশে যে গ্যারেজের মত প্রকাণ্ড দরজাটা মাল চলাচলের জন্যে মাঝে মাঝে খোলা হয়, তার গায়ে প্রকাণ্ড পিসবোর্ডের তৈরি একটি ইংরেজি সাত টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কি ভাবে টাঙানো হয়েছে তবে সেই সেভেন্ হরফটি একটি প্রকাণ্ড টাঙ্গির মত ঝুলে রয়েছে তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

অর্থাৎ সাত নম্বর ওয়ার্ড থেকে কয়েদী পালিয়েছে অথবা কোন গোলমাল হয়েছে সেখানে।

—মিলিটারী এসে গেছে—লালমোহন হর্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো।

হর্ষ সে দিকে তাকিয়ে দেখলো জন পনের বন্দুকধারী খাঁকি কোর্তা অফিস ঘরের দরজা দিয়ে ডবল মার্চ করে বটতলায় এসে দাঁড়ালো। তারপর এক মুহূর্তে কি সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল তটস্থ জেল-ডাক্তার এবং জেলরকে অনুসরণ করলো কুইক মার্চে। অপর দল ডিগ্রিসেলের সামনাসামনি ডানদিকে যেখান থেকে জেলের মেইন ওয়ার্ড বিল্ডিং শুরু হয়েছে সেখানকার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠলো। প্রত্যেকের কাঁধে বন্দুকের কিরীচগুলি সকালের তির্যক রোদ্দুরে কাঁচের মত জ্বলে উঠলো। মার্চ করে তারা সাত নম্বর ওয়ার্ডের শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ফায়ার শুরু হলো। হর্ষরা তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে গেল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আবার শান্ত অবস্থা ফিরে এলো। জেল গেটের ওপর থেকে পিসবোর্ডের অক্ষরটি উঠে গেল। মিলিটারী বেরিয়ে গেল জেল থেকে। ফটক দরজার অবরোধ সরানো হলো। ওয়ার্ডের উঠোনগুলিতে বন্দীরা আবার দলে দলে বেরিয়ে পড়লো। সাতনম্বর ওয়ার্ডের খবর সাত নম্বরের বাইরে পৌঁছবার কথা নয়। সেখানে কি হলো কে জানে।

হীরালাল সিংকে জিজ্ঞেস করতেই সে মিটিমিটি হেসে বললো, এ ফলসো মহরৎ আছে।

অর্থাৎ হাতে কলমে একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। কারও কারও এতে শিক্ষানবিশী হলো, কারও বা তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া গেল।

ঘন বর্ষার দিনে যেমন কলকাতার রাস্তায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িগুলি পাড়া কাঁপিয়ে ছুটে যায়। মাঝে মাঝে অভিনয়েরও প্রয়োজন আছে বৈকি।

রাত্রে শচীনদাদের বৈঠক বসলো অসিত আর অমলেন্দুদার ব্যাপার নিয়ে। মাত্র দেড়শ দুশো গজ দূরে ডিগ্রি সেলে তারা নির্জন কারাবাসে ভুগছে, কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য লাগে। কিন্তু এই ডিগ্রি সেল কি বস্তু যারা জানে তারা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করবে না।

ইংরেজি এল্ অক্ষরটিকে উল্টে দিলে যেমন দেখায়, বটতলা থেকে তাকালে অনেকটা সেই রকমই মনে হয়। উঁচু প্রাচীরের ওপিঠে অবশ্য নজর চলে না, শচীনদার মুখেই শোনা। হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় তাঁকে ডিগ্রি সেলে ট্রান্সফার করেছিল।

অর্থাৎ সামনের দিক থেকে এই রকম 'Γ'। প্রথমে বাইশটা সেল সরল রেখায় চলে গেছে, তারপর ডানদিকে ঘুরে আবার বাইশটা। মাঝখানে দরজা। এগুলিকে ফাঁসী সেল বলে। ফাঁসী ঘরটি পিছনে, তালাবন্ধ থাকে, কেউ দেখেনি কখনো।

সারি সারি সেলগুলি বাঁদিকে মুখ করা, জানালা বিহীন এক-দরজার ছোট ছোট খুপরি। সামনে দিয়ে ফুট কয়েক চওড়া রাস্তা চলে গেছে, বাঁ হাতে দুতলা উঁচু প্রাচীরটাকে স্পর্শ করে। এই প্রাচীরটারই বাঁকের মাথায় সার্চলাইট বসানো, প্রথম দিনেই লক্ষ্য করেছিল হর্ষ। যাই হোক এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলে ঢুকতে হলে, প্রথমে যে কাঠের সদর দরজা, তার বুক বরাবর এক বিঘত ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার গর্ত। সেণ্ট্রিরা এই গর্ত দিয়েও সময়ে সময়ে লক্ষ্য রাখে। অবশ্য ভেতরে একজন করে গার্ড থাকে সকল সময়। প্যাসেজের এক কোণে চৌবাচ্চা। বন্দীরা এক ঘণ্টার জন্যে ছাড়া পায় প্যাসেজটার ওপরে পায়চারি করবার জন্যে।

প্রথম জেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই ঝিরঝিরে হাওয়া লেগে মনটা গেল বনের হরিণের মত চমকে। বাতাসে পেল ফাল্গুন মাসের সেই চেনা গন্ধ যা পৃথিবীর কোন ভাষা দিয়েই বোঝানো যাবে না। আর আশ্বিন মাসটা ছাড়া সারা বছরে ফাল্গুন মাসের জুড়ি কই, যদিও আশ্বিন মাসটা তাকিয়ে দেখবার, ফাল্গুন মাস অনুভবের।

আজ হর্ষ মুক্ত। যেখানে খুশী চলে যেতে পারে এবং যেমন করে খুশী। তবু মনে হলো, মুক্তি সে পায় নি, ক্ষুধিত পাষাণের মত এই জেলের একটা অদৃশ্য চাউনি তার পিছনে ছায়ার মত লেগে রয়েছে, খুব সরু সুতো পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে জড়িয়ে গেলে অথবা একটা অদৃশ্য লম্বা চুল ভাত খেতে খেতে আঙুলে জড়িয়ে গেলে যেমন অস্বস্তি লাগে তেমনি। মনে হচ্ছে কয়েক পা এগোলেই বুঝিবা টান পড়বে। অথচ শেকল বাঁধা টিয়েটার, হঠাৎ ছাড়া পেলে উড়তে ভুলে যাওয়ার, নিজের পাখার প্রতি অবিশ্বাস হবার হয়ত বা মানে হয় কিন্তু তার? তাকে তো কেউ বেঁধে রাখেনি এই দীর্ঘ দুমাস পায়ে আংটা পরিয়ে, তবু কেন এমন হয়? কেন এমন হয় যে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না জেলের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই।

কলকাতা সহরটাকে, তার বিকেলের জনবহুল রাস্তাগুলোর মধ্য দিয়ে এমন করে কবে ভালোবেসেছিল এর আগে? স্থির জলের অন্ধকার হ্রদের মধ্যে দিনের পর দিন ডুবে থেকে মহাভারতের দুর্যোধনের অবস্থাটা হর্ষর মত হয়েছিল কিনা জানবার উপায় নেই, তবে হর্ষর নিজের মনে হচ্ছিল সে এতদিন একটা অন্ধকার স্থির জলের বৃত্তের মধ্যেই ডুবে ছিল। বাইরে অনেক অনেক বেশী আকাশ আর আকাশ ভরা আলো ছিল, কোলাহল ছিল, গতিময় একটা পৃথিবী ছিল, যার ছন্দে আমাদের ধমনীগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে ছিল না কলকাতার অবয়ব-সুন্দর ভাস্কর্য, ছিল না তার সকাল বিকেলের জোয়ার ভাঁটা! ছিল না দেওয়ালে দেওয়ালে সিনেমার পোস্টার, অচেনা মেয়ের চেনাভঙ্গি, বাস আর লরীর প্যাঁক প্যাঁক শব্দ তুলে ছুটদৌড়, সিগারেটের ধোঁয়ার একটা অনাস্বাদিত গন্ধ। রেডিওর গান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ বাইরে এসে তার মনে হলো জীবনে যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেওয়ালে সিনেমার একটা তুচ্ছ পোস্টার, চলতি পথিকের বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া, দোতলার বারন্দার রেলিঙে ঝোলা শাড়ি তার বেঁচে থাকার,

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার একটা নতুন মানে বলে দিলো। বুক ভরে নিশ্বাস নিল, জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া গাড়িভাড়া ছ-আনা পয়সা পকেটে মুঠো করে ধরলো এবং কত তুচ্ছ কারণে তার আনন্দ হলো, হাসি পেলো।

কিন্তু তাদের গলির কাছাকাছি এসে একটা অস্পষ্ট ভয় শ্যাওলার মত তার দু-পা জড়িয়ে ধরলো। তাছাড়া লজ্জাও করতে লাগলো চেনা মানুষের সামনে পড়ে যাবার ভয়ে।

বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়তে সঙ্কোচ হলো, মনে হলো, চোরের মত ফিরে এসেছে সে। স্বার্থপরের মত আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছে নিকট-আত্মীয়তার ছল করে। এই বাড়িতে প্রকৃতই তার কোন দাবী নেই, স্থান নেই। কারণ, এই বাড়ির শাসন এবং সর্ত ভঙ্গ করে একদিন সে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং শত অনুরোধ উপরোধ এবং ধমকানীতেও সে নিজের গোঁ ছাড়েনি। মা যখন মড়ার মত মুখ নিয়ে করুণ মিনতি করেছেন, ছোটকাকা যখন মার শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে শেষ বারের মত ভেবে দেখতে বলেছেন, মার প্রাণ বাঁচানো বা পার্টি'র মান বাঁচানো কোনটা বড় কথা, অনিরুদ্ধদা বলেছেন জননী জন্মভূমিশ্চ, তখনো হর্ষ একবাক্যে ঘাড় নেড়েছে।

আর ভয় হলো এই কারণে, তার মা যদি মরে গিয়ে থাকেন, বাড়ির মধ্যে ঢুকে কোথাও যদি তাঁকে দেখতে না পায়, তাহলে হর্ষর কি হবে!

কাঁপা কাঁপা পায়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো, হাতে তার কোট-সোয়েটারের পুঁটুলি একটা। সন্ধ্যা হয়েছে। আবছা অন্ধকার বাড়িটার গলা টিপে ধরেছে মনে হলো, সাড়া শব্দ নেই। সিঁড়ি ভেঙে ভয়ে ভয়ে ওপরে উঠলো। মা তখন সবে মা লক্ষ্মীর পটের নিচে গড় হয়ে প্রণাম করছেন আর মন্দিরা অন্যদিকে মুখ করে খাতা খুলে অঙ্ক মেলাচ্ছে।

মাথা তুলেই সামনে হর্ষকে দেখতে পেয়ে মা এত অবাক হয়ে গেলেন যে কথা বলতে পারলেন না কতক্ষণ। আজই যে হর্ষর জেল থেকে লেখা চিঠি পাওয়া গেছে, দুমাস ধরে জেল আর কোর্ট, কোর্ট আর জেল করে করে অবশেষে তাদের বিচার হয়েছে, সবে দুমাস করে সাজা, আর আজই কিনা সশরীরে তার আবির্ভাব!

—আমাদের দাবী মেনে নিয়েছে, মা!—হর্ষই প্রথম কথা বললো, হঠাৎ তাই ছাড়া পেলাম। অবশ্য ছাত্রদেরই আগে ছেড়ে দিল।

মা হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন হর্ষকে, তারপর মাথায় চুলে চিবুকে পিঠে পাগলের মত হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলেন, যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন, কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা, ভালো ছিল কিনা। হাত থেকে ফাউণ্টেন পেনটা পড়ে গেলে হর্ষ যেমন তাড়াতাড়ি সস্নেহে সযত্নে হাত বুলিয়ে দেখে নিবটার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা।

মন্দিরাটা কেঁদে ফেললো আকুল হয়ে। বাবা বাড়ি ছিলেন না। তারপরে সে রাত্রে কত গল্প, কত আহ্লাদ। বিছানাটায় শুয়ে মনে হতে লাগলো পাখির পালকের মত নরম। জীবনে কখনো এত নরম বিছানায় যেন শোয় নি। রাত্রে ভালো করে ঘুমই হলো না তার অস্বস্তিতে। আর এত ভালো লাগলো মাঝে মাঝে জেগে উঠে, চোখের ওপর বাঘের চোখের মত আলোটা জ্বলছে না দেখে।

দুটো পত্রিকা এসেছিল তার জেলে থাকা কালে, মন্দিরা পরদিন এনে দিল। দুটোতেই হর্ষর লেখা বেরিয়েছে। ভাবতে পারা যায় না, কত দিনের ফেরত আসার গ্লানি এক নিমেষে মন থেকে মুছে গেল তার।

ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা কি সুন্দর দেখায়, কি গম্ভীর। নানা ভাবে অপলক চোখে বারবার সেটা পরীক্ষা করলো। নামটাকে কত নতুন আর রহস্যময় মনে হয়। মনে হয় আর কারো নাম বুঝিবা। দুবার দুবার করে তার নামটা ছেপেছে, একবার সূচীপত্রে একবার গল্পের মাথায়। কালি দিয়ে সূচীপত্রে নিজের নামটাকে চিহ্নিত করলো, যাতে সকলের আগে চোখে পড়ে। এড়িয়ে না যায়। নিজের লেখা দুটো বারবার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেল, একটা ভাঙা টাইপ সুদ্ধু।

নতুনবৌদির কথা, শমিতার কথা আবার মনে পড়লো। কাল রাত্রেও মনে পড়েছিল, ভেবেছিল তারাই আসবে এবাড়িতে, হর্ষ এসেছে শুনে। মনে মনে মিথ্যেই প্রতীক্ষা করেছে কালরাত্রে এবং আজ সকালেও। তারা আসেনি। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি তাদের কথা। এসেই জিজ্ঞেস করলে মন্দিরা কি ভাববে, মা কি মনে করবেন।

পত্রিকা দুটো হাতে করে নতুনবৌদিদের বাড়িতে ঢুকতেই, গায়ে ভিজে কাপড় জড়ানো নতুনবৌদি কলঘর থেকে মুখ বাড়ালেন আস্তে করে, ওমা, হর্ষ কবে এলে? যাও যাও ওপরে আমার ঘরে গিয়ে বসগে যাও, আমি এখুনি আসচি।

লজ্জিত হর্ষ বিস্ফারিত চোখে একটুক্ষণ তাকিয়েছিল তাঁর বিবর্তনের দিকে। সেটা লক্ষ্য করে সহাস্যে কলঘরের কপাট বন্ধ করে দিলেন নতুনবৌদি। শব্দটা ধাক্কা খেয়ে হর্ষর মুখের ওপর যেন ফিরে এলো।

একটা চাপা অস্বস্তি আর বুঝতে না পারা অভিমান নিয়ে ওপরে উঠে এলো হর্ষ। মনে মনে কোথায় যে যন্ত্রণা হচ্ছে নতুনবৌদির জন্য, অনুমান করতে পারলো না। শুধু এই ব্যথাটাই মনের মধ্যে হোঁচট খেলো বারবার, নতুনবৌদি তাঁর সদ্য পাওয়া দ্বিবচন দূরত্ব নিয়ে অনেকটা সরে গেছেন ইতিমধ্যেই, আরো যাবেন কিছুদিন পর। সাঁতরে ধরতে গেলে ঢেউ লেগে গভীর জলে সরে যাওয়া শাপলা ফুলের মত। তাদের মাঝখানের সেতুটা

ভেঙে দিতে আর একজন এগিয়ে আসছে অবিরাম গতিতে। যাকগে!

কিন্তু দোতলাটা একদম ফাঁকা, প্রত্যেকটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো। শমিতারা কোথায় ? শমিতা, শমিতার বাবা-মা-রমিতা ? অনিরুদ্ধদা হয়ত টিউশানিতে বেরিয়েছেন, আর সেটা খুবই সম্ভব, কিন্তু বাকি সব ?

শূন্যঘরখানার মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় হর্ষ। শমিতা প্রথম দিন এই ঘরে এসে লম্বা ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে দেয়ালের ছবিগুলো দেখেছিল, তারপরে হর্ষকে। এই কাল পরশুর কথা বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

এমন সময় আকাশ-রং শাড়িটি পরে নতুনবৌদি ঘরে ঢুকলেন কথা কইতে কইতে, ওরা সব চলে গেছে কাল রাত্রে। এদিকেই কোথায় বাসা পেয়ে গেল।

কথাটার মধ্যে একটা নিরুৎসাহের ছাড়া ছাড়া ভাব ছিল। হর্ষ যেন লক্ষ্য করেও করলো না সেটা, এমন কি কথাটাও।

—কেমন আছেন আপনি ?

—এই !—হর্ষর চোখের ওপর চোখ রেখে ক্লান্ত গলায় কথা বললেন নতুনবৌদি। একটু সজাগ হলো তাঁর চোখের তারা দুটো।

—তারপর ? হঠাৎ ছাড়া পেলে কি করে ?

দুমাসে কত পরিবর্তন হয় মানুষের ! প্রথম তাকে দেখে যতটা ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করবেন বলে ভেবেছিল, তার সিকির সিকিও চঞ্চল হলেন না তিনি। ক্লান্ত, ঠাণ্ডা, ভারি শরীরটা নিয়ে তিনি নিজে আগে খাটের ওপরে বসে পড়লেন, তারপরে তাকে বসতে বললেন।

একটু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন আজকাল, হর্ষ লক্ষ্য করলো। চোখের কোলে আগের সে চিক্কণতা মিলিয়ে গিয়ে নীলচে আভা পড়েছে।

একে একে জেলের সমস্ত কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি।

পরে বললেন, কি চাপা ছেলে বাবা তুমি, জেলে যাবার আগের দিনও আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে গেছ। আর ওরকম পিকনিক করতে যাবেনা, আমাকে ছুঁয়ে বল।

কথা শেষে সেই চুলপেড়ে হাসিটা হাসলেন একবার। রঙ-চটা আর বাসি-বাসি মনে হলো কেন জানি।

বুকের মধ্যে চোরা নিশ্বাস পড়লো একটা হর্ষর।

স্কুলে দেখা হয়ে গেল গজেনের সঙ্গে, মাইনে দেওয়ার ঘরের সামনে। হর্ষকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলো গজেন, কথাও বলে না ছাড়তেও চায় না।

শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে তার একটা হাতের কব্জির কাছটা শক্ত করে ধরে অল্প অল্প নাড়া দিতে দিতে বললো, তুই যে হঠাৎ এমন একটা সিরিয়াস কাণ্ড ঘটিয়ে বসবি আমি কিন্তু ভাবতে পারি নি আগে।

—আমিও। হাসতে হাসতে হর্ষ বললো।

—না, ঠাট্টা নয়। তোর জেল থেকে লেখা পোস্টকার্ডখানা পেয়ে প্রথমটা যে কি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম তা কি বলবো। আজ তোর হঠাৎ দেখা পেয়েও তেমনি—যাক এবার থেকে রোজ ক্লাসে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে।

—কিন্তু এখানে যে আমার হলো না ভাই।

—কেন?

—প্রথম কথা পরীক্ষা দিই নি, যে দুটো পেপার দিয়েছিলুম তার একটিতে পঁচিশ আর একটিতে সতের নম্বর উঠেছে, সেই সঙ্গে ইংরেজীর মাস্টার মশাইয়ের আধপাতা উত্তেজিত মন্তব্য, এই মাত্র সেই খাতা দুখানা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে দেখে এলুম।

—আর দ্বিতীয় কথা?

—সেটি আরো ভয়ানক, আমি যে স্কুলত্যাগ করে জেলে গিয়েছিলুম এই খবরটি আমার কোন উপকারী বন্ধু তাঁর কানে তুলে দিয়েছে। তাই তিনি আর আমাকে 'কুলে' ফিরিয়ে নিতে রাজী নন।—হাসলো হর্ষ।

—তুই হাসচিস এখনো? ধরা গলায় গজেন অভিযোগ জানালো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, তাহলে?

—দেখি অন্য কোন স্কুলে ভর্তি হতে পারি কিনা।

—আমি হেডমাস্টার মশাইকে একবার অনুরোধ করে দেখবো?

—কোন ফল হবে না, যা রেগে রয়েছেন। তাছাড়া চিনিস-ই তো ওঁকে।

কিছুক্ষণ দুজনে বিষন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো মুখোমুখি। কথা নেই।

—ভালো কথা—কি একটা কথা হঠাৎ গজেনের মনে পড়তেই খুশী হয়ে উঠলো, তোর একটা কবিতা বোধহয় বসুমতীতে পড়লাম।

—আমারও তাই মনে হয়, হর্ষ আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো।

—অপূর্ব হয়েছে। নাক ফুলিয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ গলায় বললো।

—দুখানা বই লিখেছি জেলে থাকতে, তোকে শোনাবো।

গজেন উড়ুক্কু মাছের মত লাফিয়ে উঠলো একটুখানি গোড়ালী উঁচু করে, মুখখানা রেবতীভূষণের কার্টুনের মত ঈষৎ লম্বা হয়ে গেল, চোখ দুটো ট্যারা হলো প্রকাশ্যেই, বলিস কি? কবে শোনাবি?—তর সয় না আর গজেনের।

উল্লসিত হয়ে ওঠে হর্ষ, নিজের লেখা পড়ে শোনানোর মধ্যে কি যে ভাল লাগা!

—সামনের রবিবারেই শোনাবো, দুপুরে বাড়ি থাকিস।

বাসায় কিন্তু নেই আমরা, এখন আছি টালিগঞ্জের দিকে।

—সে কি !—হর্ষ অবাক হলো, নব্বুই বছরের লীজ নেওয়ার কথাটা মনে পড়ে যেতেই। এত তাড়াতাড়ি নব্বুই বছর হয়ে গেল ভাবতেই আশ্চর্য লাগে।

—হ্যাঁ !

আর একটা কথাও গজেনের পেট থেকে বেরোবে না বোঝা গেল।

রবিবারের দুপুরে ঠিকানা খুঁজে হাজির হলো গজেনদের বাড়িতে। বাসাই শুধু বদল হয় নি, সংসারও বদলেছে। মাত্র দুমাস সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে আরো কত পরিবর্তন হয়েছে কে জানে।

—তোদের চাদরের ব্যবসা ?

—শেষ হয়ে গেছে। দাদা চাকরিতে ঢুকেছেন সব ছেড়ে ছুড়ে।

—বৌদিকে দেখছি না যে! অপ্রিয় কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললো।

—নেই তাই দেখছিস না।

এত সহজ গলায় গজেন বললো যে প্রথমটা তার কথার অর্থ সঠিক ধরতে পারে নি হর্ষ। ক্যানসার হয়ে মারা গেছেন, একটু পরেই অবশ্য জানতে পারলো কথাটা। ভগবান ঠাট্টা করছেন মনে হলো। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না, ভারি কষ্ট হলো মনের মধ্যে। মানুষ এত অল্প বয়সে কেন যে যখন তখন মরে যায়, একটু সময় পরেই মিথ্যে হয়ে যায়, ভেবে পাওয়া যায় না। গজেনের বৌদিকেই শুধু নয়, মণিকাকাকেও মনে পড়লো আবছা আবছা। একটা করুণ গানের রেশের মত।

কিন্তু বৌদি মারা গেছেন তাতে গজেনের যেন কিছুই এসে যায় নি, এমনকি হর্ষকে বলতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। নিজে যেচে জিজ্ঞেস না করলে জানাই হতো না। অথচ এই বৌদিই একদিন—

গজেনের ওপর মনটা বিরূপ হয়ে উঠলো, বই পড়ে শোনাবার আনন্দ ফুরিয়ে গেল একেবারে।

শুধু শিউলিকে একটিবার দেখবার আশায় গজেনের অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে আসতে পারলো না। একটি রাতের কথা এখনো মনের মধ্যে স্বপ্নের মত বেঁচে আছে—রুক্ষ ক্যানভাসের ওপরে একটি শ্বেত করবীর মুখ। মৃত্যুর ইজেলে আঁটা।

নিজেকে রূপকথার রাজপুত্র মনে হয়েছে। সামনে তেপান্তরের মাঠের মত একখানা গল্পের বই খোলা। দূরের পালঙ্কে আবছা ঘুমের মত একটি রঙিন শাড়ি, পাখির পালকের মত নরম বালিশে একটি নরম গাল। টেবিল ল্যাম্পের নীল আলোটা গঙ্গাফড়িঙের মত লাফিয়ে পড়েছে মেঝের ওপর।

কিন্তু এই ছবিটা যতটাই সত্যি, ততটাই শান্ত। কুয়োর ঠাণ্ডা জলের মত। নাগালের বাইরে, অন্ধকারে। দমবন্ধ যন্ত্রণা নেই একটা অসম্ভব ভালো লাগার। যে ভালোলাগাটা একটা নিতান্তই অকবিত্বকর ঘটনায় মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। স্টোভের সাঁইসাঁই আওয়াজে জানালাবন্ধ ঘরটাকে মনে হয়েছিল পাহাড়ের গুহা, বাইরে সাইক্লোন বইছে যেন। খিচুড়ি ফুটছে, আর তার নিচ থেকে চাপা আগুনের রাঙা আভা বেরিয়ে শিউলির শ্বেত করবীর মত মুখটাকে রাঙা চেলি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে শিউলির চোখদুটো কি যেন ভাবছে। কি একটা গভীর কথা, যা আর কাউকে বলা যায় না, নিজের মনকে ছাড়া। নিজের মনকেও বুঝিবা যায় না। কেন না, পাশেই হর্ষ বসে রয়েছে, হয়ত তার মুখের দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

লেখকদের অর্থনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধে সেদিনকার কিশোর গজেনের অত্যন্ত জ্বলন্ত ধারণা ছিল, সেই ধারণা হর্ষর মনেও আগুন ধরালো। ডিটেকটিভ উপন্যাস হলেও, গজেনের বিবেচনায়, দুখানা বই মিলিয়ে অন্ততঃ পাঁচশোটি টাকা হবে কম করে। আর যে কোন নামী লেখকের চেয়ে কিছু খারাপ লেখেনি হর্ষ। রহস্য দানা বেঁধেছে রীতিমত। ভেবে দেখলে ডিটেকটিভ কাহিনীই সবচেয়ে শক্ত রচনা, শক্ত এই কারণে যে, সনেটের মত গল্পের ক্ষেত্রেও এখানে অনেক নিয়ম অনেক মাপজোক মেনে তবে এগোতে হয়। প্লটের মধ্যেও যেমন যুক্তি এবং সঙ্গতি থাকা উচিত, চরিত্রগুলিও তেমনি পরস্পর স্বতন্ত্র ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর হবে। এবং কতটা বলতে হবে, কতটা না বলতে হবে, আগে কিংবা পরে, কখন আর কি ভাবে বলতে হবে সেটা নখদর্পণে থাকা চাই।

গজেনকে বই দুখানা পড়ে শোনানোর পর থেকেই হর্ষর মনের মধ্যের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কতদিন রাত্রে বিছানায় জেগে শুয়ে শুয়ে পাঁচশো টাকা আর সাহিত্যিক খ্যাতির স্বপ্ন দেখেছে। প্রথম যখের ধন পড়েছিল সেদিনটার কথা মনে পড়েছে। তার বইও হাজারে হাজারে অমনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে, অমনি অজ পাড়াগাঁয়ে, ঘুঘু ডাকা দুপুরে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে কোন মুগ্ধ পাঠক পড়বে এই অচেনা লেখকের লেখা। আর মনে মনে ভাববে এই লেখকের একটা কল্পিত জীবন, কল্পিত চেহারা।

কিন্তু কোনদিন বই কি ছাপা হবে? কে ছাপবে তার বই? গজেন সাবধান করে দিয়েছে সর্বস্বত্ব ঘুনাক্ষরেও যেন না ছাড়ে, প্রকাশক মানেই প্রতারক।

কলেজ স্কোয়ারের বই পাড়ায় সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ালো হর্ষ। মাথার ওপর দুপুরের হলদে আগুন। পায়ের নিচে গলিত লাভার মত তপ্ত পিচ। নাক জ্বালা করে গরম বাতাসের হল্কায়।

পরণে হাফপ্যাণ্ট। মাথায় সবে-পৈতে-হওয়া ছোট চুল। মুখ চোখ টকটকে লাল। কণা কণা নুন জমেছে কপালে, গলায়। হর্ষ চলেছে, বগলে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা। ঘামে ভিজে উঠেছে তার কালো মলাট।

নেই, কেউ নেই গরজী মানুষ, গুণীর আদর কেউ বোঝে না। তবু, তবু ঘুরছে হর্ষ। মাথার মধ্যে বন্‌বন্ করে ঘুরছে কত চিন্তা, কত উচ্চাশা। আর ক্যারমের টোকাখাওয়া ঘুঁটির মত দোকান থেকে দোকানে ছিটকে চলেছে ক্রমাগত।

প্রস্তাবটা সসঙ্কোচে পাতা মাত্র টেবিলের ওধারে দুহাত ফণা তুলেছে জড়ো হয়ে! মাপ করো। যেন ভিক্ষে চাইতে এসেছে সে, কান দুটো ঝাঁঝাঁ করে উঠেছে অপমানে। পথে নেমে এসেছে কোন দিকে না তাকিয়ে।

তবু কেউ কেউ কথা বলেছেন, একটু আশা এবং আশ্বাস দিয়েছেন, ঝুলবার মত একটু বা সময়, হুইল থেকে সুতো ছাড়ার মত করে। তাইতেই মনে মনে কৃতজ্ঞ সে, পত্রপাঠ বিদায় করার মধ্যে একটা অবজ্ঞার লজ্জা আছে।

একজন ছাতার মত কালো, লোমশ জালার মত শরীর ভদ্রলোক হর্ষর খাতাটা নিয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। গোল গোল চোখ দুটো মধ্যাহ্নিক তন্দ্রায় বুজে আসছে থেকে থেকে। ভারি, চর্বিভরা, ডাবের মত মুখ।

হর্ষর সন্দেহ হয় থেকে থেকে, ভদ্রলোক পাতার অক্ষরগুলো সত্যি করে দেখছেন কি না। কিন্তু চৈতন্য তাঁর তন্দ্রিত নয় তাও বোঝা যায়। একটা মন্থর আলস্যে পাতার পর পাতা উল্টে গেলেন তিনি, সতর্ক হাতে, ঠিক নোট গোণার মত দায়িত্ব নিয়ে। একবারও একটার বেশী পাতা উল্টে গেল না হাত ফস্কে।

আর যতক্ষণ শেষ পর্যন্ত না ওল্টানো হলো, সামনে একটা শূন্য চেয়ার পাতা থাকা সত্ত্বেও বসতে পারলো না হর্ষ। মলাটটি পর্যন্ত গোণা হয়ে গেলে, অন্ততঃ হর্ষর তাই মনে হলো, খাতাটা বন্ধ করে একটা বিরাট ব্যাসার্ধ নিয়ে হাই তুললেন, পরে হাইটাকে দুটো তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, গল্পের বই আমরা ছাপি না।

খাতাটা হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পথে নেমে এলো হর্ষ। এবার থেকে যার তার কাছে যেতে ভরসা হয় না তার, মালিকের চেহারা দেখে, দোকান দেখে তবে ঢোকে।

শোকেসে অজস্র গল্পের বই সাজানো আর প্রশান্ত মুখ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ভেতরে বসে থাকতে দেখে শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়ল হর্ষ।

স্মিত হেসে খাতাটা হাতে নিলেন ভদ্রলোক, তুমি লিখেছ বুঝি?

বিনয়ে গলে গেল ও, আজ্ঞে হ্যাঁ।

দুই হাতের তালু ঘষতে থাকলো ঘাড় নিচু করে, মনে হচ্ছে এইবার তার বইটার একটা গতি হবে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভদ্রলোক বললেন, পাতার এক পৃষ্ঠায় লিখতে হয়, জান না বুঝি ?

হর্ষ সত্যিই জানতো না, ঘাড় নেড়ে জানালো সে কথা।

—মন্দ হয়নি।—দু একটা পাতায় চোখ ডুবিয়ে দেখলেন তিনি, ছাপালে ছাপা যেতে পারে। বলতে বলতে ফিরিয়ে দিলেন খাতাটা।

বিমূঢ় হয়ে গেল হর্ষ, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ইতস্তত: করে বললো, তা হলে যদি ছাপতেন দয়া করে—

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক, হুঁ ছাপাবো, তা কাগজের দামটা তুমি দিতে পারবে তো ? বেশী নয়, এই মাত্র শ-দেড়েক টাকা।

হর্ষ ম্লান হেসে পথের দিকে পা বাড়ালো। মনটা তার তিক্ত হয়ে উঠেছে ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে।

ভদ্রলোকের বোধহয় মমতা হলো, ডাকলেন, খোকা শোনো।

কাছে ফিরে যেতে বললেন, শুধু শুধু ঘুরছ তুমি, এ পাড়ায় হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো, বটতলার দোকানগুলো দেখ, ওরা তোমার বই নিলেও নিতে পারে।

কোন কথা না বলে বিদায় নিল হর্ষ। বেশ বটতলাতেই যাবে। খাতা দু-খানা পুড়িয়ে ফেলবার আগে শেষ দেখা দেখবে সে।

সন্ধ্যের দিকে যখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বাড়ি ফিরলো, মন্দিরা ছুটে এলো ভরা খুশীতে, এই দাদা, নতুনবৌদির ছেলে হয়েছে রে।

—তা, আমাকে কি করতে হবে। নীরস গলায় ধমকে উঠলো হর্ষ। আজকের দিনটা কার মুখ দেখে যে উঠেছিল !

কিন্তু সে দিনটা সর্বাংশে যে খারাপ ছিল এমনও নয়। নিজের টেবিলে এসে একখানা খামের চিঠি পেয়ে গেল হর্ষ। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের ছাপ মারা, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলো।

তার জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রথম চিঠি সেখানা, অন্তত: সেদিন তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যিস বাড়ির কেউ খামটা খোলেনি, তাহলে কি যে কাণ্ড হতো। শমিতার এই প্রগলভতা খুব নিষ্পাপ উচ্ছ্বাস বলে বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই ভুল করতো না। আর তাহলে কি যে দুরবস্থা হতো হর্ষর, ভাবতে পারা যায় কি ?

জেলে যাবার আগে যে চিঠিটা হর্ষ তাকে লিখে গিয়েছিল তার উল্লেখ দিয়ে এই চিঠি শুরু হলেও কাঁচা কাঁচা অক্ষরগুলোর মধ্য দিয়ে যে পরিপক্ক বাসনা প্রকাশ করেছে শমিতা সেটা ভিন্ন জাতের। শমিতা সঠিক খবর জানেনা, তবে তার দৃঢ় ধারণা এতদিনে হর্ষ নিশ্চয় বাড়ি ফিরে এসেছে। আর

তাই, চিঠির শেষে তাদের নতুন বাসার ঠিকানা দিয়ে তাকে বিশেষভাবে যেতে লিখেছে।

চিঠিখানা যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে হর্ষ ভাবতে লাগলো শমিতা আগে এতখানি উচ্ছ্বাসপরায়ণ ছিল কিনা। কিংবা তার মাথাটা নিশ্চয়ই খুব প্রকৃতিস্থ নেই, যা লিখেছে তা নিশ্চয়ই তার মনের কথা নয় অথবা সেটা তার সেই মনের কথা যে মনটা চাপা থাকে নিজেরও অবগতির আড়ালে।

কিন্তু জেলে যাবার আগে হলে অনেক কিছুই করতে পারতো সে যা এখন পারে না, এখনকার পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে যার অন্তঃসার শূন্যতা ধরা পড়ে যায়, প্রথমবারেই। আজ আর তার পক্ষে পত্রপাঠ শ্যামবাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নয়, শোভনও নয়। অনেকবার ভেবে দেখলো কথাটা। কি প্রসঙ্গে সে যাবে, কোন সুবাদে, আত্মীয়তার কোন সূত্র ধরে?

তাছাড়া শমিতার মাকে মনে পড়লো, গোলগাল মেদাক্রান্ত মহিলা, হাই তুললে গালের দুপাশে গোটা দুই হাফ্‌বয়েল্ড ডিমের আকারে ভাঁজ পড়ে চর্বির, শরীরে ঢেউ তুলে হাসি হাসেন যখন রক্তের বাণ্ডিলের মত অসহ্য জিভটা নজরে পড়ে। বমিবমি লাগে হর্ষর। আর শমিতার বাবা মনীশবাবু, মনমরা অসামাজিক ভদ্রলোক, যিনি ঘরের এককোণে দেয়ালের গায়ে পোস্টারের মত নির্লিপ্ত মুখ নিয়ে বসে থাকতেন, জীবনে যাঁকে একবার মাত্র রিক্সাওলার সঙ্গে বচসা করা ছাড়া কোন দিন কথা বলতে শোনে নি। চাকরি না থাকলে মানুষ যে এমন ধনেশ পাখির মত ভোঁতা ভঙ্গিতে রাতদিন বসে থাকতে পারে, ভাবা যায় না। ভাবলে ক্লান্ত লাগে, খারাপ লাগে।

সুতরাং সে বাড়িতে যাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না, চিঠিটার জবাব দেওয়া উচিত কিনা তা পরে ভেবে দেখবে সময় মত।

•

কিসের যেন ছুটি ছিল সেদিন। দুপর বেলায় তাদের বাসায় গজেন এসে হাজির। হর্ষর স্কুল বদলানোর পর থেকে আর দেখা হয় নি দুজনের, বই পড়ে শোনানোর রবিবারটি বাদ দিলে। কি জন্যে এসেছে ওর মুখ চোখের ভাব দেখে কিছু বোঝা গেল না। তবে, তার বইগুলোর কি গতি হলো সেইটে জানা যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই।

আর এই কথাটা মনে আসা মাত্রই চটে উঠলো হর্ষ। ইডিয়ট! পাঁচশো টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে যা নাস্তানাবুদ করেছে একদিন! কত অভিজ্ঞ চালে বইয়ের কপিরাইট না ছাড়বার উপদেশ দিয়েছিল, যেন অন্ধি-সন্ধি কতই জানে। আসলে কিছুই জানে না, সাহিত্যের বাজারটা বড় কঠিন ঠাঁই।

—শুনে বোধহয় সুখী হবে—হর্ষ নিজে থেকেই আরম্ভ করলো, পাঁচশো টাকার সখ দাবড়ানো আমার হয়ে গেছে।

গজেন আমতা আমতা করে বললো, মানে, তুমি কোন কথা বলছো আমি মোটেই তা—

থেমে যেতেই হর্ষ যোগ করলো, অনুমান করতে পারছ না, কেমন? আর এখন তুমি যে তা পারবে না, তা আগে থেকেই জানতুম।

—আরে ভয়ানক চটেছিস মনে হচ্ছে—বলেই গজেন ব্যবসায়ী হাসি হাসে, কি হয়েছে এমন?

—কিছু না, শুধু শুধু। মানে অমনি অমনি, বুঝলি?

চাপা আক্রোশে প্রায় ফেটে পড়ে হর্ষ। ব্যাপারটা আঁচ করতে না পেরে গজেন ট্যারা চোখে থেমে যায়। হর্ষই কথা বলে আবার।

—বটতলায় আমার বই দুখানা প্রায় সের দরে বেচে দিয়ে এলাম রে। অবশ্য তাতেও আমি কৃতজ্ঞ, কারণ, সজ্ঞানে ও-বই আর কেউ ছাপতো না। অবশ্য তোর কথা আলাদা—

এতক্ষণে গজেনের হাঁ বুজলো। কিন্তু কৌতূহল মাথা চাড়া দিল, ও, তাহলে বিক্রী করেছিস, কতোয় করলি শেষ পর্যন্ত?

উত্তরে তার দুহাতের সব আঙুলগুলো গুণবার সুযোগ দিল হর্ষ।

—দশ? মাত্র দশ টাকায় এক এক খানা!

গজেনের মনে হলো হাওড়ার ব্রিজ থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সে শুধু চিৎকার করে উঠবে কিনা ভেবে পেলো না।

—হুঁ। দশ আনায় নয়, মনে রেখো। আর, ডিটেকটিভ্ কাহিনীই সব চেয়ে শক্ত রচনা, সে কথাটাও।

বন্ধুর ঠাট্টা নীরবে হজম করে বসে থাকলো গজেন, নখ দিয়ে বারবার টেবিলে আঁচড় কাটতে থাকলো অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে।

যখন মনে হলো প্রসঙ্গটা চাপা পড়ার মত যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে, গজেন নিজের পকেটে হাত ঢোকালো। হর্ষও আড় চোখে, যেন দেখছে না ভঙ্গিতে অপেক্ষা করে থাকলো, নতুন কোন কবিতার খসড়া বের করে কিনা দেখবার জন্যে। প্রজাপতি মার্কা হলুদ খাম বের করতেই হর্ষর বুকের ভেতরটা ধুক্ করে উঠলো আচমকা।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আকর্ণ হাসলো। পরিত্রাণের হাসি। গজেনের বৌদি অনেককাল মারা গেছেন মনে পড়লো।

কিন্তু হর্ষর ঠোঁট মুচড়ে হাসিটা কেড়ে নিল গজেন পর মুহূর্তেই। রহস্যটা স্পষ্ট হলো অন্ধকারের মত। বিয়েটা শিউলিরই। আর বিয়েটা শিউলিরই যখন হর্ষকে যেতেই হবে। যেতে হবে শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে নয়,

নিমন্ত্রিতদের তত্ত্বাবধানের জন্যেও বটে। গজেন সেই রকমই দাবী করে।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না হর্ষ। গজেন উৎফুল্ল গলায় বলে চললো, ছেলে ভালো চাকরি করে, চেহারা অতি সুন্দর, কি স্বাস্থ্য আর কি রঙ্। চাকুরিয়ায় নিজেদের বিরাট বাড়ি আছে। তা ছাড়া—

হর্ষ আর শুনতে চায় নি, হঠাৎ মাথা ধরেছে তার, সবেগে বলে উঠেছে, যাবো, আমি নিশ্চয়ই যাবো গজেন, তোকে অত করে বলতে হবে না।

গজেন ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো, অনেক কাজ বাকি আছে ভাই, আজ তাহলে চলি—

হাত নেড়ে বিদায় দিল বন্ধুকে। মনে মনে আর কাউকে। সারাদিন কিছু ভালো লাগলো না। ওদিকে নতুনবৌদির ছেলেটার ক্ষুধিত কান্না আর এদিকে অসুস্থ পাখির মত তার বাবার চুপ করে বসে থাকা কোনটাই সহ্য করতে পারলো না, মনে হলো ঘরে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবে সে।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো হর্ষ।

একেবারে ফাইনাল পরীক্ষা এসে পড়েছে, সামনে মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যাবধান। আর এই উপলক্ষেই বাড়িতে তার মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি দ্রুত হারে বেড়ে গেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা কি সোজা কথা!

জনার্দনবাবু পর্যন্ত তাঁর ঘুম থেকে, তাঁর নির্বাক স্থবিরতা থেকে জেগে উঠেছেন যেন। ছেলের স্বাস্থ্যের দিকে, স্বস্তির দিকে অবিরাম নজর রাখছেন। দুবেলা তার জন্যে দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখা ওষুধের। তার পড়ার ঘরে যখন তখন কারো ঢোকা নিষেধ হয়ে গেছে অনেকদিন থেকে।

কিন্তু হর্ষর মেজাজটাই অন্য রকম হয়ে গেছে ইদানীং। কিছুতেই আগামী পরীক্ষার কথা ভেবে সতর্ক হতে পারছে না। যদিও সামনে পড়া জমে আছে বিস্তর, রীতিমত না পড়লে কোনই আশা নেই তা নিজেও খুব ভালো করেই জানে তবু কেন যেন মনটা আলগা হয়ে গেছে সব কিছু থেকে।

রাত্রে পড়ার টেবিল থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো হর্ষ। আলো থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা যায়না। বাইরে নিমের ডালে পাতার ঝিরঝির শব্দ। চৈত্রমাসের এলোমেলো উতল হাওয়ায় একটা বয়ঃসন্ধির উন্মাদনা। একটা বিচিত্র অনুভূতি রক্তের মধ্যে, মগজের মধ্যে, বুকের গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। কেমন একটা সুখকর যন্ত্রণা।

ক্লান্ত হাতে বইটা মুড়ে পাশে সরিয়ে রাখলো হর্ষ। তারপর দেরাজ থেকে দিস্তে খানেক সাদা কাগজ বের করে চেয়ারের মধ্যে পা তুলে ঘন হয়ে বসলো।

কলমের প্যাঁচটা খুলতে খুলতে একটু শব্দ করে হাসলো আপন মনে, বন্ধ ঘরে শালিক পাখি উড়লো যেন। বাইরে একচক্কর তাকালো, অমাবস্যার সেই একই রকম অন্ধকার। সামনে একটা চেনা জানালা। অধীর আগ্রহে কেউ আজ জেগে নেই ওখানে। কেউ বলবে না, কি এত ভাবছো তুমি মেঘনা?

কত কত পরিবর্তন হয়ে গেছে জীবনে, চিন্তায়, চরিত্রে, ঘটনায়। তবু আজও হয়ত সেই একই উত্তর সে দিত, অন্ধকার ভাবছি। যদিও সেদিনের সঙ্গে আজকের অন্ধকারের কোনই মিল নেই।

একটু পরেই সমস্ত বাইরের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে লেখার মধ্যে একেবারে ডুবে গেল হর্ষ। এক মুহূর্তে যেন বয়স বেড়ে গেল তার, গুরু দায়িত্বের রেখা পড়লো চিন্তিত কপালে, কখনো চোখে হাসি ফুটে উঠছে বর্ষা সকালের হঠাৎ

রোদ্দুরের মত, কখনো ঠোঁটের ডগায় নিষ্ঠুরতা। কখনো জোরে জোরে কথা বলছে স্ত্রী পুরুষ নানান চরিত্রের হয়ে, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে নিজের কথা, তারপর কাগজে হুবহু টুকে যাচ্ছে সেগুলো। সত্যিকারের পাগলের থেকে কতটুকু তফাত!

হর্ষর এই উপন্যাস রচনার পিছনে একটা লোভনীয় ইতিহাস আছে। সেটা এখানে বলা দরকার। স্কুল বদলি করে হর্ষ যেখানে এলো সেখানে, শুধু ক্লাসেই নয়, গোটা স্কুলেই তার চেনা জানা কেউ ছিল না। পিছনের বেঞ্চিতে এক কোণে বসে থাকতো সে, নানা কারণে মনমরা।

এমন দিনে আলাপ হয় সুদর্শনের সঙ্গে। সুদর্শনকে অনেক দিন আগে, যেদিন প্রথম ক্লাসে এলো হর্ষ, লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য করেছিল বললে ভুল বলা হবে, লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না তার। সে যে শুধু তার সুশ্রী চেহারার জন্যে তা নয়, তার জমকালো সাজ পোশাক, কথা বলার নতুন ভঙ্গি, চালচলন, সব মিলিয়ে।

অমন শান্তিপুরী চওড়া পাড়ের কোঁচানো কোঁচাটি ফুলের মত হাতে নিয়ে, গিলে করা পাঞ্জাবীতে সেণ্ট ঢেলে আর কেউ স্কুলে আসতো না। সোনার হাতঘড়ি আর হীরের আংটি মাস্টারদের যেন ব্যঙ্গ করতো। সুদর্শনের দামী মণিব্যাগের মধ্যে এক আধখানা বড়ো নোটের অস্তিত্ব এবং স্কুল ছুটির পর বাতাসে নির্বিকার চিত্তে গোল্ডফ্লেকের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া হর্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ যতটা করছে, মনকে বিকর্ষণ করেছে তার চেয়ে বেশী।

কিন্তু ঘৃণাই যে মানুষের সব চেয়ে বড়ো মোহ, অন্তত: সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা একথাটা প্রমাণ হয়ে গেল প্রথম সুদর্শনের মধ্য দিয়ে। সুদর্শনকে ঘৃণার বেড়া দিয়ে ঠেকানো গেল না, অবজ্ঞায়ও না। সে নিজে থেকেই হর্ষর দিকে আর সকলের চেয়ে একটু বেশী পরিমাণেই ঝুঁকলো। পাশে বসতে শুরু করলো, গায়ে পড়ে কথা বলতেও। অযাচিতভাবে গল্পের বই, মাসিক পত্রিকা পড়তে দিয়ে, টিফিনে কমপক্ষে টফি চকোলেট পকেটে গুঁজে দিয়ে সে যেন আলাপ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো।

এতোতেও মন পায় নি হর্ষর, হর্ষ তেমনি অনড়, তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি পিছন ফেরা। কিন্তু সুদর্শনেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। যেদিন থেকে সে জানতে পারলো হর্ষ লেখে এবং নানান পত্রিকায় সে লেখা ছাপা হয়, সেই দিন থেকে। পরম বোদ্ধা এবং একজন অনুরক্ত পাঠকের মত সে হর্ষর সঙ্গে তার লেখা নিয়ে আলোচনা করতো, হর্ষ বিনয়বশত: নিজের লেখার বিরুদ্ধে গেলে সে তর্ক করে তাকে হারিয়ে দিত। শুধু তাই নয়, কোন পত্রিকায় তার লেখা বেরোলে সেই সংখ্যাটি ডাক মারফত হাতে পাবার অনেক আগেই সুদর্শনের কাছ থেকে পেয়ে যেত। পয়সা খরচ করেই যেন তার আনন্দ।

দুজনের মনের দূরত্ব যখন দুই আঙুলের ফাঁকের মত প্রায় নেই হয়ে এসেছে, দুম্ করে বলে বসলো সুদর্শন, একটা সিনেমার গল্প লেখ্ হর্ষ।

—সিনেমার গল্প ?—হর্ষ মাইক্রোফোনের মত সজোরে প্রতিধ্বনি করলো সুদর্শনের কথাটার।

—হ্যাঁ, সিনেমার গল্প, মানে ছায়াচিত্রের জন্য কাহিনী। লেখ্‌না একটা।

বলেই সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ঘোরালো নাকের ডগায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে।

এ হেঁয়ালীর কোন অর্থ খুঁজে পায় না, সব সময়েই বড়ো বড়ো কথা সুদর্শনের। বিহ্বল কণ্ঠে খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, কেন, কি জন্যে ?

—ন্যাকা !—এক চোখ বুজে কথাটা টিপ করে ছোঁড়ে সুদর্শন।

হর্ষ এবার যেন বুঝতে পারে, সোজাসুজি বলে, কিন্তু আমার গল্প সিনেমা কোম্পানী নেবে কেন ? নামকরা লেখক থাকতে আমার—

—আলবৎ নেবে। নেওয়ানোর ভার আমার ওপরে থাকলো, তুই শুধু প্রেমসে লিখে যা। কিন্তু সময় নেই, একটু জলদি লিখতে হবে, এই ধরো দিন দশেকের মধ্যে।—পরে কি ভেবে দিনের অঙ্ক বাড়িয়ে দিল সুদর্শন, না দশ দিনে হবে না, পনের থেকে কুড়ি দিন সময় দিলাম, লিখে যা।

—লিখে যাবো ? আমি কি লিখতে পারবো সিনেমার গল্প ?

—জরুর ! জিভটা জড়িয়ে উচ্চারণ করলো সুদর্শন, কুছ ঘাবড়াও মাত্ ব্রাদার ! সিনেমার গল্প, অতএব একটা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। এই বেড়ালই বনে গেলে বন বেড়াল হয়, কে যেন বলেছিলেন না কথাটা ?

সুদর্শন প্রায় হো হো করে হাসে।

এই মানুষই বনে গেলে বনমানুষ হয় কিনা ভাবতে ভাবতে হর্ষ অন্যমনস্ক গলায় বলে, তবু অনেকটা পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই ?

—তা আছে, সুদর্শন মেনে নিয়ে বলে, কিন্তু কঠিনটা কোথায় ? বাংলা সিনেমা তুইও তো কম দেখিস নি, সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় ছাড়া আর কি। তবে হ্যাঁ ঘটনাগুলো যাতে ড্র্যামাটিক হয়, ডায়ালগের মধ্যে রীতিমত অ্যাকসেণ্ট থাকে আর গোটা গল্পের গায়ে রোমান্সের গন্ধ মাখা একটা সাস্‌পেন্স থাকে সেদিকে নজর রেখে কষে লিখে যা।

হর্ষ তবু চুপ করে আছে দেখে সুদর্শন একটু অধৈর্য হয়, কি হলো, সময় কম হয়েছে ?

—না।

—তবে ? সংলাপ লিখতে পারবি না ভাবছিস ? তা শুধু গল্পটাই লেখ না।

—না, তা নয়।

—তবে আর কি। পিঠ চাপড়ে দিয়ে দক্ষিণগামী বাসটায় উঠে পড়ল।

পরে কি মনে পড়তেই ভিড়ের ভেতর থেকে লম্বা করে ঘাড় বার করে বললো, কান্নাহাসির দোলা থাকলে গল্প জমে ভালো, দিতে পারলে দিস, কিন্তু ব্রাদার খবরদার, হাসি কান্নার যেন না হয়। ট্র্যাজিক এণ্ড হলেই সিমেনায় সব মাটি।

এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে সুদর্শন কথাগুলো বললো যে বাসসুদ্ধ লোক হাঁ করে হর্ষর দিকে তাকালো। হর্ষ লজ্জিতভাবে নিজের দিকে তাকালো, ভাগ্যিস আজ হাফপ্যাণ্ট পরে আসে নি নইলে এত লোকের চোখের সামনে মিইয়ে যেতো।

বারো আনা রাত হর্ষ পড়ার টেবিলে কাটায়, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির মধ্যে। কখনো তোড়ে লিখে যায়, কখনো বা কয়েক ঘণ্টায় মাত্র এক পাতা দেড় পাতা লেখা হয়, কিছুই ঠিক নেই। গল্পটা মোটামুটি আগে থেকেই ছকা ছিল, তবু একেক সময় হিমসিম খায়, মনে হয় আর মেলাতে পারবে না, ঘটনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, এই বুঝি জট পাকিয়ে যায়, এক একটা চরিত্র নিয়ে এমন দুর্ভাবনা হয় বুঝি ভরা ডুবি হলো। যে চরিত্রটা কাহিনীর মধ্যে যত প্রভাব বিস্তার করছে তার বৈচিত্র্য দিয়ে, তাকে নিয়েই তত ভয়, এই বুঝি বিগড়ে গেল! তাছাড়া ঠিক নিজের নিজের মত করে কথা বলানো সেও এক কঠিন সমস্যা, মনের মধ্যে কোন চেনা জানা চরিত্রের কাঠামো খাড়া করতে না পারলে ফাঁপড়ে পড়তে হয় সংলাপে এসে।

হর্ষ মরিয়া হয়ে উঠেছে, শুধু নামের জন্যে নয়, টাকার জন্যে নয়, উপন্যাস কিছুটা দূর এগিয়ে গেলে যে কোন তরুণ লেখকেরই যা হয়, লেখার টানে তখন এগোতে থাকে, ওরও তাই হয়েছে। যত বাধা পাচ্ছে, যত কঠিন হচ্ছে ততই তার মনটা অদম্য স্পৃহায় এগোতে চাইছে। কাটাকুটি করে, জোড়াতাড়া দিয়ে, রাতের পর রাত তার লেখা এগিয়ে চলেছে, থেমে নেই, থেমে থাকে নি এক দিনও।

প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে লীন হয়ে গেছে তার সত্তা, সে নারী হোক আর পুরুষ হোক, তার অন্তরটা জানতে বাকি থাকে নি একটুও; তার লোভ, তার ইচ্ছা, তার বাইরের কথায় আর ভেতরের কামনায় দ্বন্দ্ব, যা বাস্তবে জানা যায় না, আলো আর অন্ধকার দুটো দিক একসঙ্গে দেখা যায় না, তা হর্ষর চোখে আগে প্রতিফলিত হয়েছে, তারপরে আত্মগোপন করেছে। এ এক অন্য জগৎ, এখানে মানুষের বয়স থাকে না, নাম থাকে না, দারিদ্র্য থাকে না, শুধু চৈতন্য থাকে। হর্ষরও তাই হয়েছে, ফরমাশী লেখা হলেও, প্রতিটি চরিত্র তার কণা কণা অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিয়েছে, তার চোখের জল, তার ঠোঁটের হাসি, তার নিষ্ঠুর নগ্ন চিন্তা প্রাণের আবেগে ফেনিয়ে উঠেছে কলমের ডগায়।

মাত্র কুড়ি দিনে একখানা বিরাট উপন্যাস লিখে দেবে হর্ষ, পরীক্ষার এই আসন্ন মুহূর্তে, সত্যি সত্যি অতটা প্রত্যাশা করে নি সুদর্শন। প্রথমটা হাতে নিয়ে সন্দেহের চোখে তাকালো ওর মুখের দিকে, তারপর কয়েকটা পাতা উল্টে গিয়ে বললো, নিজেই লিখেছিস তো ?

—না, আমার বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছি।—রাগে গরগর করতে করতে হর্ষ বললো।

আর সত্যি, হর্ষর চেহারাটা দেখলে মায়া হয়, চোখের কোলে কালি পড়েছে রাত জেগে জেগে, মুখে একটা অপরিসীম ক্লান্তি, যেন সব কিছু বিস্বাদ লাগবে তার জিভে, এমনি একটা ভঙ্গি। ধকল তো কম যায় নি।

—আমাকে মাপ করিস, সুদর্শন ওর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললো, না ভেবেই বলে ফেলেছি কথাটা, আসলে তোর লেখাটা দেখে আমার তাক লেগে গেছে, ইয়া বোমা উপন্যাসখানা মাত্র কুড়ি দিনে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে… আর কি সুন্দর হাতের লেখা তোর ! জামাইবাবু বিশ্বাসই করবেন না আমার কোন বন্ধু লিখেছে।

সুদর্শন অবশ্য আগেই ভেঙে বলেছিল ওকে। ওর জামাইবাবুকে বাংলা দেশে না চেনে কে, একজন নামকরা চিত্র-প্রযোজক এবং পরিচালক। আজ পনের বছর ধরে বই করে আসছেন, এবং প্রত্যেকটিই হিট-পিকচার। টালিগঞ্জে নিজের স্টুডিও…বিরাট বড়লোক, সুদর্শনকে দেখলে মনেই হবে না তাঁর আত্মীয় বলে। সে যাই হোক জামাইবাবু মাইডিয়ার গোছের লোক, সুদর্শনের কথা ঠেলতে পারবেন না। তাঁকে বলে কয়ে নেক্সট্ চান্সে হর্ষর বইটা ফিল্মে চড়িয়ে দেবে। আর জামাইবাবু নিজে যদি হাতে নেন তবে এ বই বাজারে হিট করে বেরিয়ে যাবেই যাবে।

হর্ষ কৃতজ্ঞতায় গলে যায়, সত্যি তুমি আমার জন্যে যা করলে—গলাটা কেঁপে যায় একটু।

—এখনো করিনি।—সুদর্শন তার বিনয় দেখে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলে, তবে নতুন লিখছিস, পয়সা কড়ি তেমন পাবি না, শ-পাঁচেক বড়ো জো[illegible]। তারপর একখানা বই বেরিয়ে গেলে দেখবি—

পাঁচশো ! হর্ষ মাত্র পঁচিশ টাকা পাবে শুনলেই খুশী হতে পারতো, সেখানে পাঁচশো টাকা ! হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেলো না।

স্টুডিওর ফটক সেই প্রথম দেখলো এবং বিনা বাধায় পারও হলো হর্ষ। সুদর্শন তার চেয়ে মাথায় এবং বয়সে উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট বড়ো, হর্ষ বিনীত অনুগত ছোট ভাইটির মত পিছন পিছন অনুসরণ করছিল।

তাকে দারোয়ানদের খাটিয়ায় বসিয়ে সুদর্শন হর্ষর পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে তার জামাইবাবুর খাস কামরায় অদৃশ্য হলো, আর হর্ষ টিপ্‌টিপ্ বুকে তার রচনার

সঙ্গে জাঁদরেল চিত্র-প্রযোজকের শুভদৃষ্টির মুহূর্ত গুণতে লাগলো। এমন কি-হয় কি-হয় উৎকণ্ঠা পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগেও কখনো হয়নি। যেন হিন্দুস্থানী দারোয়ানের ছারপোকা সমৃদ্ধ খাটিয়ায় বসে নেই, অপারেশন টেবিলে কণ্ঠাগত প্রাণ হয়ে শুয়ে আছে। কারণ, জামাইবাবু নামক নিরীহ ঠাট্টা-সম্পর্কের লেবেল এঁটে প্রযোজকের গাম্ভীর্য যতই কেন স্খলিত করা হয়ে থাকুক, তার মানস নেত্রে এক জোড়া ভয়াল ফ্রেমের চশমা আঁটা, ক্রুদ্ধ গোঁপ. বিশালকায় ভদ্রলোকের ছবি ভেসে উঠলো। আর সেই কল্পিত মূর্তির সামনে বসে বসে ঘামতে থাকলো সে।

সেকেণ্ড সেকেণ্ড করে মিনিট এবং মিনিট মিনিট করে ঘণ্টা পার হয়ে গেল, শেষে সাম্ভাব্য সময়ও উত্তীর্ণ হলো, কিন্তু সুদর্শন আর ফিরে এলো না। অথচ যাবার সময় বলে গেছে যাবে কি আসবে। আগে থেকে সব বলাই আছে, শুধু বইখানা পৌঁছে দিয়ে আসবে বৈ তো নয়, তবে ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

আর যতই দেরি হচ্ছে ততই মনে মনে ভয় হচ্ছে হর্ষর, নিজেকে এই অচেনা জায়গায় নিতান্ত করুণ আর বেমানান মনে হচ্ছে। ওদিকে অফিস ঘরের ভেতর হয়ত আরো করুণ দৃশ্যে সুদর্শন অভিনয় করে চলেছে। প্রযোজক মশাই হয়ত খামকা চটে বসেছেন কিংবা তাদের স্পর্ধা দেখে লাল হয়ে উঠেছেন. গম্ভীর মুখে আঙুল নেড়ে টেবিলটা সাফ করতে বলছেন জঞ্জাল সরিয়ে। হর্ষর পাণ্ডুলিপিটা তাঁর মত ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কাছে জঞ্জাল ছাড়া আর কি? লজ্জায় সুদর্শন তার কাছে ফিরে আসতে পারছে না হয়ত।

এমনসময় গম্ভীরমুখে সুদর্শন বেরিয়ে এলো অফিস ঘর থেকে। হর্ষ তার মুখের অবস্থা দেখে কোন কথা বলতে সাহসী হলো না। কোন কোন দুঃসংবাদ আছে যা যতক্ষণ না জানতে পারা যায় ততক্ষণই ভালো।

অনেকদূর নির্জনপথ ভেঙে ট্র্যাম ডিপোর কাছে এসে সুদর্শন মুখ খুললো, পাঁচ সাতজন লেখক জামাইবাবুর টেবিলে মাছির মত সেঁটে বসে রয়েছে দেখে এলুম। ওই ব্যাটারাই তো...যাক, তোর গল্পটারই বোধহয় ফার্স্ট চান্স. আমি নিজে হাতে ওঁর ড্রয়ারে রেখে এলুম।

—কোন কথা হলো না তাহলে? হর্ষ একটু নিরুৎসাহ বোধ করলো।

—না। দিন পনের পরে গিয়ে দেখা করবো একবার। সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে মুখ নিচু করে বললো।

—বাড়ি গেলেই তো ভালো হতো তবে। আচ্ছা, বাড়িতে না গিয়ে স্টুডিওতে তুমি কেন এলে?

এক মুহূর্ত সিগারেট টানতে ভুলে গেল সুদর্শন, বাঘের মত জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো ওর মুখের দিকে, তুই আমাকে সন্দেহ করিস?

—না তা কেন, হর্ষ বিপদে পড়ে গেল, স্টুডিওতে যখন এত ভিড় -

—কিন্তু বাড়িতে ওঁকে কোন সময় পাবি, আমার দিদিই পান না, রাত্রে বারোটার আগে যেদিন ফেরার ফেরেন নইলে দু একটা রাত ওঁর বাইরেই কেটে যায়। তাছাড়া—হাত দিয়ে একটা কল্পিত গেলাসে কিছু ঢালবার ভঙ্গি দেখিয়ে বললো, একটু ইয়ের দোষ আছে কিনা, সকাল হয় বেলা বারোটায়, বারোটা থেকেই আবার স্টুডিও। বুঝলি না—

সুদর্শন চলতি ট্র্যামটায় লাফিয়ে উঠে পড়লো।

হর্ষ একবার চেঁচিয়ে ডাকলো সুদর্শনের নাম ধরে, কিন্তু ট্র্যামটা ততক্ষণে বিশ গজ এগিয়ে গেছে, ও শুনতে পেল না। বিবর্ণমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো রাস্তার ওপর, পকেটে যে একটাও পয়সা নেই, আসবার সময় ঝোঁকের মাথায় সুদর্শনের ভাড়াটা দিতে গিয়েই এই দশা হয়েছে। মনে মনে ভেবে ছিল ফেরার ভাড়াটা চেয়ে নেবে, তা হলো না।

সামনে পরীক্ষা, আর তা না হলেও, এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা অসম্ভব। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গজেনের বাসার কথা মনে পড়তেই দ্রুত পা চালিয়ে দিল। গজেনের কথা মনে পড়তেই শিউলির কথাটা বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। বড়োবাজারের বাসায় ওর রান্না করে খাওয়ানোর কথা ভুলবার নয়। তবু নির্ভুল ভাবেই তার বিয়ে হয়ে গেছে, উৎসবে ত্রুটি হয়নি কোনো। লাল চেলির মধ্যে ঠিক পারুল পিসীর মত গম্ভীর হয়ে হয়ত বসেছিল শিউলি, চোখ দুটো পদ্মপাপড়ির মত রাঙা। হয়ত কেঁদেছিল সে, কিংবা হয়ত কাঁদেনি, সব মেয়েই কাঁদে না, তবু একই রকম দেখতে হয়, উপবাসে আর হোমের ধোঁয়ায়। কিন্তু একটি বারের জন্যেও কি ভেবেছিল হর্ষর কথা, না ঢাকুরিয়ার বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতেই তার সময় কেটে গেছে।

চলতে চলতে হর্ষ দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ, নাঃ, গজেনের বাড়িতে যাওয়া চলতে পারে না।

পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট চুকতে প্রায় মাসখানেক পেরিয়ে গেল, অথচ সুদর্শনের দর্শন নেই। কি যে করলো বইটার গতি, চিঠি দিয়ে যে জানবে সে উপায়ও নেই, ঠিকানা জানে না। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না তার, আর চুপ করেই তো ছিল, হঠাৎ মেট্রো সিনেমার সামনে দেখা হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

দেখা হতে সুদর্শনই প্রথম এগিয়ে এল ওর দিকে, এই যে, কি করেছিস বল দেখি তুই, ছি-ছি।

—কি আবার করলাম ছি-ছি করবার মত ?

—ন্যাকা! সুদর্শন বিরক্তি প্রকাশ করে, সরাসরি ভূমিকা না করে বললো, জামাইবাবু ভীষণ রেগে গেছেন তোর লেখা পড়ে, ওঁরই তোলা একটা সিনেমার গল্পের সঙ্গে নাকি হুবহু—। রেগে আগুন হয়ে আমাকে যা নয় তাই গাল দিয়ে বললেন, 'এ বই ফিল্মে তুললে, টাকাগুলো তো জলে যেতোই, হাতেও দড়ি পড়তো! অল রাইট! আমিও ছাড়বো না, এ ধরণের ঠগ জোচ্চোর শায়েস্তা করতে আমার বেশী সময় লাগে না। আমি ওকে পুলিশে হ্যাণ্ড ওভার করবো, ওর ঠিকানা আমাকে বলো।' আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে ক্ষমা চাইলাম কিন্তু তাতে কি শান্ত হন! শেষে দিদি যখন অনেক করে মাপ করতে বললেন এবারটির মত, তখন চুপ করলেন।

হর্ষ এত বেশী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে মুখ দিয়ে রা-টি বেরোলো না। অপমানে, আক্রোশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। সে চোর!

সুদর্শন আপশোষ করে বললো, আর তোর জন্যেও দুঃখ হয়, বলিহারি বুদ্ধি বাবা তোর, টুকবি টোক, এলাইনে সবাই অমন একটু আধটু করে থাকে। কিন্তু তা বলে একটা বই থেকেই কি সবটা নিতে হয়! একি তোমার পরীক্ষার খাতা যে ধরা পড়ার কোন ভয় নেই, উল্টে নিজের লেখা নোট হলে পরীক্ষক খুশীই হবেন? হেঁ হেঁ, এঁরা হচ্ছেন ঘোড়েল ব্যবসাদার।

হর্ষ গরম গলায় বললো, কিন্তু আমি নিজেই লিখেছি গল্পটা, কারো লেখা থেকে চুরি করিনি, এতটা বিশ্বাস আমার আছে।

—আমার নেই।

—কিছু আসে যায় না তাতে, খাতাটা ফেরত দিও।

—আপাতত নয়।

—কেন? হর্ষ চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলো সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে।

—মাথা ঠিক থাকলে ব্রাদার নিজেই বুঝতে পারতে, সুদর্শন স্মিতমুখে সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করতে করতে বললো, জামাইবাবু যে পরিমাণ রেগে আছেন আমার ওপর তাতে দু-এক মাসের মধ্যে তাঁর সামনে যেতে ভরসা হয় না।

শমিতার চিঠিটার কথা মনের কোণে একদম হারিয়ে গিয়েছিল হর্ষর। ভুলেই গিয়েছিল যে বেড়াতে না যাক, অন্তত: একটা উত্তর দেবে বলে সঙ্কল্প করেছিল কোন দিন। কথাটা মনে পড়লো পথে রমিতার সঙ্গে নাটকীয়ভাবে দেখা হয়ে যেতেই।

চিত্রা সিনেমার সামনে দিয়ে কোন পত্রিকা অফিসের উদ্দেশে চলেছিল হর্ষ, হঠাৎ চোখ পড়লো রমিতার ওপর। একটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করছে সে। তর্ক হলেও তাদের আলোচনার বিষয়টা যে কোন ছবি ভালো

হয়েছে বা কোথায় যাওয়া উচিত এমনি একটা কিছু হবে, তা না শুনেও অনুমান করতে পারলো। হর্ষ কে দেখতে পেয়েছে কিংবা চিনতে পেরেছে এমন কোন লক্ষণ দেখলো না রমিতা, শুধু যুবকটির কি কথার যেন উত্তরে অপ্রাসঙ্গিক ফ্যাকাশে হাসি হাসলো একটু। রমিতার সঙ্গে কথা বলবার রুচি ছিল না কোন দিনই, আজ তো নয়ই।

দুপুরের ঘড়িতে তখন দুটো বাজে বাজে। শমিতার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হলো কেন জানি। নম্বরটা মনেই ছিল, গলিটা কাছেই, শেষ পর্যন্ত পা বাড়িয়ে না দিয়ে পারলো না।

নির্দিষ্ট দরজায় গিয়ে বার দুই খুব সঙ্কুচিত হাতে কড়া নাড়লো হর্ষ। প্রতিমুহূর্তেই শমিতার মাকে আশঙ্কা করছিল, কিন্তু তিনি এলেন না। মুখ বাড়ালেন আর একজন।

মনীশবাবুর নাম করতেই বৌটি হাত বাড়িয়ে দোতলার সিঁড়ি দেখিয়ে বললেন, ওপরে। বলেই সরে দাঁড়ালেন। হর্ষ পাশ কাটিয়ে দোতলায় উঠলো। ।নশ্চুপ দোতলার ফ্ল্যাটটা। মনে হয় ঘুমিয়েছে সকলে। তবু দ্বিধা ছুঁড়ে ফেলে দরজায় ঘা দিল।

একটু অপেক্ষা করতে হলো হর্ষকে। বিস্রস্ত শাড়িটাকে শরীরে ভালো করে জড়াতে জড়াতে দরজা খুললো শমিতা নিজে। খুলেই অবাক।

—আরে মেঘনা যে! এতদিনে আমাদের মনে পড়লো বুঝি? কথাটার শেষে মরা জ্যোৎস্নার মত হাসলো শমিতা। হাসিটা বুকে এসে বিঁধলো হর্ষর, শমিতার যেন কিছু একটা হয়েছে।

—নানা কারণে সময় পাইনি এতদিন, খুব রাগ করেছ বুঝি? গলার স্বর খাদে নামিয়ে শেষে প্রশ্ন করলো, তোমার মা ঘুমোচ্ছেন?

—না, ওকি, ভেতরে এসো তুমি। কপাট দুটো ভালো করে খুলে ধরলো কথার শেষে।

একটু লজ্জা পেল হর্ষ, যেন ভেতরে যাবার নিমন্ত্রণ সে ইংগিতে দাবী করেছে আর কি! ছি ছি।

হর্ষকে ঘরে নিয়ে এসে চেয়ার এগিয়ে দিল শমিতা, নিজে বসলো খাটের ওপর, শরীরটাকে খানিকটা এলিয়ে দিয়ে।

শঙ্কিত চোখে শমিতাকে এক নজরে অনেকটা দেখে নিল হর্ষ। মুখটায় কি রকম ফ্যাকাশে ভাব, নাকটা একটু যেন বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। চোখের গড়ানে ছায়া পড়েছে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকে সব সময়।

—তোমার কি অসুখ করেছে শমিতা?

ভয়ানক চমকে গেল শমিতা, কেন? খুব বিশ্রী হয়েছে বুঝি চেহারাটা? ভীতচোখে তাড়াতাড়ি দেয়ালে টাঙানো আর্শীটার দিকে তাকালো।

—না, ইতস্ততঃ করে হর্ষ বললো, একটু শুকনো দেখাচ্ছে আর কি।

শমিতা কথা বললো না ।

—তোমার বাবা কোথায় ? শনিবারেও কি অফিস থেকে ফিরতে বিকেল হয় নাকি ?

—না, রাত হয়। অফিস থেকে সোজা মাঠে যান কিনা। বাবা রেস খেলেন, তুমি জানো না ?

—জানতাম না। হর্ষ দুঃখিত গলায় বললে ।

—এই ঘোড়া রোগেই আমাদের সব গেল, রাজা বাজারের বাড়িটা পর্যন্ত। এখন মার গয়নাগুলোর দিকে বাবার নজর পড়েছে। আরো দুঃখিত গলায় শমিতা জানালো ।

—হ্যাঁ, তোমার মা কোথায় ?

—তিনি মামার বাড়ি গেছেন, বোধহয় গয়না গুলোর একটা ব্যবস্থা করতে ।

—রমিতাকে দেখলুম—প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে বললো হর্ষ, সিনেমায় গেছে না ?

হঠাৎ শমিতা সোজা হয়ে বসলো কথাটা শুনে, সিনেমায় কেন যাবে, ও তো স্কুলে গিয়েছে ।

—কিন্তু চিত্রার সামনে একটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এলাম যেন ।

—একটি ছেলের সঙ্গে! চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো শমিতার, কি রকম চেহারা তার ? একটু ভেবে নিয়ে নিজেই বলে গেল পর পর, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা ছিল, কোঁকড়ানো চুল ? দোহারা চেহারা ?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলো হর্ষ। শমিতার মুখখানা কেন যে দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল, কারণটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারলো না ।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শমিতা চুপ করে থাকলো ।

—তুমি ছেলেটাকে চেনো নাকি ?

—হ্যাঁ চিনি, আগে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতো—ফ্যাকাশে গলায় শমিতা কথা বললো ।

কি বলবে ভেবে পেল না হর্ষ, ব্যাপারটা তার কাছে কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। তাছাড়া, তাকে যে শমিতা চিঠি লিখেছিল তাকে যেন কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। সেই প্রগল্‌ভা মেয়েটা কোথায় সরে পড়েছে, এখন যে আছে তার মধ্যে চপলতার রেশ মাত্র নেই, অথচ গাম্ভীর্যও নেই মুখের ওপর ছড়িয়ে, বদলে যা আছে তাকে স্থির জলের একটা ছোট্ট ডোবার সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় : একটি শান্ত স্তিমিত ক্লান্তি। এর চেয়ে বেশী কিছু না।

এক টুকরো রোদ এসে পড়েছিল শমিতার কোলের ওপর, শমিতা একটু সরে বসলো।

—তোমার জেলের গল্প করো, আমার শোনবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

কথার সুরে হর্ষ বুঝতে পারলো জেলের কথা শুনতে তার মোটই ইচ্ছে হচ্ছে না, আর তাছাড়া শোনাবার আছেই বা কি? যেটুকু জেনেছে, যেটুকু সে দেখেছে সে অতি সামান্য। অপরের কাছে তার কি মূল্য আছে। সেই সময়কার অনুভূতিটুকু ছাড়া তার নিজের কাছেও তারা মূল্যহীন।

—আজ থাক শমিতা, আজ তোমার কথা বলো। তোমার চিঠি পেয়ে—

—সরে বসো হর্ষ, রোদ লাগছে তোমার মুখে। রোদের দিকে তাকাতে আমার ভারি খারাপ লাগে।

শমিতা এমন হৈচৈ করে কথা বললো হঠাৎ যে, বুঝতে কষ্ট হলো না চিঠির কথায় সে লজ্জা পেয়েছে, ব্যাপারটা এখন সে চাপা দিতে পারলেই যেন বাঁচে।

—চা খাবে? শমিতা চড়ুইয়ের ডাকের মত হাল্কা ক্ষীণ গলায় জানতে চাইল।

—না না। এই দুপর বেলায়—সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সে।

শমিতা মুখ ফিরিয়ে হাই তুললো একটা, মনে হলো তার ঘুম পেয়েছে. বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে হয়ত।

উঠে দাঁড়ালো হর্ষ, এবার যাই।

—সে কি, এইতো এলে?

—তাহোক, আবার আসবো তো।

—হ্যাঁ আর এসেছো তুমি!

—দেখে নিও আসি কি না।

—কাকে দেখতে আসবে?

—কেন, তোমাকে?

—আমি যদি না থাকি?

—ইস্। কোথায় যাবে এর মধ্যে, এত তাড়াতাড়ি সব কি—ঠাট্টা করতে গিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল হর্ষ।

—ধরো যদি মরে যাই? যত সহজ গলায়ই বলুক শমিতার কথাটা তীরের মত এসে বিঁধলো।

কি যেন হয়েছে শমিতার, একটা গুরুতর কিছু, যা সে সঠিক ধরতে পারছে না। কিন্তু কিই বা হতে পারে যার জন্যে এমন পাল্টে যাচ্ছে দিন দিন, চেহারায়, স্বভাবে?

—যা তা কথা কেন ভাবো শমিতা, কোন মানে হয় না ওসব ভাবার।

যদিও মানুষের যে কোন সময়ে মরে যাওয়া সম্বন্ধে তার আর কোন আশ্চর্য লাগে না, শমিতা কেন, সে নিজেও মরে যেতে পারে এই মুহূর্তে।

—না সত্যি বলছি মেঘনা, আমি বোধহয়—

—ওকি, গা বমি-বমি করছে নাকি তোমার ?

—ও কিছু না। ঢোঁক গিলতে গিলতে শমিতা বললো।

—আচ্ছা, তবে আসি ?

—এসো। ছলছলে চোখে শমিতা কপাট খুলে দিল, তারপর নিচু গলায় অচমকা জিজ্ঞেস করলো, ছেলেটার চেহারা ঠিক দেখেছিলে তো, না আমার কথা শুনে—

ঘাড় নেড়ে হর্ষ পা বাড়ালো। সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে যখন পিছন ফিরে একবার ওপরের দিকে তাকালো, দেখলো শমিতা দরজার কপাটে হাত রেখে তারদিকেই চেয়ে আছে।

সেদিন ঘুম থেকে উঠে মনে হলো জীবনে বাঁচার কোন মানে হয় না। নীল আকাশটা তেমনি স্বচ্ছ কাঁচের মত, রোদ্দুরটা তেমনি বেহালার তারের মত বাঁকা হয়ে ঘরে এসেছে। নিমগাছের ডালে সেই পুরনো কাক আনাগোনা করছে, নোতুনবৌদিদের ছাতে ফুল ফুটেছে টবে টবে বর্ষা ঋতুর। পৃথিবীটা একটা বিশাল পদ্মের মত প্রহরে প্রহরে মিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, শুধু হর্ষ আজ মরা মৌমাছির মত পড়ে আছে একা।

কাল বিকালের কথাটা মনে পড়তেই বুকের ভেতর হুহু করে উঠলো, শূন্য মনে হলো, মিথ্যে মনে হলো, বিস্বাদ মনে হলো সব কিছু। মনে হলো পৃথিবীতে কিছুই সুন্দর না, মানুষ নয়, পাখি নয়, গান নয়। সব কুৎসিত, আর গ্লানিতে ভরা, পাঠ্য বই আর পরীক্ষার খাতা।

পৃথিবীতে কেউ জেগে জেগে এসব দেখছে না, এক ফেল করা ছেলে ছাড়া।

মন্দিরা দুধের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে হর্ষ বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়ে কালির দোয়াতটা তুলে নিল পাশের তাক থেকে।

মন্দিরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মা, দাদা কেমন করছে।

—একটি পা এগিয়েছ কি—হর্ষ দোয়াতটা হাতে নিয়ে মন্দিরার কপালের দিকে টিপ করতে থাকলো। মন্দিরা দুধের পেয়ালা নিয়ে ফিরে গেল অগত্যা।

কতোদিন পার হয়ে গেছে ভাবতে বিস্ময় লাগে। আজও নিমগাছের ঝরা ছায়ার নিচে গলিটা তার বিসর্পিল আবর্ত নিয়ে পড়ে আছে সহুরে সাপুড়ের পায়ের তলায় যেন।

খোয়া-ভেংচানো অষ্টাবক্র গলির মোড়ে শ্বাসটানা গ্যাসবাতিটা আজও ভৌতিক পরিধি রচনা করে, যখন শীতের রাতে ধোঁয়া আর কুয়াশা আধাআধি মিশে এক টুকরো অলিন্দ সদৃশ আকাশকে রবার-ঘষা ছবির মত অস্পষ্ট করে তোলে।

ফাগুনের বাতাসে মন কেমন করে ওঠে অকারণে, ঘনবৃষ্টির তানপুরা বাজিয়ে আষাঢ় শ্রাবণের গাঢ় রাতগুলো একটি বাদল শেষের ভৈরবী ধরে একদিন। কাশ-ফুলের মত মেঘ ওঠে হাল্কা বাতাসে দুলে দুলে। গরদের কাপড়ের মত রোদ্দুরে শিউলি ফুলের গন্ধ লাগে, শেষ রাত্তিরের আবছা নীল আকাশে বেজে ওঠে পূজোর ঢাক।

ভাড়াটে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে মনে হয়, জীবনটা কোন অদৃশ্য দেবতার পাটীগণিত, এখানে কিছুই খোয়া যায় না, রূপ থেকে রূপান্তরে ছড়িয়ে থাকে সব। আসলে কখনো আমাদের কাছে দুঃখটা ভারি হয়ে সব কিছুকে ছড়িয়ে ছাড়িয়ে বড়ো করে নামিয়ে আনে, সময় কাটে না, দিনকে দুস্তর মনে হয় তখন, মনে হয় সব মূর্তি সব রূপ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, ফুলের পাপড়িগুলো মরা প্রজাপতির পাখার মত ছড়িয়ে পড়েছে গাছতলায়। পরক্ষণেই খুশী ওঠে ঝিলমিলিয়ে, অদৃশ্য বীজ থেকে অঙ্কুর দেখা দেয়, সবুজ পাতা নিয়ে গাছ ওঠে মাথা উঁচু করে। জীবনের সব আনন্দ হাল্কা মেঘের মত ভেসে ওঠে আকাশে। আসলে সেই অব্যয় পাটীগণিতের নিম্নলঘুকরণ আর উর্ধবলঘুকরণের খেলা। সেই টাকা আনা পাই, আর পাই আনা টাকা। কিছু হারায় না কোনদিন, খোয়াও যায় না। শুধু সুর বদলায়।

সেদিনের ঝাপসা দিনগুলো তাদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ মান অভিমান নিয়ে কোন দিগন্তে ডুবে গেছে। জাতিস্মরের মত মাঝে মাঝে তাদের কথা কোন অলস মুহূর্তে মনে পড়ে। পিছন ফিরে তাকাবার অবসর বেশী নেই, এখন তার সামনে ঋজু আলোয় অন্য সমস্যা, অন্য প্রশ্ন, অন্য আনন্দ।

দুপুর বেলা শেক্সপীয়ারের ওয়ার্কসখানা খুলে বসেছিল হর্ষ, রোজকার মত। বসে বসে ভাবছিল আশ্চর্য হয়ে, কি কাণ্ড করে গেছেন লোকটা। ইংরেজী

ভাষার ব্যাকরণটা পর্যন্ত সুস্থ হয়ে আসে নি যে সময়ে তখন ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে, টকটকে লোহার মত ইচ্ছে মত বাঁকিয়ে চুরিয়ে, ছন্দ পরিয়ে, দ্রুতগতি চড়িয়ে কি যে যাদু করে গেছেন ভাবতে অবাক লাগে। তাঁর একটি ছোট কথাও নিজের ভাষায় লিখতে গেলে আমাদের দিস্তে শেষ হবে, কিন্তু বলা শেষ হবে না।

হর্ষর ভাবাও শেষ হলো না, দরজার কড়া নড়ে উঠলো। বিরক্ত হয়ে কপাট খুলতেই দেখে সুকৃতি, ওর এক সময়কার বন্ধু।

—অনেক কাল পরে যে? হর্ষ হেসে অভ্যর্থনা করলো।

—হ্যাঁ! কিন্তু এসব কি হে?

—কোন সব?

—তুমি আবার ডিটেকটিভ নভেলও লিখেছ নাকি, কই আমাদের জানাও নি তো? দিলেও না এক কপি?

—তুমি জানলে কি করে? হর্ষ উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

—আসে ভাই, সব খবরই আসে, না হয় লেখকই হতে পারলম না, তা বলে—

—ওসব প্যাঁচ খেলা রাখো, ব্যাপারটা কি সত্যি সত্যি তাই বলো।

—কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথে দেখলুম, কিন্তু সে কি তোমারই বই?

বইয়ের নাম শুনে হর্ষ চিনতে পারলো। কিন্তু ছাপা হয়ে ফুটপাথে পোঁছে গেছে, তার মানে বেরিয়েছে অনেক দিন আগেই। অথচ সে এসবের বিন্দুবিসর্গ কিছু জানে না, সুকৃতি না বললে হয়ত জানতোই না।

সুকৃতিকে কোন রকমে বিদায় দিয়েই জামাটা গায়ে চড়িয়ে পাব্লিশারের দোকানে ছুটলো। আপার চিৎপুর রোডের ওপর একটা ছোট্ট দোকান। বারো মিশেলী বইয়ের। গোয়েন্দা থেকে ভূত, ভূত থেকে শুভঙ্কর, অপেরা-যাত্রার নাটক এবং পাঁচালী-বারোমাস্যা সন্ধ্যাবিধি-ব্রতকথা সবকিছুর প্রকাশক।

ভেবেছিল তাকে চিনতেই পারবেন না ভদ্রলোক, কিন্তু ভদ্রলোকের স্মৃতি-শক্তি যথেষ্ট প্রখর, বললেন, আসুন ভাই, আপনার বই দুখানা বেরিয়ে গেছে। আর কিছু লিখলেন?

—না? কিন্তু আমার বইয়ের কপি পাবো তো?

—নিশ্চয়।

পাঁচখানা করে বই বেঁধে দিতে বলে ভদ্রলোক কর্মচারীর দিক থেকে মুখ ফেরালেন, তা আর লিখছেন না কেন, মন্দ হয়নি আপনার লেখা, লিখলে দেবেন আমাদের—

—কিন্তু মাত্র দশ টাকায় লেখা আমার পক্ষে—

—বুঝেছি—ভদ্রলোক ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ, কিছুক্ষণ ঘষা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে

ফিস ফিস করে শুরু করলেন, তাহলে ভেতরের ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি, ঘনশ্যাম বাবুকে যে বই পিছু কুড়ি টাকা করে দিয়ে থাকি তার কারণ আছে। অবশ্য আপনার কানে যখন গেছেই ব্যাপারটা, তখন বলতে দোষ নেই। উনি এই লাইনেরই লোক, রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর কিনা, বুঝতেই পারছেন। আমার বাবার আমল থেকেই উনি আমাদের বই দিয়ে আসছেন...এই সব কারণে—

বইয়ের প্যাকেট দুটো হর্ষর হাতে এসে গিয়েছিল তাই কে এক ঘনশ্যাম-বাবুর লেখক জীবনের গুপ্তকথা শোনবার উৎসাহ ছিল না। চলি চলি ভাব করতেই ভদ্রলোক বললেন, তবে ওঁর এখন বয়স হয়েছে, তেমন লিখতে পারেন না। লিখলেও কপি পড়তে প্রাণান্ত হয়, আর হক কথা বলবো মশাই, সেকেলে লোক, ভাষাটা তেমন আপনাদের মতন খোলে না···যাক আপনাকে তাহলে ওই কুড়ি টাকা করেই দেব, কেমন ?

রেহাই পাবার জন্যে ঘাড় নেড়ে হর্ষ রাস্তায় নাবলো। মুখের ওপর বলতে বাধলো কুড়ি টাকায় তার তেমন কোন লোভ নেই, বারো চোদ্দ লাইনের কবিতা লিখেই সে অমন দশ পনের টাকা পেয়ে থাকে মাঝে মাঝে।

কিন্তু বই একটা আলাদা কথা, সে যত তুচ্ছ বিষয়েই লেখা হোক, যেমন ভাবে কেন না ছাপা হোক। একটা গোটা বই তার নিজের লেখা, মলাট থেকে শুরু করে শেষ পাতাটি পর্যন্ত তারই নামের ঘোষণা, তারই বানানো কথাগুলো ছাপার হরফের প্রতিধ্বনি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শরীর। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় বাড়ির দিকে, নিজের বই এখনো সে নিজের চোখে দেখেনি। মা আর মন্দিরাকে দিতে হবে একখানা করে, কত খুশী হবে তারা।

মন্দিরা আর সে মন্দিরা নেই যে একদিন হর্ষর ভাই সেজেছে সার্ট-প্যাণ্ট পরে, কিংবা সাগতার বাড়িতে সবে শাড়ি পরে যে ছটফটিয়ে বেড়াতো। মন্দিরা এখন আর জোরে হাসে না, ঝগড়া করে না তার সঙ্গে, বেরোয় না যার তার সামনে। নিজের সম্বন্ধে সে এখন অনেকটা সচেতন, জীবনের অনেক রহস্য তার কাছে আলোর মত স্পষ্ট হয়েছে হয়ত, আর তাই মনটা সব সময় বোঝা যায় না। এখন আর সে যা ভাবে তাই বলে বসে না, যা বলে তা হয়ত মোটেই ভাবে না কখনো।

রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করে, বাকি সময়টা তার নিজের টেবিলে বসে বই পড়ে, চুলবাঁধতে বসে হয়ত ভুলে ভুলে গান গেয়ে ফেলেই চুপ করে যায়।

হর্ষর সঙ্গে তার চিন্তার কত তফাত, ভাবনার কত দূরত্ব, অথচ একদিন ছিল যখন গলা ধরাধরি করে একই কথা ভাবতো তারা, একই দুঃখসুখ ভাগ করে নিত দুজনে। কিন্তু আজ আর তা হয় না।

—কিন্তু ও কলেজে যে শুনেছি ছেলেরা আর মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে পাশাপাশি বসে ?

পাশের ঘরে অর্থাৎ বাবার ঘরে মার গলা শোনা গেল হঠাৎ। হর্ষ কান খাড়া করলো বাবা কি বলেন শোনবার জন্যে।

—সেইজন্যেই তো বলছি, দুজনে একসঙ্গে যাওয়া আসা করতে পারবে, মন্দিরার রাস্তায় ঘাটে বেরোনো যে মোটেই অভ্যেস নেই। আর ভেবে দেখলে বইপত্রের খরচও কমে যাবে অনেক—

বাবার কথাটা শুনেই মেজাজ বিগড়ে গেল হর্ষর, ছোট বোনের সঙ্গে এক সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তে হবে শেষ পর্যন্ত! এর চেয়ে অপমানের আর কি থাকতে পারে। ফেল অনেকেই করে, হর্ষই একলা ফেল করে নি গত বছর। সেটা তার মনে ততটা লাগে নি, খারাপ লেগেছে এই পর্যন্ত, কিন্তু আজ পাশ করেই যেন বেশী করে অপমানিত হয়েছে।

রাগে নিজের মাথার চুল মুঠো মুঠো করে ঘাসের মত উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করলো, নাকের উপরে অচমকা ঘুসি মেরে নিজের রক্ত দেখতে ইচ্ছে করলো তার, একবার মনে হলো পেন্সিলকাটা ছুরিটাই বুকের মধ্যে বসিয়ে দেয় চোখ বুজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করলো না, দোতলা থেকে তর তর করে নেমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লো, যেদিকে দুচোখ যায়।

দুচোখ অবশ্য খুব বেশী দূর গেল না, হেদুয়ার ভেতরে গোটা দুই চক্কর লাগাতেই সকাল বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা ঠিক হলো। মনের উত্তাপ কমতেই সুকোমলদার কথা মনে পড়লো। অনেককাল আসেন না সুকোমলদা, চিঠিও দেন না। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ঘটনাচক্রে সুকোমলদার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল হর্ষ, কিন্তু তিনিও ভুলে থাকলেন কি করে। পরীক্ষায় ফেল করার পর থেকে, হর্ষর দোষ নেই, সে কোথাও বেরোতো না। কিন্তু এখন ? এখন সে অনায়াসেই খোঁজ করতে পারে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে। কেন জানি তার কেবলি মনে হতে লাগলো, সুকোমলদা নেই। এমন এক একটা কথা কখনো কখনো আমাদের মনে উদয় হয় যা যুক্তি মানে না। একটা মানুষের একেবারে নেই হয়ে যাওয়া যদিও একটুও আশ্চর্য বলে বোধ হয় না তার কাছে। আজকের দিনের পরিস্থিতি তো সেই রকমই।

কিন্তু দরজাটা খুললেন সুকোমলদা নিজে হাতে। সেই হাসি হাসি মুখ দেখেই হর্ষর বুকের ভেতরটা কান্নার মতন করে উঠলো।

—আরে এসো, এসো। হর্ষর হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

সুকোমলদার মা, তার দূরসম্পর্কের মাসিমা, রান্নাঘর থেকে এগিয়ে এলেন, কে রে, সুকু ?

দুচারটে কুশল সংবাদ জেনে নিয়ে মাসিমা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই সুকোমলদা বললেন, গত বছর তাহলে ফেল করেছিলে ?

লজ্জায় হর্ষ ঘাড় হেঁট করতেই সহাস্যে বললেন, গুড্, এই তো চাই। কবি-সাহিত্যিক হতে গেলে দু-চার বার ফেল করা চাই-ই ।

তারপর দেশী বিদেশী বিখ্যাত পুরুষদের যাঁরা যাঁরা জীবনে একবার অন্ততঃ ফেল করেছিলেন তাঁদের নামগুলি একে একে উল্লেখ করে বললেন, এই জন্যেই ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটির জন্ম হয়েছে : ফেলিয়র ইজ দি পিলার অব সাকসেস, জানো নিশ্চয়ই ।

সুকোমলদার কথা বলবার ভঙ্গিটি বরাবর লক্ষ্য করে আসছে, বড়ো অদ্ভুত। প্রতিটি কথার মধ্যেই চাপা হাসি থাকে, অভ্যাস না থাকলে রসিকতা সব সময় ধরাই যায় না। বোঝাই যায় না কোন কথাটা সহজভাবে বলছেন, কোন কথাটার মধ্যে সত্যিকারের জিজ্ঞাসা আছে। কথা বলাটা সুকোমলদার কাছে বুদ্ধির খেলা এবং হাসবার কৌশল দুই-ই ।

কিন্তু এত হাসির জগতে বাস করলেও, সব সময় হাসির গল্প এবং কথা নিয়ে থাকলেও, কোথায় যেন একটা বেসুরো মোচড় আছে। গভীর দুঃখ না পেলে মানুষ শুধুমাত্র হাসির মধ্যে ডুবে থাকতে পারে না।

কতকাল পরে আবার এবাড়িতে এলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সব আগের মতই আছে কিনা। হ্যাঁ, তাই আছে, এক চুল নড়ে নি যেন। সুকোমলদার ছোট্ট ঘরখানা সেই একই ভাবে সাজানো, দরজায় সেই এক রঙা সবুজ পর্দা। একদিকে লেখার টেবিল, টেবিলের নিচে জমে রয়েছে পুরনো নতুন ইংরেজী বাংলা সব রকমের পত্রিকার স্তূপ। টেবিলের ওপরে লেখার প্যাড, একটা কাঁচের গেলাসে কয়েকটা নানা রঙের নানা ধাঁচের ফাউণ্টেন পেন। একটা পিনকুশন, পেপার ওয়েট, চশমা আর হাত ঘড়িটা একান্নবর্তী পরিবারের মত মুখ গোমড়া করে পড়ে আছে তার পাশে। দেয়ালে কয়েকখানি হাসির ছবি এবং ক্যালেণ্ডার। ঘরের একটি মাত্র প্রমাণ সাইজের জানালাটার দিকে একটা তক্তপোষে বিছানা পাতা। অন্যদিকে একটা ইজিচেয়ার সব সময় পাতা থাকে। ঘরের তৃতীয় কোণে একটি টিপয়ের মাথায় কয়েকটি ওষুধের শিশি, একটি আয়না আর অনেক রঙকরা একটি অদ্ভুত আকৃতির চায়ের কাপ। এইটিই নতুন সংযোজন।

ব্যস, সুকোমলদার ঘরের একটা নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়ে গেল। আর কিছু নেই, আর কিছু থাকাও সম্ভব নয়।

তবু সুকোমলদার যেন কি হয়েছে। শারীরিক তো সুস্থই মনে হয়, যদিও তিনি নিজে বলেন শরীর ভালো নয়। কিন্তু সুকোমলদার কথা তো! মনে হয় অসুখটা তাঁর মনে কোথাও। অথবা অসুখ কোথাও নেই।

বাড়ির সকলেই তাঁর সম্বন্ধে এমন বেশী সজাগ যেটা তাঁদের ঔদাস্যের বাহ্য লক্ষণ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

এত হাসি এত গল্পে সারাদিন সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখলেও, হর্ষ পর্যন্ত বেশ বুঝতে পারে, নোঙর তোলা নৌকোর মত তাঁর অস্তিত্বটা এ সংসারে অনেকটা ভাসা ভাসা। ব্যাকরণের তৃতীয় পুরুষের মত তাঁর প্রতিদিনের ক্রিয়ায় কে যেন একটা অনাত্মীয় বক্রতা পরিয়ে দিয়েছে।

আর তাই তো নিজের ঘর থেকে তিনি বড় একটা বেরোন না, বাড়ি থেকে তো নয়ই। একটা সুস্থ লোক, অন্ততঃ শারীরিক ভাবে, কি করে যে দিন রাত ঘরে বসে থাকতে পারেন, হর্ষ তা ভাবতে পারে না। বাইরে বিকেলের কত রঙ, সকালের কত উত্তাপ, কত ব্যস্ততা, কিছুই তাঁর কাছে উপস্থিত নয়।

—অত চুপ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কিছু ভাবছো নাকি ?

হর্ষ তাকিয়ে দেখলো সুকোমলদা তার দিকে এক পেয়ালা চা বাড়িয়ে ধরে হাসছেন। হাত থেকে সেটি নিতেই সুকোমলদা তাঁর নিজের বিচিত্র কাপটিতে আলগোছে একটু চুমুক দিয়ে বললেন, স্কটিশেই ভর্তি হয়ে যাও। সুন্দর আর ছোট্ট কলেজ, অ্যাটমসফিয়ার ভালো। সাহিত্য চর্চা আর পড়াশোনা দুটোরই সুযোগ পাবে যথেষ্ট।

কিন্তু হর্ষর মনের দুঃখ তিনি বুঝবেন কোথেকে, তাঁকে তো আর ছোট বোনের সঙ্গে এক কলেজে এক ক্লাসে পড়তে যেতে হচ্ছে না! ভারি মন নিয়েই আবার বাড়ি ফিরে এলো হর্ষ।

—যদি স্কটিশেই ভর্তি হও, অনিরুদ্ধদা খাতা দেখতে দেখতে বোঝালেন, তবে দুটো জিনিসের সুবিধে পাবে। এক নম্বর, যেটা সব চেয়ে বেশী দরকারী, বই। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপকদের বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ। আমি নিজে তো রয়েছিই।

হর্ষও মনে মনে ভেবে দেখলো সেই ভালো। কাছে পিঠে যখন এত ভালো কলেজ পাওয়া যাচ্ছে না তখন এখানেই ভর্তি হবে সে। মন্দিরার সঙ্গে এক কলেজে পড়বে, কিন্তু এক ক্লাসে নয়। মাথা খাটিয়ে একটা চমৎকার উপায় বার করে ফেলেছে সে এর মধ্যে। মন্দিরা কি কি কম্বিনেশন নেয় দেখে নিয়ে ঠিক তার উল্টো পথে গেলেই হবে। এ তো আর স্কুল নয় যে—।

আলমারীর কাঁচে একটা চেনা ছায়া পড়তেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাই হবে অনিরুদ্ধদা, এখন আমি আসি।

—সে কি! নতুনবৌদি একেবারে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে, এখুনি যাবে কি ভাই, বসো ?

—না, বাড়িতে কাজ আছে অনেক, পরে না হয় আবার আসবো। নতুনবৌদির দিকে ফিরে না তাকিয়ে বললো।

—পরে ? নতুনবৌদি অবিশ্বাসী গলায় হাসলেন।

ঘরের এক কোণে দোলনাটা একটু একটু দুলছিল। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে হর্ষ আর দাঁড়ালো না, ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে সিঁড়িতে নেমে পড়ল। নতুনবৌদির ওপর থেকে কেন যে তার অভিমান গেল না এখনো। একটুখানি আঘাত দিতে পারলেই যেন তার জিত হয়।

শেষ ধাপে নেমে পিছন ফিরতেই দেখতে পেল নতুনবৌদি সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন কিছু বলবেন।

—শমিতারা ভালো আছে বোধ হয়? একটা আলপিনের মত সূক্ষ্ম হেসে বললেন চোখাচোখি হতেই। হর্ষর পা স্লিপ করছিল আর একটু হলেই। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

বাড়ি ফিরতেই মা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, এই যে হারু, সকাল বেলায় তুই কোথায় বেরোস বল দিকি! বাড়িতে লোকজন এলে আমি কি যে মুস্কিলে পড়ি তার ঠিক নেই—মন্দিরাকে তো আর এখন দোকানে পাঠাতে পারি না।

—বাড়িতে আবার কে এলো আমাদের? মার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো হর্ষ।

সেনেদের বাড়ির অলক এসেছে নিজে থেকে ঠিকানা খোঁজ করে। ও এখন মস্ত বড়োলোক, অথচ কি দিনই না গেছে ওদের। ওর বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন পয়সার অভাবে—ভারি নিশ্বাস ফেলে মা বললেন, অবিশ্যি তুই ওকে দেখিস নি, দেশে যখন গেলি তখন ও কলকাতায়।

অলকদাকে দেখেনি কোন দিন, তবে তাঁর ফটো দেখেছে। দেশে থাকতে অলকদার মা তাকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। বিনিময়ে শুনতেন কলকাতার গল্প, তাঁর ছেলেও কলকাতায় থাকে কি না। যুদ্ধের বাজারে কত কাজ অলকদার, নিয়মিত চিঠিপত্র পর্যন্ত লিখবার সময় পান না। এদিকে এত বড় বাড়িতে একাএকা মায়ের প্রাণটা যে ছটফট করে, ওই একমাত্র ছেলে! কি দরকার ছিল অত টাকা রোজগারের, অলকদার মা বারবার সেই আক্ষেপই করতেন সকলের কাছে, আগে অভাবে ছিলাম কিন্তু মনে তো শান্তি ছিল।

সেইখানেই ছবি দেখেছে অলকদার, মনে পড়লো। রোগা ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, গায়ে ডোরাকাটা ছিটের হাফসার্ট।

খাবার এনে দিয়ে ওপরের ঘরে গিয়ে কিন্তু দস্তুর মত অবাক হয়ে গেল হর্ষ, কোথায় তার ফটোয় দেখা অলকদা। আজকে তাদের ঘরে মাদুরের ওপর বসে যে হৃষ্টপুষ্ট সৌখিন যুবকটি একাএকা একটা মাসিক পত্রিকা ওল্টাচ্ছেন,

দশবছর আগের রুগ্ন মূর্তি অলক সেনের সঙ্গে তাঁর কোনই মিল নেই। সুন্দর না হলেও নিটোল মুখখানায় অতি স্বচ্ছলতার চিহ্ন। ঢেউ খেলানো চুলের দিকে তাকিয়ে মনে হলো টাকা জিনিসটা বয়স এবং বদনাম দুটোই ঢেকে দিতে পারে, যদিও ওদুটোর কোনটাই আপাততঃ হয়নি অলকদার।

বালিশে হেলান দিয়ে জনার্দনবাবু চুপ করে শুয়ে আছেন তাঁর বিছানায়, মাদুরে বসে অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছেন অলক সেন। কেমন একটা অস্বস্তিময় নিস্তব্ধতা। ঘরে ঢুকেই হর্ষ বুঝতে পারলো। বাবার বরাদ্দ কথা শেষ হয়ে গেছে তাই অমন চুপ করে শুয়ে। আজ সারাদিন বসে থাকলেও অলকদার সঙ্গে বাবা আর কথা বলবেন না হয়ত, যদি না অলকদা বাবাকে কোন প্রশ্ন করেন। এই স্বভাবটা খুব খারাপ লাগে হর্ষর কাছে, যেটাকে সাধারণ ভদ্রতা বলে বাবার ব্যবহারে তার লেশ মাত্র নেই। যেই হোক, যত বড় লোকই হোক, বাবা যেই মনে করবেন তাঁর আব বলবার কিছু নেই সত্যিকরে, তারপর আর একটা কথাও বলবেন না গায়ে পড়ে। এই জন্যে কত বড় বড় সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেছে ভাবলে দুঃখ হয় হর্ষর।

হর্ষ ঘরে ঢুকতেই অলকদা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। মা খাবারের প্লেট হাতে ঘরে এলেন একটু পরেই।

—এসব কিন্তু বাজে খরচা হলো মাসিমা। আমি মিষ্টি একদম খাইনে—প্লেট থেকে একখানা নিমকি তুলে নিয়ে অলকদা বললেন।

—আজ অন্ততঃ খাও, কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম বাবা—

মন্দিরা চায়ের পেয়ালা নিয়ে এলো।

—এই আমার মেয়ে, মন্দিরা। আর ঐ হচ্ছে—মা আবার কথা বললেন।

—ওর সঙ্গে আমার এরই মধ্যে আলাপ হয়ে গেছে মাসিমা। হর্ষর দিকে হেসে তাকালেন অলকদা, কিরে যাবি আমাদের বাড়ি না লজ্জা করবে আবার, যা লাজুক ছেলে আপনার—

—যা না হর্ষ, বেড়িয়ে আয় অলকদের বাড়ি থেকে। মা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যেন।

লাজুক অপবাদ ঘোচাবার জন্যেই হর্ষ রাজী হয়ে গেল, তাছাড়া একটা নতুন জায়গা দেখাও হবে, বাড়িতে আর ভালো লাগছে না তার।

হর্ষর সম্মতি পাওয়া মাত্র অলকদা উঠে দাঁড়ালেন, বেশ তাহলে চল যাওয়া যাক। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার, রাত্রের দিকে আমি পৌঁছে দিয়ে যাবো ওকে তাহলে?

—আবার তুমি কেন কষ্ট করে—

—না কষ্ট কি, আজ তো রবিবার, বেড়াতে বেড়াতে চলে আসবো'খন।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মা একখানা ফটো অলকদাকে দিয়ে বললেন, ভুলে যেও না, তাহলে।

হর্ষর মনে হলো মন্দিরার ফটো সেখানা।

—আপনি ওর জন্যে কিছু ভাববেন না মাসিমা, সময় হলে কিছুর জন্যেই আটকাবে না।

ফটোটা পকেটে রেখে অলকদা সিঁড়ি পার হলেন, মা কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তারা গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গলির মোড়ে চকচকে নীল রঙের যে টু-সিটারখানা দাঁড়িয়েছিল সেটা যে অলকদার গাড়ি তা স্বপ্নেও ভাবেনি হর্ষ। রুমাল দিয়ে মুখ ঘাড় মুছে নিয়ে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখলেন অলকদা, একটা মর্ণিং শো দেখে গেলে কেমন হয়?

হর্ষ কিছু না বলে একটু হাসলো শুধু।

বাড়ি গিয়ে পেঁছিতে দেড়টা বেজে গেল। হিন্দুস্থান পার্কে বেশ সুন্দর মাঝারি গোছের দোতলা বাড়ি অলকদাদের। ফলকে পর্ণকুটির লেখা থাকলেও যে কোন লোক অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে পারে কিছুক্ষণ। ছোট্ট একটি ফুলের বাগান সামনে। মোটরের হর্ণ শোনামাত্র চাকর ছুটে এলো কোথা থেকে, দোতলার ব্যালকনিতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো, খয়েরী শাড়ি পরা। হর্ষ ওপরের দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

অলকদা বললেন, চল ওপরে যাই, বাড়িতে তোর বৌদি ছাড়া আর কেউ নেই। লজ্জা কি?

হর্ষ ভাবলো ঐ মেয়েটি তবে কে, যে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিল? ওপরে উঠেই মীমাংসা হলো ব্যাপারটার।

—মেট্রো হয়ে এলাম, আজ একটা ভাল ছবি ছিল। এই দ্যাখ, তোমার সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দিইনি এখন পর্যন্ত।

পরিচয় করিয়ে দিতেই বৌদি হঠাৎ হাতধরে কাছে টেনে নিলেন। লাল কলাবতীর কলির মত রাঙা বড় বড় নখ, দেখে কিছুতেই ফুলের পাপড়ির কথা ভাবতে পারলো না, কাঁটা কাঁটা মনে হলো তার। ঠোঁটটাও লাল, তবে পানের রঙে নয়। চোহারায় খানিকটা উগ্র ভাব। চোখে নীলাভ কাঁচের চশমা।

নতুনবৌদির ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আরো চেনা জানা অনেকের মুখ। মনে মনে প্রত্যেকের ঠোঁটে নখে একবার রঙ মাখিয়ে আবার লজ্জিত হয়ে মুছে ফেললো তৎক্ষণাৎ। মানায় না, কিছুতেই মানায় না! লাল রঙ কাছে আসার রঙ নয়। হর্ষর মধ্যে আবার সেই দার্শনিকটা জেগে

উঠেছে, আবার সেই ছেলেমানুষটা। বড় চৌমাথার লাইট সিগন্যাল মনে পড়ে যায়। হলুদ সবুজ লাল : কোনটাকে তুমি বেশী পছন্দ করো ?

টেবিলে খাবার ব্যবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল, দোকানের খাবারই বুঝি খেতে হয় কাঁটা চামচে দিয়ে। তা হলো না। ভাতেরই ব্যবস্থা হয়েছে, মাংস-ভাত। একসঙ্গে খেতে বসলো তিনজনে, পরিবেশন করলো ঠাকুর। খাওয়ার ব্যবস্থাটাও অনভ্যস্ত হর্ষর চোখে বাধো বাধো ঠেকলো।

খেতে খেতে একসময় কানের কাছে মুখ নিয়ে বৌদি বললেন, আমাকে তুমি বৌদি বলে ডেকো না। পারমিতাদি বোলো।

কথাটা শুনে এত অবাক হয়েছিল যে আর একটু হলেই বিষম খেতো।

খাওয়ার শেষে লক্ষ্য করলো যতটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে সে খেতে বসেছিল তা কোথায় উপে গেছে। বরং আশ্চর্য হবার কথা এই যে, বৌদি অর্থাৎ পারমিতা-দির সঙ্গেই বেশী কথা বলেছে।

বৌদিও খুশী হয়েছেন মনে হলো। খেতে খেতে থেমে থেমে তার সম্বন্ধে যে রকম আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন তাতে গর্বই হলো। শুধু তাই নয়, বৌদি রীতিমত পড়াশোনা করেন, বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে। অলকদা তো বাংলা-সাহিত্যের কিছুই খবর রাখেন না, একমাত্র সিনেমা ছাড়া। অথচ বৌদি হর্ষর দুচারটে কবিতার নাম পর্যন্ত বলে দিতে পারলেন, যেগুলো হালফিল কোন নাম করা কাগজে বেরিয়েছিল।

বৌদি একসময় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন, ছবি আঁকতে পারেন, এসব কথা কিছুকাল পরে জানতে পেরেছে। তবে বৌদি যে অত্যন্ত মজলিশী সেকথা প্রমাণ হয়ে গেল তক্ষুণি। হরিণের মাংস কোন বাজারে সুবিধেয় পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব বসুর তালব্য 'শ' অক্ষরটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে, যাযাবরের আসল নাম কি হতে পারে, পিস্তলের সঙ্গে রিভলবারের তফাতটা কোথায়, অলক সেন এ পাড়ায় কেন অলি সেন নামে পরিচিত হলেন, ওয়ার্ডস্বার্থ সম্প্রতি কাদের ঠোঁটে বর্ষাত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনি ধরণের অসংখ্য বিষয় নিয়ে বৌদি অনর্গল কথা বলে গেলেন। হর্ষর একবারও মনে হলো না, যে বাজে কথাগুলি নিয়ে সে এত মেতে উঠেছে তারা পরস্পর কত খাপছাড়া, কত অসম্বদ্ধ।

হঠাৎ অলকদার কথা মনে পড়তেই লজ্জা পেল হর্ষ, যাঁর সূত্রে এবাড়িতে তার আসা তাকেই একদম ভুলে গেছে সে।

তাকিয়ে দেখলো বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে শুয়ে শুয়ে কি একটা বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেছেন অলকদা, মুখের পাইপটা থেকে একটা নীলাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে তাঁকে ঝাপসা করে দিয়েছে।

খুব একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করতো প্রথম প্রথম। স্কুলের সঙ্গে কলেজের এই তফাত। নিরুদ্যম মনেই প্রতিটি ক্লাস করে। রোল নাম্বার অনুযায়ী যথাযথ বসে। অথচ পাশের ছেলেটির সঙ্গেও যে বন্ধুত্ব করবে, কি নিছক মৌখিক একটা নামজানাজানির পরিচয় জমাবে, সে উৎসাহও পায় না হর্ষ। বরং কৃত্রিমভাবে বসে থাকতে হয়, সচেতন ভাবে, স্বস্তিহীনভাবে। যত না ছেলে তার অর্ধেকই মেয়ে। প্রফেসার না আসা পর্যন্ত বড়ো লজ্জা করে তার।

শুধু ইংরেজী কবিতার ক্লাসটা ভালো লাগে সব চেয়ে। পাঠ্য কবিতা পড়াতে পড়াতে শেলী-সুইনবর্ণ-ইয়েটস্-এলিয়টের ইন্দ্রলোক এসে পড়ে প্রসঙ্গত। কবিতার উজ্জ্বল স্তবকগুলি আবৃত্তি করে চলেন অধ্যাপক, সমস্ত ক্লাস স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। চোখে মুখে আনন্দের এক নির্মল উদ্ভাস কিংবা হয়ত ঠিক তা নয়, বাইরের সবুজ ঘাসের লন্ পেরিয়ে রোদ্দুরের আভা এসে পড়েছে তাঁর চশমার কাঁচে।

আপাঙ্গে একবার তাকে দেখেন অনিরুদ্ধদা, অথবা দেখেন না। কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মনে হয় মরলোক ছড়িয়ে গেছেন তিনি। কল্পনায় আর একটা দূরের ছবি ভেসে ওঠে। কোথায় পর্দাফেলা জানালার নিচে খাটের আলসেয় সুগন্ধ চুলের রাশ ঢেলে দিয়ে দুটি পালকের মত নরম চোখ বুজে এসেছে, তখনও সিকিপাতা ওল্টানো উপন্যাসখানা হাত ছড়ানো অসতর্ক বুকের ওপর আলগোছে উপুর করা রয়েছে। দোলনা দুলছে ঘরের মধ্যে বাতাসে। একটি ছোট্ট প্রাণের পেণ্ডুলাম। আজ আর খারাপ লাগলো না হর্ষর, বরং ভালো লাগলো, অপূর্ব বলে মনে হলো। পারমিতা বৌদির আঁকা ছবিগুলোর মত, এক একটি রেখা আশ্চর্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য রেখাকে, একটা অদৃশ্য গল্পের দিকে। এইতো জীবনের গোপন রহস্য, গহন মিল। যে আছে অপেক্ষা করে তার, পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর। অথচ সত্যি করে কি কেউ অপেক্ষা করে থাকে কোথাও ?

কি যা তা ভাবছে, হর্ষর ভয় হলো, হয়ত ছোট কাকার কথাই সত্যি হবে, বড় হয়ে পাগল হবে সে। সত্যি, এই কথাটা মনে হলেই আজকাল তার ভয় হয়, মনে হয় একটা অন্ধকার নেমে আসছে তার জীবনের ওপর, তার দিনের আলোর ওপর, কবিতার মত ভালোলাগার বেদনা ভরা মুহূর্তগুলোর ওপর।

মার রক্ত ছড়িয়ে আছে তার শরীরে, নিস্তার নেই, কোন নিস্তার নেই তার। কোথায় পালাবে সে, তার রক্তের মধ্যেই রয়েছে তার শত্রু, তার রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে তার অপমৃত্যু।

কোন কোন সময় আজকাল মার চোখের দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা চমকে ওঠে। মা বসে আছেন, চুপ করে, দুটো চোখে কেমন যেন একটা শূন্যদৃষ্টি, অর্থহীন কিন্তু বরফের মত কঠিন, শীতল, তীক্ষ্ণ। কেন যেন মনে হয় কিছুই ভাবছেন না মা, কিছুই ভাবতে পারছেন না এই মুহূর্তে, সমস্ত চেষ্টা পিছলে পিছলে যাচ্ছে ক্রমাগত। এই সময় শুধু যদি একটু ভাবতে পারতেন, কাছের, খুব কাছের কিছু যদি মনের মধ্যে আঁকড়ে ধরতে পারতেন, তাহলেই বেঁচে যেতেন মা।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে হর্ষ পিছনে দাঁড়িয়ে, মাকে ডেকেছে, একবার, দুবার, তিনবার। কিন্তু মা শুনতে পাননি তক্ষুণি। তারপরে আবার সহজ হয়েছেন মা, হাসতে পেরেছেন, কথা বলেছেন আগের মত। কেন এমন হলো মার, কে এর জন্যে দায়ী ? বাবা ? সে নিজে ? না কি সকলেই, সমস্ত সংসারটাই।

—আপনাকে একখানা নিতে হবে।

হর্ষ চমকালো, তাকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কথাটা। পাশেই বসেছিল ছেলেটি, হাতের পত্রিকাখানা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। পত্রিকাখানা নিতে হলো হাতে।

—কতো দাম ? পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ছেলেটার চোখে চোখ ফেললো হর্ষ। গোল ভরাট মুখ, ঠোঁট দুখানায় একটা ছেলেমানুষী ভাব, কমনীয় ঘুম-পাওয়া চেহারা। শিউলিকে মনে পড়িয়ে দেয় চশমা থাকা সত্ত্বেও।

—মাত্র দু-আনা। প্রশ্নের উত্তর আসে।

পকেট হাতড়ায় হর্ষ। ইস্।

মুখের হতাশ ভাব পরখ করে ছেলেটি বলে, পরে দেবেন, কাল।

হর্ষ অবশ্য আজই দিতে পারতো, টিফিনে মন্দিরার সঙ্গে দেখা হলেই। ওর হাতব্যাগটা অতটা শূন্য থাকে না তার পকেটের মত। কিন্তু সে অসম্ভব। কলেজে মন্দিরার সঙ্গে কথা বলতে ভারি লজ্জা করে, বাড়ি ফেরবার সময়ও কলেজের কাছের পথটায় কেউ কারো দিকে তাকায় না, কথা বলে না, মন্দিরা তাকালেও হর্ষ চিনতেই পারে না।

—আমরাই বের করি পত্রিকাটা, ছেলেটি শান্ত গলায় বললো।

—এতে আপনার লেখা আছে নাকি, মানে আপনি লেখেন নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ।

—কবিতা ? অন্তরঙ্গ গলায় হর্ষ জিজ্ঞেস করে।

—উহুঁ। বিলম্বিত হাসে তার দিকে তাকিয়ে।

—নামটা আপনার—

—তপন দাস।

ইতিহাসের ক্লাস, গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনে প্রফেসার ব্যস্ত। হর্ষ এক নিশ্বাসে তপন দাসের ছোট গল্পটা পড়ে ফেললো। একটু কাঁচা লেখা, কিন্তু সুন্দর। সুন্দর এইজন্যে যে নতুন ধরণের। নাঃ, ছেলেটা লিখতে পারবে মনে হয়।

হর্ষ খুশীভরা চোখ নিয়ে তপনের দিকে তাকালো।

—কেমন ? তপন জিজ্ঞেসা করলো মুচকি হেসে ?

—বেশ সুন্দর লিখেছেন। হর্ষও হাসলো।

—বেশ বললে। রহস্যতবল গলায় আলাপটাকে তুমির ব্যাসার্ধে টেনে আনলো এক মুহূর্তে।

—কিন্তু সত্যিই—সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে হর্ষ।

—তুমি লিখতে পার না ?

—পারি।

—একটা লেখা দিও, আমাদের কাগজে ছাপিয়ে দোব।

ছাপিয়ে দেবে, হর্ষ মনে মনে হাসলো। হর্ষর নামটা যদি তপন জানতো তাহলে আর একথা বলতো না। ক্লাসের জানালায় কাক ডাকছে একটা। বাইরে কৃষ্ণচূড়ার মত নীল রোদ্দুর। দেবদারুর পাতা চিক-চিক দুপুর। হঠাৎ কার কথা মনে করিয়ে দেয়। কার মুখ।

শেলফটা ভরে উঠেছে হর্ষর। মা বলেন ভয় ভয় গলায়, শ্বশুরের রোগ ধরেছে ছেলের। তিনিও বই কিনে কিনেই গেলেন, আবার এরও দেখছি সেই একই রকম সকম। ভাবনা হয়।

হর্ষর ভালো লাগে কথাটা শুনতে, সত্যিই কি সে ঠাকুর্দার মত হতে পেরেছে? ঠাকুর্দাও নাকি লিখতেন, পোকায় কাটা পাণ্ডুলিপি দেখেছে দেশের আলমারীতে। ছাপা অক্ষরের মত সুন্দর হাতের লেখা। ঠাকুর্দাকে সে দেখেনি কিন্তু অনুভব করেছে, এখনো করে। ঠাকুর্দা, তোমাকে আমি দেখতে পেলাম না, আমার আসবার আগেই তুমি চলে গেছ, অনেক অনেক আগে, কিন্তু আমার জন্যে তোমার স্বপ্নটা রেখে গেছ তুমি। আমি কি পারবো, পারবো কি তোমার মত হতে ?

লিখে আজকাল যে কটা টাকা পাই, হর্ষ ভাবলো ঠাকুর্দা কানপেতে তার এই ভাবনা শুনতে পাচ্ছেন, তা দিয়ে আমি তোমারই মত বই কিনি, তুমি যেমন রাত জেগে পড়তে, আমিও তেমনি পড়ি। এক এক সময় মনে হয়

আমার মুখের ওপর একটা সমুদ্র দুলছে, একটা বিদেশী গল্পের ঝোড়ো সমুদ্র, প্রতিটি অক্ষরের গমকে গমকে যেন তার নুন ছড়ানো। আর নাকের কাছে খোলা বই নিয়ে যখন শুয়ে থাকি তখন আমার মনে হয় কাগজের সুগন্ধ পাচ্ছি না, পাচ্ছি একটা অন্য যুগের গন্ধ, অন্য চিন্তার গন্ধ, অন্য দেশের। ঠাকুর্দা, সেই মুহূর্তগুলো আমার কাছে সব চেয়ে দুর্লভ, হ্যাঁ সেই মুহূর্তগুলো, কারণ তারা পলকের জন্যে ধরা দিয়েই সরে যায়, মাথা খুঁড়লেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের। আর তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা হয় যখন শুনতে পাই, সারাজীবন দুহাতে টাকা রোজগার করেও তুমি কিছু রেখে যাওনি। তুমি মারা গেলে জানা গেছে এক পয়সা রেখে যাওনি তুমি, এক পয়সার ঋণও না। তোমার বিরাট পোষ্য পালিত পরিবারে যখন তিন খানা থালা আর দুটি কাঁসার গেলাস নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গেছে তখনই তোমার দেব চরিত্র ধরা পড়ে গেছে আমার কাছে। তুমি একা এসেছিলে এই বংশে, একা চলে গেছ, আমি একলব্যের মত বসে বসে ভাবছি, আমি কি কোন দিন হতে পারবো তোমার মত ?

জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো হর্ষর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রেষ্ঠ বয়স। দুপুরটা কাটে কলেজের খোয়াভাঙা রাঙা উঠোনে, টেনিস-লনের কদম ছাঁট সবুজ ঘাসের জাজিমে, লাইব্রেরী ঘরের নির্জন টেবিলে। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ক্লাস, একটা জমজমাট ভাব নিয়ে। দেয়ালের বুকে ঝোলা প্রকাণ্ড ব্ল্যাক বোর্ডকে পশ্চাৎপট করে প্রফেসারের প্রচণ্ড মূর্তিটা নাটক করে যায়। অর্থহীন আবেগে, যন্ত্রের মত নির্ভুলভাবে, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার একই চরিত্রের একই ভূমিকা গ্রহণের মত, বৈচিত্র্যহীনভাবে। দশবছরের, কেউ পনের বছরের ধৈর্য নিয়ে একই কথা বলে চলেছেন, একই উপদেশ, একই নোট, একই তিরস্কার। গ্রামোফনের ফাটা রেকর্ডের মত ঘুরে ঘুরে এক একটা ইয়ারের ডিস্কে একটা লাইনের একটা পঙ্গু অক্ষর ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছে যেন। জুলাই মাসের উপদেশ, এপ্রিলের সতর্কতা প্রতিবছরেই অক্ষরে অক্ষরে এক, শুধু নতুন ছাত্রছাত্রী, নতুন মনোযোগ এই তফাত।

মেয়েদের দেখলে মায়া হয় হর্ষর, জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়েই এরা কত সিরিয়াস, কেমন অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি ব্যাপার ভাবতে পারে। সব সময় পাকাপাকি বন্দোবস্ত, সবসময় পরিণাম চিন্তা; গাছের কথা যদি কখনো ভাবে একেবারে ফলের কথাই ভাবে, নইলে ভাবেই না। জীবনটা আগাগোড়া একটা কঠিন চুক্তি, কঠিন না হোক চুক্তি অবশ্যই। লাভালাভ না খতিয়ে একটি কথাও খরচ করা তাদের ধর্ম নয়। আর তাই প্রতিমুহূর্তে ঠকে যাচ্ছে তারা, কিছু না কিছু হারাচ্ছে; একটা তাসের ওপরেই সারা জীবনের বাজী ধরে বসেছে যে, তাকে বাঁচাবে কে।

জীবনটা যে একটা খেলা, একটা আনন্দ, একটা শিহরণ, অতটা হাল্কা করে তারা ভাবতে পারে না। আকাশে যে রং আছে, রোদ্দুরে যে একটা মোহময় গন্ধ আছে, প্রতিটা মুহূর্তের চেতনা যে মাটি জল আকাশকে স্পর্শ করে যাচ্ছে, বাতাস যে অনুভূতি কাতর, স্পর্শকাতর, এত কথা তাদের অজ্ঞাত। তারা একবার ভুলেও ভাবে না, পৃথিবীর বাতাসটা যদি তাদের ভাবনার মত ভারি হতো, তাহলে কবে এই পৃথিবীর পরমায়ু ঘুচে যেত, আলোটা যদি অতটা হিসেব করে চলতো, গাছপালা যদি অতটা গম্ভীর হয়ে উঠতো তাহলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না হতো।

প্রফেসার ক্লাসে এসে রোল কল্ শেষ করবামাত্র ভ্যানিটি ব্যাগ খোলার সারিসারি শব্দ হয়, খাতার পাতা দ্রুত গতিতে উল্টে যায়, একরাশ শুকনো পাতা মাড়িয়ে দিয়ে যেন একটা শীতল সরীসৃপ বাসনা বিদ্যুত গতিতে এগিয়ে গেল।

হর্ষ ভাবতে পারে না সঞ্চয়ের দিকে মেয়েদের এত নজর কেন, অধ্যাপকের লেকচারের প্রতিটি অক্ষর হুবহু খাতায় তুলে কি লাভ হয়। এক এক সময় মনে হয়েছে একবার উঁকি মেরে দেখে এত কি লিখছে। সারাটা পিরিয়ড বসে বসে হর্ষও তো শুনছে, কই এমন কথা তো এত কিছু পাওয়া যায় নি যা লেখা যায়। নাকি খাতার পাতায় ছবি এঁকে চলেছে, কবিতার লাইন লিখে চলেছে, একটার পর একটা নাম লিখে চলেছে? আবার এক এক সময় মনে হয়েছে প্রফেসারের হাই তোলাটা পর্যন্ত বোধ করি রেহাই পেল না ওদের খাতায়, হয়ত অনুরূপ একটা অব্যয়ীভাব কালির আঁচড়ে ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু একটা দুটো ব্যতিক্রম আছে, যাদের হাতে এবং চোখে মিল নেই, কথায় এবং কাজে পাল্টাপাল্টি সম্বন্ধ। তেমন দু-একটা মেয়ে আছে বৈকি ক্লাসে। তারা বেণী সর্বস্ব মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে বসে থাকে না, নোট নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তাদের চোখ অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে ওঠে, হাসিটা মুছতে চায় না ঠোঁট থেকে।

মেয়েটি আবার তাকালো, আড় চোখে নয়, একেবারে স্পষ্ট করে, নির্ভুল ভাবে। চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো কিছু যেন বলতে চায়। ঠোঁটে একটুক্‌রো হাসি।

হর্ষ তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল, তপন পাছে লক্ষ্য করে। কিন্তু মনটা সরিয়ে নিতে পারলো না। বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করে আসচে মেয়েটি তার দিকে তাকায়, এবং তার দিকেই তাকায়। কিন্তু কেন, কি একটা উদ্দেশ্য আছে যেন এই তাকানোর মধ্যে।

—বোঝ ঠ্যালা! হঠাৎ তপন স্বগতোক্তি করে উঠলো, এ যে আলাপ না করে ছাড়বে না দেখছি।

একটু চমকে গিয়েই হর্ষ তপনের মুখের দিকে তাকালো, তপন কিন্তু ভাব-লেশহীন মুখে কি একটা উপন্যাসের পাতায় হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, দেখে মনেই হবে না সে কথা বলেছে, এবং বললেও তাকেই লক্ষ্য করে বলেছে। কিন্তু তপনকে চিনতে তার আর বাকি নেই। ওর বাইরেটা আর ভেতরটা পরস্পর বিরোধী পলিটিক্যাল পার্টির মত, কোন মিল নেই গরমিল ছাড়া। শরীরটা যেমন ঢিলে ঢালা আয়েস করা ওর নিজেরই ঢোলা পায়জামা আর গিলে করা পাঞ্জাবীর মত, শিথিল গতিতে ধীরে ধীরে ও যেমন হাঁটে, কথা কয়, ভেতরটা তা নয়। অতটা ননীর শরীর নয়, বরং ও যা কষ্ট সহ্য করতে পারে খুব কম ছেলেই তা পারবে বলে হর্ষর বিশ্বাস। বাইরে থেকে তেমনি ওকে যতটা গম্ভীর আর ঘুম পাওয়া মনে হয় ভেতরে ও ততটাই রসিক আর সজাগ। যতটা দায়িত্বহীন মনে হবে তার চেয়ে ঢের বেশী গভীর ও কাজের বেলায়।

তাই আরক্ত মুখে হর্ষ ওকে জিজ্ঞাসা করলো, কার কথা বলছিস?

—তার কথা বলছি, যার কথা এক্ষুণি ভাবছিলি তুই।

—বাজে কথা।

—যদি তাই হয় তবে অনেক দিনের বাজে কথা, তা বলতেই হবে।

—মানে?—হর্ষ বিস্ময়ের ভান করে তাকায়।

বইটা একটু শব্দ করে বন্ধ করে তপন বলে, মেয়েটার চোখে কেমন একটু উসখুস ভাব, অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি আমি। তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায় ও, বোধহয় তোর লেখাটেখা পড়ে—

কনুইয়ের একটা গুঁতো মেরে চুপ করিয়ে হর্ষ আবার বললো, ধ্যেৎ বাজে কথা।

—দুনিয়ার কোনটা বাজে কথা নয়?

—কেন ওকি চায়? কৃত্রিম ক্রোধের ভান করে হর্ষ জানতে চায়।

—হয়ত, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, এই কথাই নতুন করে জানাতে চায়।

—ফাজলামি রাখ। আমার কি মনে হয় জানিস?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় তপন, ওর হাল্কা ভাব কোন সময়েই বেশীক্ষণ থাকে না।

—কি?

—মেয়েটি আমার কোন আত্মীয়, খুব দূর সম্পর্কের—

—অথচ তুই চিনিস না?

—দেখিনি কোনদিন, শুনেছি আমাদের সঙ্গেই পড়ে।

—স্বাভাবিক। তাহলে আর ভাববার কি আছে?

কিন্তু ভাববার কিছু নেই কেন, সেইটাই তো হর্ষর কাছে বেশী ভাববার। পারমিতাবৌদির বোন অথচ একটুও মিল নেই দিদির মুখের চেহারার সঙ্গে।

তপনকে আত্মীয় বললেও কোন আত্মীয়তাই নেই মেয়েটির সঙ্গে, অথচ সে আলাপ করতে চাইছে, কথাটা উড়িয়ে দেবে কি করে হর্ষ।

শেলফটা রবিবারের সকালে গুছোতে গিয়ে মনে পড়লো কথাটা।

সেদিন পারমিতা বৌদি নিজেই কথাটা তুলেছিলেন, আর একটু আগে যদি আসতে—

—তাহলে কি হতো পারমিতা দি?—কৌতূহলী চোখে তাকালো হর্ষ।

—লতিকা এই একটু আগে চলে গেল, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে বসেছিল সে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তোমার কবিতার বইটা পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার খুব ইচ্ছে হয়েছে ওর।

একটু চুপ করে থেকে হর্ষ বললো, আপনার বোনের কিন্তু মোটেই আপনার মত চেহারা নয়।

—কি করে জানলে তুমি? বৌদি অবাক হলেন।

—ক্লাসে দেখেছি।

—তাই নাকি। লতিকাটা তো আজকাল ভারি দুষ্টু হয়েছে, আমাকে একবারও বললে না যে তোমাদের আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

—না তা অবশ্য হয়নি,—হর্ষ মাথা চুলকে বললো।

—তবে? অবিশ্বাসী চোখে বৌদি তাকালেন।

—মুখ চেনা হয়েছে এই আর কি। আপনার চেহারার সঙ্গে কিন্তু... প্রথমটা ভাবতেই পারিনি।—হর্ষ হাসলো।

—আমার আপন বোন তো নয়, বুঝতেই পারছো আমার কাকার মেয়ে... বৌদি খুশী হয়ে বললেন—হ্যাঁ ভালো কথা, কি একটা দেয়াল-পত্রিকা বার করেছো নাকি কলেজে, নিয়মিত বেরোয়?

—'ভাষণে'র কথা বলছেন? নিয়মিতই বেরোয়, প্রতি সোমবার। আমি আর আমার এক বন্ধু দুজনে মিলে বার করি পত্রিকাটা। কার কাছে শুনলেন?

—কার কাছে শুনবো আবার লতিকা ছাড়া—বৌদি চশমাটা আঙুলদিয়ে যথাস্থানে নিবিষ্ট করতে করতে হেসে ফেললেন, ওর কাছ থেকেও লেখা চেয়ো কিন্তু, ও বেচারি তো আর নিজে থেকে—

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তা উনিও যে লেখেন জানতুম না তো।

—না উনি লেখেন না অবশ্য।

—তবে?

—তবে ও একটু আধটু লিখে থাকে।

বৌদির ঠাট্টায় হর্ষ ভারি লজ্জা পেলো। শেলফ গুছোতে গুছোতে সেই লাল আভাটাই আবার যেন ফিরে এলো তার মুখে।

সোমবারে স্টাফ্‌রুমের সামনের টেবিলে বসে প্রতি সপ্তাহের মতই ভাষণের আসন্ন সংখ্যার লেখাগুলি সাজিয়ে নিয়ে বোর্ডে স্ক্রু অাঁটছিল, দুজনের হাতে দুটো তামার পয়সা স্ক্রু-ড্রাইভারের পরিবর্তে।

এমন সময় সুইং ডোর ঠেলে সেই মেয়েটি ঢুকলো।

তপন নিবিষ্ট মনে স্ক্রু অাঁটতে অাঁটতে স্বগতোক্তি করলো, তাহলে হয়ে যাক।

মেয়েটি চেনা চোখে একবার হর্ষর দিকে কটাক্ষপাত করে হলের দিকে পা বাড়ালো, বুকের কাছে বই খাতাপত্র উঁচু করে ধরা।

স্টাফরুমের সামনেটা তখন নির্জন। দারোয়ানটা দূরে একটা টুলের ওপরে বসে ঝিমুচ্ছে। হর্ষ তৈরি হয়ে ছিল মনে মনে। তপনকে শুনিয়ে আস্তে গলায় বললো, লতিকা গেল।

তপন হাতের কাজে আরো ব্যস্ত হয়ে বললো, তুমিও যাও।

—যাবো ?

—তাইতো বলছি।

চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কি বলবো ?

—যা মুখে আসে। তপন মুচকি হেসে তাকালো।

হর্ষ এগিয়ে গিয়ে বললো, এই যে শুনছেন ?

মেয়েটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—কি বলুন ? মেয়েটা শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

—অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবো ভাবছি···মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে আর বিশেষ উৎসাহ পেল না হর্ষ।

মনে হলো মুখের রঙ বদলে গেল মেয়েটার, চিবুকটা ছুঁচোলো হয়ে উঠলো শক্ত হয়ে।

—আলাপ? আমার সঙ্গে? হঠাৎ?

হঠাৎ কথাটা এত নিষ্ঠুরভাবে বললো যে মনে হলো হর্ষর একটা আঙুল দরজার কপাটের ফাঁকে পড়ে থেঁতলে গেল।

—আমাকে চিনতে পারলেন না—হর্ষ শেষ চেষ্টা করলো আত্মরক্ষা করবার।

—দেখুন, আপনি বোধহয় ভুল করেছেন—মেয়েটা আর দাঁড়ালো না।

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো, মনে হলো মেয়েটা চাবুক মেরে চলে গেল তাকে। জীবনে এমন অপমান তাকে আর কেউ করেনি। হর্ষর ঘোরতর সন্দেহ জাগলো এই মেয়েটাই লতিকা কিনা। কিন্তু লতিকা হোক আর নাই হোক, এক ক্লাসে তো পড়ে; শুধু কি তাই, তার দিকে যে অমনভাবে তাকায় ক্লাসে বসে, সেই আবার তাকে চিনতে পারবেনা এতটা অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করতেও তার দুঃখ হয়। কেন এমন হলো কিছুতেই বুঝতে পারলো না হর্ষ। এমন সময় পিছনে হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে তপন হাসছে হিঃ হিঃ করে।

কাছে গিয়ে রাগে ফেটে পড়বার আগেই তপন বললো, স্যাম্পেল দেখলি তো, এই হচ্ছে মেয়ে। বলেই আবার হাসলো প্রাণ ভরে হিঃ হিঃ হিঃ—

—হাসছিস কেন বোকার মত। হর্ষ ধমক লাগালো, নিজের হলে বুঝতিস।

কাজের চাপ বেড়ে গেছে হর্ষর। কলেজের পড়াশুনার বাইরে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। পূজো এসে গেল। তপনটা পালিয়েছে দার্জিলিংয়ে. তার একলার ঘাড়ে 'ভাষণ' এর ভার চাপিয়ে। এসময় তার এত কি প্রয়োজন ছিল ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার, হর্ষর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে।

দুটো আড়াইটের আগে রাত্রে বিছানার স্পর্শ পায় না। ভোরে উঠতে পারে না বেচারী, সে বিলম্বটুকু পুষিয়ে নিতে হয় রাত জেগে। পূজো এসে গেল অথচ একবার ভালো করে শরতের আকাশের দিকে তাকাবার সময় পেল না, দুপুর বেলায় দেবদারু গাছটার ঢেউ তোলা পাতাগুলো ঝিকিয়ে উঠলো তার চোখের আড়ালেই।

অফ্ পিরিয়ডগুলো, এমন কি ক্লাস কামাই করেও তাকে লাইব্রেরীতে কাটাতে হয় আজকাল। প্রতি সপ্তাহে রাশিরাশি 'ভাষণে'র লেখা আসে, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। নতুন লেখক লেখিকা, কাঁচা লেখা। শুধু পড়লেই চলে না, কলম চালাতে হয়। আবার সেগুলো নীল কাগজে সুস্পষ্ট করে কপি করতে হয়। 'ভাষণ'কে কেন্দ্র করে কলেজে যে একটা নিয়মিত পাঠক এবং লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠবে, এমন যে সাড়া পড়ে যাবে, নতুন নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রী মহলে যে এতটা উৎসাহের সঞ্চার হবে আগে থেকে ভাবতে পারেনি হর্ষ। পত্রিকাটির একদিন বেরোতে দেরি করলেই কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়। আর সেই জন্যেই এই মোহ ছাড়তে পারছে না হর্ষ। নিজের লেখার ক্ষতি করেও দিনরাত এই নিয়ে পড়ে আছে।

পূজো এসে গেল, আর সেই জন্যেই হয়েছে যত বিপদ। কলেজ ম্যাগাজিনের প্রকাশের সময় হয়ে এলো, প্রেসে যেতে হচ্ছে নিয়মিত। পূজো সংখ্যার লেখার তাগিদ আসছে অনেক জায়গা থেকে। এর ওপর আবার নতুন একখানা উপন্যাস জুড়েছে হর্ষ। সেটি থার্ড ইয়ারের মধ্যে শেষ করতে না পারলে আর হয়ত শেষই হবে না। ফোর্থ ইয়ারটা কুমোরের চাকের মত দেখতে না দেখতে ঘুরে যাবে, প্রিটেস্ট, টেস্ট আর ফাইনাল, একটা পেরোতে না পেরোতেই আর একটা।

জীবনটাই তো একটা পরীক্ষা, অলকদা বলেছিলেন কথাটা। হ্যাঁ, সেই পরীক্ষাই এগিয়ে আসচে তার জীবনে। বেশ বুঝতে পারছে বি-এ পরীক্ষার পর রেজাল্ট আউট হতে যে কটা দিন বাকি সেই কটা দিন শুধু তার ছুটি।

তার পরই ধর্মতলা কিংবা ডালহৌসির বড় ফটকওলা কোন একটা বাড়ির মধ্যে তাকে ঢুকে পড়তে হবে।

ইচ্ছে ছিল এম-এটা পড়বে। এবং পরে একটা প্রফেসারী জুটিয়ে নেবে সুযোগ বুঝে। তাহলে লেখার নেশাটা বজায় থাকবে সারাজীবন। নইলে, স্বপ্ন ভেঙে যাবার অসুখী ইতিহাস ঢের জানা আছে তার। যাঁদের দীর্ঘ-নিশ্বাস এখনো শুনতে পায় যেখানে সেখানে।

কিন্তু বাবার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, বাবা মন স্থির করে ফেলেছেন। আর সময় দিতে রাজী নন, হর্ষ বিলম্ব করেছে যথেষ্ট, ফেল করেছে, দেশে গিয়ে নষ্ট করেছে দুবছর, এখন আর তার জন্যে একটা দিনও উদ্বৃত্ত নেই, একটা মুহূর্তও না।

জনার্দনবাবুকে চেনে হর্ষ। এই জনার্দনবাবু তার বাবা নন, তার বাবা মরে গেছেন তাদের দেশে যাবার পরদিন থেকেই, হয়ত সেইদিন থেকেই, শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই। তার বদলে জনার্দনবাবু নামে একটি লোক এগিয়ে এসেছিলেন; শ্বাসরোগীর মত তাঁর মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে। একদিন তাঁর কাছে আদর্শ ছিল বড়ো, আজ পলায়নের পথটা। এই চাকরী ছেড়ে, এই সংসার ছেড়ে কাপুরুষের মত, স্বার্থপরের মত, শত্রুর মত তিনি পালিয়ে যাবেন।

হর্ষর শত্রু হর্ষর বাবা, বাবার একটা অংশ যিনি জনার্দনবাবু। কিংবা হয়ত প্রাণী জগতে পিতাপুত্রের সম্বন্ধটাই শত্রুর সম্বন্ধ। একজনের হাতে আর এক জনকে মরতেই হবে কারণ জন্মের মধ্যেই মৃত্যুর বীজ থাকে লুকানো। একজনকে মরতেই হবে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, হয় সোহরাব নয় রুস্তম, একজনের হাতে আর একজনের মৃত্যু অনিবার্য। বৃন্দাবনের হাতের চাবুক ধারালো ইস্পাত হয়ে ঝলসে উঠবে একদিন।

এই জনার্দনবাবুর কাছে পড়াশুনো বিলাসিতা। যদিও সে বিলাসিতার সুযোগ তিনি যথেষ্ট দিয়েছেন, আর নয়। যে সময়টা তিনি নীরবে অপেক্ষা করেছেন, সেই সময়ের মধ্যে শুধু এম-এ কেন, এম-এ, পাশ করেও সাত আটটা বছর একটি ছেলে হাত পা কোলে করে স্রেফ ইজি চেয়ারে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারতো। না, আর নয়। এই ছেলেটি একটি জীবন্ত বিলম্ব, একটি মূর্তিমান ব্যর্থতা! এ আসতে দেরি করেছে এবং এসেও দেরি করছে। আর, একটা ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে জনার্দনবাবু তারই সামনে একপায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন, চলচ্ছক্তিহীন হয়ে। ছেলেটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসুস্থ মনোবৃত্তি নিয়ে পদ্য লিখছে আর প্রত্যাশা করছে তিনি তাকে আরো সময় দেবেন, এবং আরো।

না, আর নয়। দশ বছর আগেই যার ভূমিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল, এবং তা না হলেও অন্ততঃ আরও একটি বছর আগেই এম-এটি পাশ করে পথে দাঁড়ানো উচিত ছিল, তাকে তিনি আর সময় দেবেন না।

হর্ষ বুঝতে পেরেছে জনার্দনবাবুর মনের দুর্গম ইচ্ছেটা, বুঝেছে সময় হয়ে এসেছে, আনন্দ করবার উপভোগ করবার দিন ফুরিয়ে আসছে শীতের বিকেলের মত, দ্রুত, অতিদ্রুত।

এর জন্যে জনার্দনবাবুকে দোষ দেয় না হর্ষ, একজন জনার্দনবাবু হিসেবে তিনি ঠিকই করেছেন। অক্ষমতাকে কেউই ক্ষমা করে না। এটা হর্ষর অক্ষমতা বৈ কি।

তাই শেষবারের মত জ্বলতে চায়, তেল ফুরোনো সলতের মত। সময়টা যত অল্প হয়ে আসবে উজ্জ্বলতাটা তত বেশী। সব আশা, অন্ততঃ সবটা আশা একটা জীবনে পূর্ণ হয় না। চাওয়া আর পাওয়ার বুকের মধ্যে সেই না-পাওয়া ফুলটা ফোটে, যার সুগন্ধ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতই সজাগ, মানুষকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে রাখাই যার বৈশিষ্ট্য।

লাইব্রেরী রুম থেকে 'ভাষণে'র কাগজপত্র নিয়ে বেরোচ্ছিল, একেবারে কল্পনাদের সামনে পড়ে গেল। মেয়ে ক-টি কলরব করতে করতে আসছিল মুখোমুখি হতে একেবারে থেমে গেল এবং একপাশ হয়ে থমকে দাঁড়ালো। হর্ষ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কল্পনা তাড়াতাড়ি পথ আগলালো।

—খুব এলেন তো সেদিন ?

—কবেকার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। বিরক্ত হয়ে হর্ষ মিথ্যে কথাটা বললে।

কল্পনার সঙ্গে এই বোধহয় দ্বিতীয়বার সে কথা বললো সুতরাং মাত্র তিন দিন আগের কথাটা এত সহজে সে ভোলে নি।

সেদিন লাইব্রেরীতেই হঠাৎ কল্পনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তিন বছর একসঙ্গে পড়লেও এই ছেলেটির সামনে এলে সে কেন জানি খুব স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। অথচ তার মত মেয়ে, যে ফার্স্ট ইয়ার থেকেই ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মিশছে, গল্প করছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেদের সামনে গেলেই তাদের সে বুঝতে পারে, তাদের উসখুস ভাব দেখে চিনতে পারে। সবাই এক, সবাই এক রকম। কোন একটা প্রসঙ্গে এসে সবাই হুবহু একমূর্তি। কিন্তু এই ছেলেটি এবং এর বন্ধুটি, যাদের দুজনকে কলেজে, রাস্তায়, সিনেমায়, সময়ে অসময়ে কখনো আলাদা করে দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত, এরা দুজন কেমন যেন।

একটু বাধ বাধ গলায়ই প্রথম কথা বলেছিল কল্পনা, আপনাকে একটি মেয়ে ভীষণ খুঁজছে। চিত্রলেখা, চিত্রলেখা চ্যাটার্জী—ফার্স্ট ইয়ারের—হর্ষর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা একটু দোলায় কল্পনা।

—কেন ? ঘাড় কাত করে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকালো হর্ষ।

মেয়েদের চিনতে তার বাকি নেই। ভীষণ, ভয়ানক, সাংঘাতিক ছাড়া তাদের কথা নেই, দরকার ছাড়া কোন গরজ নেই, লাভ ছাড়া কোন লোভ নেই, কোন কৌতূহল নেই।

একটু অস্বস্তি বোধ করলো, একটু উসখুস করলো, তারপর বললো কল্পনা, আমাকে কিছুই বলেনি, নিজেই বলবে বোধহয়—কিন্তু আপনাকে অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারছে না, চেনে না কিনা—আপনার আজ কি সময় হবে টিফিনের সময়, তাহলে—

—না, আজ একটু ব্যস্ত থাকবো। হর্ষ পাশ কাটাতে চেষ্টা করলো।

—তাহলে কাল? কাল আপনি লাইব্রেরীতে টিফিনের সময় একটু দাঁড়াবেন, কেমন?

ঘাড় নাড়লেও সেদিন টিফিনে লাইব্রেরীতে মোটেই যায় নি ও। তার পরে এই দেখা।

—সেদিন লাইব্রেরীতে থাকবেন বলেছিলেন—আমরা মিছিমিছি অপেক্ষা করলুম।

—ওঃ হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম—হর্ষ কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করলো।

কল্পনা একটু ম্লান হলো দেখে হর্ষ একটু নরম গলায় বললো, বেশতো আর একদিন না হয়, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করা যাবে, পালিয়ে তো আর যাচ্ছি না। হাসলো হর্ষ।

—আপনি এখন কি খুবই ব্যস্ত? জানতে চাইলো কল্পনা।

—কেন বলুন তো?

—চিত্রলেখা একটু কথা বলতে চায়, বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে পিছন দিকে হাত নেড়ে কাকে ডাকলো।

যে তিনটি মেয়ে কল্পনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিল তাদেরই একজন এগিয়ে এলো ধীর পায়ে। সতের আঠারর মধ্যে বয়স, ফর্সা, বেশ সুশ্রী দেখতে। মুখের গড়নে বেশ একটা ঋজুতা আছে। হর্ষর এক নজরে তাই মনে হলো।

—চিত্রলেখা, ইনিই হর্ষবাবু—পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের মাঝ থেকে সরে গেল কল্পনা। চিত্রলেখা হাত তুলে নমস্কার করলো।

হর্ষ প্রতিনমস্কার করে বললো, আমি দুঃখিত, সেদিন আপনাকে অনর্থক অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে।

মেয়েটি উত্তরে মিষ্টি করে হাসলো একটু।

—আমাকে খুঁজছেন কেন বলুন তো? আবার হর্ষকেই কথা বলতে হলো ভদ্রতা করে।

—আলাপ করবো বলে। রেডিওতে সেদিন আপনার কবিতা শুনে খুব ভালো লাগলো—

—ও। হর্ষ জ্যোতিষীর মত নিজের হাতের চেটো হঠাৎ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

—তাছাড়া—হর্ষ যাতে মুখ তুলে তাকায় হয়ত সেইজন্যই মেয়েটি থেমে গেল।

হর্ষ চোখ তুলে তাকালো। তার মনে হলো তার দৃষ্টিটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে, সে এখন আর চিত্রলেখাকে দেখতে পাচ্ছেনা, চিত্রলেখার চোখ চিবুক ঠোঁট নাক ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে যেন।

—তাছাড়া আপনার একটি কবিতা যদি আমাকে দিতেন।

—আপনাকে? কেন? হর্ষ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, চোখ না সরিয়েই।

একটু হেসে মেয়েটি বললো, আমাকে ঠিক নয়, আমাদের একটি পাণ্ডুলিপি পত্রিকা আছে, তার জন্যে—

—আচ্ছা। সম্মতি জানালো হর্ষ।

—কবে দেবেন, তাহলে? উজ্জ্বল চোখে মেয়েটি আরো একটু হাসলো যেন।

খালি হাসি আর হাসি। হর্ষ থমকে গেল একটু, মেয়েটি বেশ স্মার্ট তো! একটু জড়তা নেই। অনেকটা সময় নিল হর্ষ কি করবে ভেবে। তার কাছে একটি কবিতা আছে, সেটি এক্ষুণি দিয়ে দেওয়া কি ভালো দেখাবে? অথচ এইজন্যেই আবার একদিন দেখা করা, সেও বিশ্রী ব্যাপার।

শেষে বলেই ফেললো, আমার কাছেই একটি কবিতা অবশ্য আছে, জরুরী থাকলে নিতে পারেন।

মেয়েটি হাত বাড়ালো। হর্ষ বুক পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে চিত্রলেখার হাতে দিয়ে বললো, আচ্ছা চলি।

হর্ষ পা বাড়াতেই কল্পনারা চিত্রলেখাকে হর্ষর কবিতাটা সুদ্ধু ঘিরে ধরলো, আবছা চোখে দেখতে পেল হর্ষ।

ক্লাসে বসে প্রফেসরের লেকচার কানে এলো না, একটি মুখের প্রোফাইল তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকলো বারবার। মনে হলো একটু বেশী মনোযোগ দিয়েই দেখে ফেলেছে নাক ঠোঁট গলা চিবুকের রেখাগুলো, শঙ্খের মত সাদা, নিটোল। মনে হলো একটু বেশীই বা আলো পড়েছিল মুখের ওপর, আর তাই অত সাদা আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর ওই হাসি।

নিজের ওপর রেগে উঠলো হর্ষ, ক্লাসে বসে একটি মেয়ের কথা ভাবছে শেষ পর্যন্ত ছি ছি। একটি কি দুটি অনাবশ্যক কথা বললেই যদি কোন

মেয়েকে ভাবতে হয়, তাহলে মাথাটা তো কিছুকালের মধ্যেই বিরাট অ্যালবামে পরিণত হবে। বিরক্ত হয়ে খাতা বার করে নোট নিতে শুরু করলো, যা কখনোই করে না।

কিন্তু চিত্রলেখাকে ভুলতে পারলো না। কেমন একটু খুশী, কেমন একটু ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়লো মনের ভেতর, একটা মিঠে আস্বাদের মত। ফাল্গুন মাসের বাতাসে যেমন একটা উসখুস ভাব থাকে, আশ্বিনের নীলকান্ত সকালে যেমন একটা কি-জানি কি-জানি ভাব শিরশির করে ওঠে মনের ভেতরে, তেমনি। কিছুই নয় তবু যেন কি একটা ব্যাপার।

তিনটে দিন কলেজ করলো, ক্লাস করলো, অথচ চিত্রলেখার সঙ্গে দেখা হলো না। মনে মনে এমন ভাবলো, যদি আবার দেখা হতো, যদি আবার কথা বলবার মত কারণ ঘটতো। কবিতাটা তক্ষুণি তক্ষুণি না দিলেই ভালো হতো, তাহলে আর একবার অন্ততঃ—

হঠাৎ বিকেল বিকেলের দিকে দেখা হয়ে গেল হেদুয়ার সামনে একদিন। হর্ষর মনের ভেতরের জল্পনা মুছে গেল এক মুহূর্তে, নিজেকে আর ছোট করবে না, দুর্বল হবার সুযোগ দেবে না। যেন দেখতে পায়নি। এমনি ভাব করে হর্ষ হেদুয়ার ভেতর ঢুকে পড়লো।

চিত্রলেখা উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসছিল, এমন সময় হর্ষ পাশ কাটালো দেখে পিছন থেকে একবার ডাকলো, শুনছেন?

শুনতে পেল না হর্ষ। চিত্রলেখা অগত্যা সঙ্গের মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে হর্ষকে অনুসরণ করলো লঘু পায়ে।

হেদুয়ার আধ চক্কর প্রায় ঘুরেছে হর্ষ, চিত্রলেখা তাকে ধরে ফেললো, শুনছেন?

এরপরেও শুনতে না পাওয়া স্পষ্টতঃই অভদ্রতা করা। হর্ষ ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হবার ভান করলো, আপনি?

—ওঃ আমাকে যা দৌড় করালেন—হাঁপাতে হাঁপাতে হাসলো একটু।

হর্ষর মনে হলো মেয়েটি তার ফাঁকি ধরে ফেলেছে।

সন্দিগ্ধ গলায় বললো, কী ব্যাপার বলুন তো?

খাতার ভেতর থেকে একখানা কার্ড বের করে ওর হাতে দিয়ে বললো, ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা থিয়েটার করছি, আপনাকে একখানা নিতে হবে।

—কত?

—আট আনা, একটাকা, দুটাকা যা হোক।

—কিন্তু আমার কাছে তো এখন পয়সা নেই।

—না থাক, কার্ড তো রাখুন।

কার্ড পকেটে রাখতে রাখতে হর্ষ বললো, কাল তাহলে কোথায় দেখা পাবো?

খাতার একটা পাতা খুলে রুটিনটা দেখলো চিত্রলেখা, এক নম্বরে, দুটোর সময়।

হর্ষর নিজের আর্থিক অবস্থা তার চেয়ে শোচনীয় ভাবে আর কেউ জানে না। ট্যুইশান নেই, বাড়ি থেকেও হাত খরচ পায় না, নিজের লেখাপত্র থেকে তদবির তদারক করে যা ওঠে তা দিয়েই সারাটা মাস চালাতে হয় তাকে। চলে না অবশ্য।

তপনের সঙ্গে এই নিয়ে প্রথম প্রথম তুমল তর্ক বিতর্ক চলেছিল। যেদিন থেকে তপন বুঝতে পেরেছিল, যখন তখন খাওয়াতে চাইলে হর্ষ কেন খেতে রাজী হয় না। কেন রাজী হয় না মাসে এক দিনের বেশী সিনেমা দেখতে।

হার অবশ্য শেষ পর্যন্ত হর্ষকেই মানতে হয়েছে। তপনকে অপর কোন বন্ধুর মত ভাবলে চলবে না, আর কারো স্বভাবের সঙ্গে তার স্বভাব মিলবে না। নিজের জন্য সে আলাদা করে কিছু খরচ করে না, আলাদা করে ভাবেও না। বন্ধুর সঙ্গে একসাথে চা না খেলে চা খাওয়াটা তার জনেই না, সিনেমার বেলায়ও তাই। এমন কি সব ব্যাপারেই। এক একজন যেমন ডুয়েট গান না গেয়ে আনন্দ পায় না।

কিন্তু এই রকম আর্থিক অবস্থায় একটি সুন্দর মুখের একটি কথায় ফস করে একটি টাকা ব্যয় করে কার্ড কেনা কতখানি উচিত হয়েছে তাই মনে মনে ভেবে দেখছিল হর্ষ। থিয়েটার সে দেখতে যাবে না নিশ্চয় করে জেনেও এমন কাজ করা উচিত হয়েছে ভাবতে পারল না। অবশ্য ঔচিত্য বোধটা আর্থিক দিকের নয়, মানসিক। এই ভেবে মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করতে লাগলো যে, একটি ছেলে এসে চাইলে যেখানে নির্ঘাত তাকে ব্যর্থ করতো সেখানে একটি মেয়ের দাবী সে গ্রাহ্য করলো কি করে। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল চিত্ত বলে মনে হলো তার। তপন কাছে থাকলে আজ কি কৈফিয়ৎ দিত তাকে?

অবশেষে ঠিক করলো এর বিনিময় আদায় করবে। চিত্রলেখা বুঝুক আর না বুঝুক সে নিজে অন্ততঃ বুঝবে মেয়েটির ওপরে একটুও দুর্বলতা তার নেই, আলাদা চোখে দেখেও নি। একজন দুঃস্থ শিল্পীর সাহায্যের জন্য একটি কবিতার বই বিক্রীর ব্যবস্থা হয়েছিল কোন পত্রিকার তরফ থেকে। হর্ষ তারই এক কপি চিত্রলেখাকে গছালো।

—কত দিতে হবে?

—এক টাকা।

—কিন্তু এখন তো—

—পরে দেবেন। সেই এক কথা, হর্ষ দাঁড়ালো না, তাকালো না পর্যন্ত মুখের দিকে ভালো করে।

ভেবেছিল পরদিন মেয়েটি তাকে ডেকে টাকাটি দিয়ে দেবে, যেমন সে দিয়েছিল। কিন্তু তিন চারদিন পার হয়ে গেল কোন সাড়া নেই। একদিন দেখাও হয়েছিল, ক্লাসে যাচ্ছিল তখন, মৃদু হাসলো শুধু তাকে দেখে।

হর্ষ ভাবলো, এ আবার কি। টাকাটার কথা শেষ পর্যন্ত ভুলেই গেল না কি? যা ভুলো মন মেয়েদের, সময় সময় চেনা মানুষকেই চিনতে পারে না।

কিন্তু পরদিনই হর্ষকে দু টাকার একখানা নোট দিয়ে চিত্রলেখা বললো, আমাকে আর একখানা বই দিতে হবে কিন্তু।

প্রথমটা থ হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কান দুটো গরম হয়ে উঠলো, মেয়েটির কাছে হেরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে। প্রতিবারই তার মনের কথা কি করে টের পেয়ে যাচ্ছে ও।

দিন পনেরর মধ্যেই চিত্রলেখার সঙ্গে হর্ষর সম্পর্কটা সহজ হয়ে এলো এবং সেটা চিত্রলেখার সৌজন্যেই হলো। ছেলে মহলে একটু কানাকানি পড়ে গেল এই নিয়ে। কিন্তু হর্ষ কানে তুললো না। লাইব্রেরীতে নিয়মিতই দেখা হতে লাগলো, গল্প গুজবও।

'ভষণ'–টা আর নিয়মিত বেরোয় না, ফল হলো এই। হর্ষ আরো অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। কেউ হঠাৎ কথা বললে চমকে ওঠে, খেতে খেতে কখন থেমে বসে থাকে, মার বকুনি খেয়ে সম্বিত ফেরে এমনি অবস্থা হলো।

সে তো বেশ চলছিল, বেশ ছিল। দু একটা পুরনো স্মৃতি ছাড়া কোন দুঃখ ছিল না। আবার নতুন করে কেন এমন হলো। পথের ভুলে এ মেয়েটার সঙ্গে তার কেন দেখা হয়ে গেল।

কতবার উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো মনে মনে হেসে। কতবার ভাবলো একটা অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে তার সঙ্গে একটু হেসেছে, গল্প করেছে এই মাত্র। হর্ষ না হয়ে হরিশ হলেও এর কোন ব্যতিক্রম হতো না, সুতরাং এ নিয়ে ভাবা মূর্খতা।

কিন্তু কখন দেখলো খাতায় আঁক কাটতে কাটতে একটি নামই বারবার লিখেছে, যে নামটা একমাস আগেও তার জানা ছিল না। নিজেকে পীড়ন করতে ইচ্ছে করলো, নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে যন্ত্রণা দিতে।

রবিবার দিনটা ঘরে বসে ছটফট করলো সারা বেলা, ভালো লাগছে না কিছুই। মন্দিরার পড়া মুখস্থ করা, বাবার চুপ করে শুয়ে থাকা, পাশের বাড়ির নতুন খোকাটার চেঁচামেচি, নিমগাছের ডালে কাকের ডাক, রেডিওর গান সব বেসুরো আর অর্থহীন মনে হতে লাগলো। মনের মধ্যে কিছুর সঙ্গেই আর যোগটা খুঁজে পেল না।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে অনির্দিষ্টভাবে কোন সিনেমা দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়ে পড়লো শেষ পর্যন্ত। তপনটা এই সময় যদি থাকতো, তবে কিছুটা সান্ত্বনা পেত। মনের এই অবস্থাটা একজন কাউকে না বললে হাল্কা হবার কোন উপায় নেই।

কাউণ্টারে সবে সিনেমার টিকিট এবং ফেরত পয়সা বুঝে নিচ্ছে এমন সময় ঠিক তার পিছন থেকে কে বলে উঠলো, আপনি? যাক বাঁচা গেল, এই নিন আমাদের তিনখানা টিকিট কেটে দিন।

মনে হলো থিয়েটারের রিভলভিং স্টেজে দাঁড়িয়ে আছে সে, আর তাই হঠাৎ তার পিছনে চিত্রলেখার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে ওর এক ছোট ভাই। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল হর্ষ।

—তিন খানা ?

—হ্যাঁ, আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের আসবার কথা আছে, এখনো আসচে না কেন বুঝতে পারছি না। ঘড়ি দেখলো একটুখানি হাতটা তুলে।

টিকিট কাটা হয়ে গেলে হর্ষ একটি কথাও বলতে পারলো না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। অথচ চুপ করে না থেকে কিছু একটা অন্ততঃ তার বলা উচিত ছিল, তা বুঝতে পারলো। এই বুঝি আপনার ভাই, কি নাম এর, বা: সুন্দর নাম তো, এই ধরণের কথারও অভাব ছিলনা তবু হর্ষ কথা বললে না।

বুকের ভেতরটা কেমন গুড় গুড় করতে লাগলো, কেমন একটা অস্পষ্ট ভয় হলো নিজেকে। একবার ইচ্ছে হলো চিত্রলেখা যেই অন্য দিকে তাকাবে, একদৌড়ে সরে পড়বে হর্ষ। কিংবা একটু ঘুরে আসছি বলে আর আস-বেনা। কিন্তু পা দুটো মনে হলো পেরেকআঁটা হয়ে গেছে।

চিত্রলেখা ছোট ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার ডবলডেকার গুলো লক্ষ্য করছিল, বোধহয় তার মাসতুতো ভাইয়ের প্রতীক্ষায়। শো আরম্ভ হবার শেষ বেল বাজলো, কেউ এলো না। হর্ষ ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠছিল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। সবাই হাঁ করে তাদের দেখছে। অত্যন্ত বিশ্রীভাবে।

—এলো না বাঁদরটা। চলুন আমরা ভেতরে যাই—

—কিন্তু টিকিটটা—

—ও আর কি হবে। নরম হেসে চিত্রলেখা বললো।

হর্ষর একটা মন বললো যেয়ো না, আর একটা মন বললো বা: এই তো চাই। তুমি মনে মনে ঘুণাক্ষরেও যা ভেবেছিলে দেখ কেমন সঙ্গে সঙ্গে তা ফলে গেল।

পাশাপাশি বসে হর্ষ চিত্রলেখাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেল। মুখখানা ঠিক পানের মত না হলেও কতকটা, একটু চৌকস ভাব মেশানো। চিবুকটা সজাগ, যেন কানের নিচ থেকে একটা স্পষ্ট রেখায় আঁকা, নাকটা একটু

তীক্ষ্ণ, কপালটা চওড়া। আর চোখ দুটোর ঠিক উপমা খুঁজে পেল না, বেশ টানা টানা আর হাসি হাসি। ঠোঁট দুখানা দেখলেই মনে হবে তারা নিজেরা কানে কানে কথা বলছে যেন। আর যখন সত্যিই কথা বলবে কিংবা কথা বলবার উপক্রম করবে চিত্রলেখা তখন মনে হবে ঠোঁটে তার ঝাল লেগেছে। পান খেয়ে কিংবা না খেয়ে, যখনই ঝাল লাগে, মেয়েদের ঠোঁট দুখানা এমনি অদ্ভুত স্পর্শ কাতর হয়ে ওঠে, নিচের ঠোঁটটায় একটা রেখা পড়ে, ওপরের সরল ঠোঁটটা থিরথির করে কাঁপে বেতের পাতার মত, যেন কত ব্যথা পেয়েছে, একটু একটু দাঁতের আভা দেখা যাচ্ছে মুক্তোর মালার মত। নাকের পাপড়ি দুটো একটু একটু ফুলে উঠতে থাকবে, তিলের ফুলের মত।

—বি-এ, পাশ করে এম-এ, নিশ্চয়ই বাংলা নিয়ে পড়বেন?

ভাইয়ের সঙ্গে কথা শেষ করে চিত্রলেখা হর্ষর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

—আগে বি-এ, টাই পাশ করি দেখুন।

একটু অবিশ্বাস মেশানো কৌতুকের হাসির ঢেউ খেলে গেল চিত্রলেখার ঠোঁটে।

—আপনার কবিতার বইয়ের মলাটটা যদি আর একটু ভালো হতো—সত্যি বইটার তুলনায়, মনে হলো এলোমেলো কথা বলছে চিত্রলেখা, নিজেকে হঠাৎ আর গুছিয়ে নিতে পারছে না যেন।

—হ্যাঁ, কভারটার জন্যে আমারও শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষোভ থেকে গেল—উত্তর দিল হর্ষ।

চিত্রলেখার গা থেকে পদ্মফুলের মত একটা হাল্কা গন্ধ ভেসে আসছে, চোখদুটো বুজে আসতে চাইল ধীরে ধীরে।

শিউলির কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল: রসারোডের বাসায় শেষ দৃশ্যটা। লোকজন, হৈচৈ। হর্ষর ওপর পরিবেশনের ভার পড়েছিল। ভাঁড়ার ঘর আর ছাত দৌড়োদৌড়ি করতে করতে ঘাম মুছবার সময় পর্যন্ত পায়নি। তবু ভাল লাগছিল নিজের শেষ শক্তিটুকুও এই বাজে কাজে ব্যয় করতে।

কোণের ঘর থেকে মাঝে মাঝে মেয়েদের কাকলি ভেসে আসছিল আর হর্ষর হাত দুটো থেমে থেমে পড়ছিল অন্যমনস্ক হয়ে। বেনারসীর মধ্যে শিউলি এখন আবছা হয়ে বসে আছে নিশ্চয়ই। আলতা আলতা আভা পড়েছে শান্ত মুখের ওপর, বিন্দু বিন্দু চন্দনের ফোঁটা আঁকা মুখের ওপর। বান্ধবীরা ঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠেছে।

হর্ষর একবার ইচ্ছে হয়েছিল থাক বরযাত্রী, থাকুক পরিবেশণ, একছুটে কোণের ঘরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসে শিউলি ঠিক এই মুহূর্তে কাঁদছে না হাসছে। বিয়ের লগ্ন ছিল দুপুর রাতে, সে পর্যন্ত হর্ষর আর থাকা হয়নি। খেতে বসবার আগে একবার কোণের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু

ঘরের ভেতরে ঢোকেনি, কোন কথা বলেনি। শিউলি একবার তার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। মনে হয়ছিল দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে ও। মাথাটা সেই যে নিচু করলো আর তুললো না। কেন তুললো না?

—ওকি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে চিত্রলেখা কথা বললো।

—হ্যাঁ—না। চেয়ারের মধ্যে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলো হর্ষ।

ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে, চাপা আলোর আভায় চিত্রলেখার চেহারাটা রেখা-চিত্রের মত ফুটে উঠেছে। কানের একটা ইয়ারিং জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দপ্‌দপ্ করছে, গলার নিচে অনাবৃত জায়গাটায় মটরদানার মত নীলচে দ্যুতি। হর্ষ একটু একটু তাকিয়ে দেখলো।

খুব ভালো একটা কবিতা লিখে ফেললে কোন কোন লাইন পড়ে নিজেই আবার চমকে ওঠে হর্ষ, মনে হয় কোথায় যেন পড়েছে, কোন এক পুরনো কবিতার লাইন, কোন এক নাম-ভুলে-যাওয়া কবির, মনে মনে স্বস্তি পায়না। তখন কে বলে দেবে এই লাইনগুলো আর কারো লেখা নয়, তারই মনের মধ্যে হয়ত কতকাল থেকে প্রকাশের দিন গুণছিল।

সিনেমা দেখতে দেখতে এমনি হলো হর্ষর। মনে হলো এই দৃশ্যগুলো কোথায় যেন দেখেছে, এই কথাগুলো কোথায় যেন শুনেছে। গল্পটাও যেন আগাগোড়া জানা। দু একটা চরিত্রের, মনে হচ্ছে, চেহারা বদলে গেছে. অনেক কাল আগে যখন দেখেছিল তখন কেউ ছিল মোটা, কারো রং ছিল ফর্সা। কথা বলবার ভঙ্গীটা যেন অনেকেরই নতুন, এমনভাবে যেন কথা বলবার কথা ছিল না।

এটা কি তবে কোন পুরনো ছবি? এরকম নাম তো মনে পড়ছে না, না কি ছাপার হরফে পড়েছে কোন দিন? লেখকের নামটা খেয়াল করেনি, অন্যমনস্ক হয়ে শিউলির কথা ভাবছিল, নইলে বুঝতে পারতো বইটা পড়েছে কিনা।

হর্ষর মনটা আলগা হয়ে গেল, পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলেও মনে হলো কোন মনোযোগ নেই তার। কেমন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি মনের মধ্যে কেঁপে উঠলো আলোর তরঙ্গের মত।

বৃষ্টির পর ভিজে মাটির গন্ধ নাকে এলে কিংবা আশ্বিনের কোন হঠাৎ-ভোরে, অথবা কোন একটা বিশেষ দুপুর বেলায় মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য যেমন হয়, ছোট বেলার কোন একটা বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তের বেদনা আচমকা যেন ফিরে পায়। সময়ের উজান বেয়ে গিয়ে কোন একটা ভেসে যাওয়া দিনের একান্ত অনুভূতিকে স্পর্শ করা

পৃথিবীতে এযে কত দুর্লভ ঐশ্বর্য তা বুঝতে পারে মুহূর্ত পরে, যখন মাথা খুঁড়লেও আর সেই ভাব দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে আনতে পারে না।

ছবিটা যখন শেষ হলো তখন প্রায় রাত নটা বেজেছে। চিত্রলেখা বাইরে আসতে আসতে বললো, আমার বাড়ি থেকে কেউ যদি না এসে থাকে আমাকে কিন্তু পৌঁছে দিতে হবে বাড়ি পর্যন্ত—বেশী দূর নয় অবশ্য।

হর্ষ হেসে বললো, বলবার অবশ্য দরকার ছিল না।

মাথার ওপরে তাকাতেই প্রকাণ্ড পোস্টারখানা নজরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের নামটা জানবার জন্যে অদম্য বাসনা জাগলো মনের মধ্যে। তারপর, তারপর ঠিক কি হলো হর্ষ জানে না। মাথার ভেতরটায় মনে হলো একটা টেবিল ফ্যান ফুল স্পীডে ঘুরছে গর্জন করতে করতে।

যন্ত্রচালিতের মত চিত্রলেখার পাশে পাশে হেঁটে গেছে, একটি মেয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রকম ভুলে গিয়ে। তার মুঠো করা হাতের ঘা লেগে চিত্রলেখার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা লাফিয়ে উঠেছে ঝুন ঝুন করে। একটুও লজ্জা পায়নি হর্ষ, পা মাড়িয়ে দিয়েছে একবার। নমস্কার করা দূরে থাক লক্ষ্যই করেনি বোধহয়।

চিত্রলেখা এক সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থেমে পড়েছে। আর হর্ষর ঠিক তখনই চেতনা হয়েছে। আবছা আবছা মনে পড়েছে চিত্রলেখা একটু আগে তাকে যেন কি বলছিল। এখন আবার সে কথা জিজ্ঞাসা করে জানা অভদ্রতা হবে ভেবে চুপ করে দাঁড়ালো।

—কি হয়েছে আপনার সত্যি করে বলুন তো। অসুস্থ বোধ করছেন?

—না না, আমার কিছুই হয়নি। অস্বাভাবিক জোর দিয়ে কথা বললো হর্ষ।

—দিদি আমাদের গাড়ি,—চিত্রলেখার ভাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

—আমাদের গাড়ি এসে গেছে দেখছি, আপনাকে বাড়িতে না হয় পৌঁছে দিয়ে যাই, ট্র্যামে গেলে হয়ত আরো বেশী খারাপ বোধ করবেন?

—না, না! হর্ষ প্রায় চেঁচানো গলায় অপ্রকৃতিস্থর মত কথা বললো, ট্র্যামেই খুব যেতে পারবো, কিছুই হয়নি আমার।

মোটরের জানালা দিয়ে যতক্ষণ দেখা গেল চিত্রলেখা হর্ষর চলমান মূর্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

সুদর্শনের কথা ভুলে গিয়েছিল হর্ষ, আর হয়তো কোন দিন মনেই পড়তো না যদি না নিজেই সে এমনভাবে মনে পড়িয়ে দিত হর্ষকে। তার কুড়িটি দিন আর রাত্রির অমানুষিক পরিশ্রম কোন এক মিত্ররূপী শত্রু এইভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! আজ জলের মত স্পষ্ট বুঝতে পারলো সুদর্শনকে. তার প্রতিটি কাজের এবং কথার মুখোস সরে গেল হর্ষর চোখের সামনে থেকে।

আজ বুঝতে পারলো সুদর্শনের জামাইবাবুর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হবার গোপন রহস্যটা কি ছিল। এবং কেন তিনি হর্ষকে চোর জেনেও পুলিশে দেন নি। কেন তাঁর মেজাজ আবার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, এবং কেন সুদর্শন আর হর্ষর পাণ্ডুলিপিটি ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

এতগুলি কেনর উত্তর একটি সিনেমা দেখতে গিয়েই পেয়ে গেল সে। তিনটি বছরের মধ্যে তারই লেখা গল্প কত সহজে হুবহু ছবি হয়ে বেরিয়ে গেল, নাম হলো সুদর্শনের, টাকা পেল সুদর্শন। আর নিজেরই বই নিজের টাকা খরচা করে একজন সাধারণ দর্শকের মত দেখে এলো সে। তাই তার মনে হয়েছিল ছবি দেখতে দেখতে, এই গল্পটা তার জানা, এই দৃশ্যগুলি যেন কোথায় দেখেছে। নিজের উপন্যাসের নায়ক নায়িকার যে চেহারা তার কল্পনায় ছিল, বাস্তবে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে তার মিল হয়নি।

অথচ কোন প্রমাণ নেই। হর্ষকে কেউ বিশ্বাস করবে না, সমস্ত খুলে বললেও। ভাববে হয় মাথা খারাপ আছে, নইলে আগাগোড়া বানিয়ে বলছে।

মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। যে উপন্যাসটার কথা মন থেকে বিদায় দিয়েছিল এত দিন, তার জন্যেই তার আজ এত বেশী দুঃখ হল।

যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এই দুর্ঘটনা রোধ করবার কোনই উপায় নেই। সুতরাং এ নিয়ে আর ভাবতে যাবে না, বরং এই ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে যে অন্যায়টা করেছে মনে মনে তার জন্য লজ্জিত হলো। চিত্রলেখার সঙ্গে কাল রাত্রের ব্যবহারটা কেমন যেন খাপছাড়া হয়েছে, কলেজে দেখা হলে কথা বলে হাল্কা করে নেবে ব্যাপারটা।

দোকান থেকে দু একটা জিনিস কিনে ফিরছিল হর্ষ, তাদের গলির মুখে দাঁড়ানো মোটর থেকে গলা বার করে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, জনার্দনবাবুর বাড়িটা বলতে পারেন কোথায় ?

হর্ষর মনে হলো লোকটিকে সে এর আগে কোথায় যেন দেখেছে।

মোটর থেকে তিনজন লোক নামলেন। একজন বৃদ্ধ, আব দুজনের বয়স অল্প। হর্ষ তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। বাবা বাড়িতেই ছিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছ-ফুট লম্বা টকটকে চেহারা দেখে গোটা বাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কোথায় বসাবে কোন ঘরে বসাবে ভেবেই পেল না হর্ষ। বালিগঞ্জ থেকে এঁরা আসচেন জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছে, কিন্তু কি দরকারের এসেছেন তা এখনও অজ্ঞাত।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হর্ষর বাবার সঙ্গে প্রায় বিনা ভূমিকায কথা বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে জনার্দনবাবু, তবে আপনার মেয়েকে আশীর্বাদ করে যাই ? অবশ্য আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আমার এই মেজো ছেলের কাছ থেকে জেনে নিন আগে—বলেই হর্ষর চেনা-চেনা লাগা লোকটির দিকে বৃদ্ধ ইংগিত করলেন।

ব্যাপারটা এত নাটকীয়, এতই আকস্মিক যে, কোন একটা জমজমাট হিন্দী ছবি দেখছে বলে মনে হলো হর্ষর। হর্ষর মা আড়ি পাতা অবস্থায়, সঠিক করে বিশ্বাস করতে না পেরে, প্রায় কেঁদে ফেললেন। জনার্দনবাবু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, সেকি, মেয়েকে দেখলেন না, পছন্দ না-পছন্দের বড়ো কথাটাই এখনো বাকি—

বৃদ্ধ গাল ভরা হেসে বললেন, আমাকে তেমন কাঁচা লোক ভাবছেন কেন, আপনার মেয়েকে কি না দেখে কথা বলতে পারি! মেয়েটিকে দেখেছি, দেখে পছন্দও হয়েছে...

হর্ষর বাবা তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না দেখে বৃদ্ধের মেজো ছেলে বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। মন্দিরাকে কলেজেই তাঁরা দেখেছেন। একদিন নয় একাধিক দিন। তাঁর মেয়েও মন্দিরার সঙ্গেই পড়ে, সুতরাং অসুবিধে হয়নি কিছুই।

হর্ষ আর দাঁড়ালো না, মন্দিরার উদ্দেশে ঘর থেকে অন্তর্ধান করলো। মনে পড়লো এই গাড়িখানা তাদের কলেজের গেটের সামনে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর ঐ মেজো ছেলেটিকে সে ঐখানেই দেখেছে।

মন্দিরা ফিলজফির একটা চ্যাপ্টার বের করে কাঠের পুতুলের মত বসে ছিল পাশের ঘরে। হর্ষ সটান ওর টেবিলের কাছে গিয়ে বললো, এই ওঠ, তোকে দেখতে এসেছেন।

মন্দিরা কথা বললো না, বই থেকে চোখও সরালো না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। এর আগেও দুচার জন দেখতে এসেছে মন্দিরাকে

কিন্তু একটা না একটা ছুতো করে শেষ পর্যন্ত পছন্দ হয়নি কারো। আসলে টাকা পয়সার ব্যাপারেই গোলমাল হয়েছে, নইলে মেয়ে দেখে যাবার সময়ে মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে না-পছন্দ হয়নি কারোই।

হর্ষ বললো, কিরে, বসে থাকলি কেন, কাপড় ছেড়ে চুল টুল ঠিক করে তৈরি হয়ে নে, ওঁরা বোধ হয় বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবেন না।

—আমি পারবো না, দাদা। মাথাটা বইয়ের ওপরে আরো ঝুঁকিয়ে রেখে ধীর গলায় বললে মন্দিরা।

—পাগলামি করিস নে, ওঁরা তোকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন—হর্ষ ওর কাঁধে হাত রেখে বললো।

—দাদা! মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দিরা কাঁপা গলায় প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

লক্ষ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয় না কিন্তু আধঘণ্টার কথাবার্তায়ই সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সময় বড় কম। ছেলে বিলেত যাবে সামনের মাসে, তাই এত তাড়াতাড়ি। মাঝে মাত্র তিনটে দিন বড় জোর সময় রইল।

হর্ষর বাবা বললেন এর মধ্যে কি করে সম্ভব, টাকার যোগাড় করবার মত সময়ও তো পেলাম না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যাঁর নাম বিমলাক্ষ বাবু, হেসে বললেন, কোন হৈচৈ করবার দরকার নেই, বেয়াই মশাই, সামান্য কজনকে ডেকে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দেবেন—আগে সাধ্য তার পরে লৌকিকতা। এযুগে কি আর ওসব করা চলে, জাঁক জমক করেই তো আমরা গেলাম।

একটু পরেই বিমলাক্ষ বাবুরা বিদায় নিলেন। জনার্দনবাবু চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, চোখের কোলটা যেন চিকচিক করছে মনে হলো। হট্ করে কাজটা ভাল হলো কি খারাপ হলো হর্ষর মা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আর হর্ষ মন্দিরার হাতের সদ্য পাওয়া কঙ্কণ জোড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলো একজোড়া সোনার হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে গেছেন বিমলাক্ষবাবু।

বরপক্ষের দাবী দাওয়া নেই এক পয়সা, তবু মাত্র তিনদিন সময়ের মধ্যে একজন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে প্রস্তুত হবার চেষ্টা আরো বেশী করে অপ্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু অলকদা, হর্ষর অলকদা এসে গেলেন বিকেলের দিকে, বিনা সংবাদে। একেই বলে যোগাযোগ।

কিন্তু যোগাযোগটা যে তলে তলে অনেকদিন থেকেই চলছিল, ক্রমশঃ অলক সেনের মুখে সেটা জানা গেল। অলকদাই এই সম্বন্ধের ঘটক, প্রথম যেদিন এসে মন্দিরার ফটোগ্রাফ নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি সেইদিন থেকেই মন্দিরার কথা একদম ভুলে যান নি।

এইজন্যেই মেয়েদের জীবনটাকে করুণ মনে হয়, সুতোকাটা ঘুড়ির মত তাদের পরিণতিটা শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত। কলমের গাছের মত দোমাটির জীবন, অথচ কোনটাই তাদের একেবারে আপন নয়। আজ পর্যন্ত যত মেয়েকে দেখেছে, বাড়িতে হোক, গাড়িতে হোক, রাস্তায় চলতে চলতে কোন জানালায় হোক, মনে হয়েছে সুখী নয়, কেউ সম্পূর্ণ সুখী নয়! গোলাপের ডালে যেমন কাঁটা থাকে, এদের জীবনেরও হয় অতীত নয় ভবিষ্যতের কোন একটা ডালে কাঁটার অস্তিত্ব আছে। সেটা বুকের মধ্যে কখনো কখনো বিঁধে পড়ে, তখন তারা উদাস হয়ে জানালায় এসে দাঁড়ায়, নয়ত আরো বেশী সেজেগুজে, আরো বেশী হেলে দুলে গল্প করে পথে বেরোয়।

আর ভেবে দেখলে, যা কিছু সুন্দর তার পিছনেই চোখের জল আছে। হর্ষর এক একটা নিটোল কবিতার মত, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের অর্থই বেদনার একটা সার্থক অভিব্যক্তি, তার কায়মূর্তি, তাছাড়া আর কিছু না!

কিন্তু মন্দিরা তাব কাছে সুন্দরের চেয়েও বেশী কিছু ছিল, ছেলেবেলার এলেবেলে আকাশের মত, একটুখানি বিষণ্ণ অথচ কোমলতায় অগাধ তার চোখ দুটির দিকে তাকালে মনে হতো হর্ষর শৈশবের হারানো দিনগুলো যেন ওর মধ্যে থেমে রয়েছে। আর বলতে গেলে মন্দিরাকে তার নিজেরই একটা স্মৃতি বলে মনে হতো। তারা যেন একই গাছেব দুটি ছায়া, রোদ্দুরের আর জ্যোৎস্নার। তবু তাদের ছাড়াছাড়ি হলো।

দিন সাতেক পরে একদিন যখন শূন্য মনে কলেজে গেল, সারাপথ মনে হলো কে যেন তার পিছনে পিছনে আসচে। তিন বছর ধরে যে আসতো, তিন বছর ধরে যে এসেছে। যাব সঙ্গে একদিন কলেজে যেতে লজ্জা করেছে। আজ তারই অভাবে মনে হলো কলেজটা ফাঁকা।

—কি রে কদিন ডুব মেরেছিলি কেন? আজ না এলে, তোর বাড়িতেই যেতাম।

তপন কখন এসে পাশে বসেছিল হর্ষ খেয়াল করেনি।

—তুই কবে ফিরলি? হর্ষ ওর হাতটা ধরে বললো।

—দিন তিনেক। তারপর তোর ব্যাপারটা কি বলতো, একটু আধটু কানে এলো যেন—

তপন মুখ টিপে টিপে হাসলো।

দেশবন্ধু পার্কের অন্ধকার ঘাসের ওপর শুয়ে দু বন্ধুতে কথা হচ্ছিল। মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। দূরে পার্কের ধার ঘেঁষে নিওন আলোর উজ্জ্বলতা, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মায়ালোক বিস্তার করেছে। মাঠের মাঝখানে এত দূরে তার আভা আসে না। শুধু তপনের চোখের চশমাটা চকচক করে। মালাই

বরফ, চিনেবাদামওলা সবাই ঘোরাঘুরি করে কখন ফিরে গেছে। রাত হয়েছে এখন।

ঝিরঝির হাওয়ায় অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলো হর্ষ, কথা বলে না। এমন কত রাত্রে এখানে বসে চিনেবাদামের খোসা ভাঙতে ভাঙতে নানান আলোচনা হয়েছে তাদের, নিজেদের লেখা নিয়ে, বিদেশী সাহিত্য নিয়ে। কোনদিন এক পশলা তর্ক হয়ে গেছে, কোনদিন বা একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে। কিন্তু সেই রাতগুলোর সঙ্গে আজকের কত তফাত। আজ তর্ক হয়নি, একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেনি দুজনে। তবু আজকের রাত বড় কঠিন, আর বিমর্ষ।

হর্ষ এক সময় গান গেয়ে উঠলো আবছা গলায়, 'আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে'—একটা লাইনই ঘুরে ঘুরে বার দুই গাইল, তারপর আবার চুপ। হতে পারে তপন ঘুমিয়ে পড়েছে, হতে পারে তাকে সময় দিচ্ছে গুছিয়ে নেবার মত।

—একটা মেয়ের প্রেমই সব নয় পুরুষের জীবনে, আরো চাওয়া আছে আরো পাওয়া আছে—এক সময় তপন আচ্ছন্ন গলায় কথা বললো, তুমি লেখক, আমাকেও ধরে নিতে পারো, আমাদের এইখানেই থেমে গেলে চলবে না, আরো নামতে হবে, আরো উঠতে হবে। জীবনটা অনেক বড়োরে—

তপন যখন কোন গভীর কথা বলে তখন বইয়ের ভাষায় কথা বলে, যার ফলে তাকে হাল্কা আর উচ্ছ্বাস প্রবণ না ভেবে পারা যায়, না কিন্তু হর্ষ জানে এই কথা-গুলো ওর বুকের ভেতর এখনো জ্বলছে, বলবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যায় নি।

—তোর কথাই তোকে বলছি, সব মানুষেরই একটা চরিত্র আছে, কোন দুটো মানুষই কখনো হুবহু এক নয়। হর্ষ অনেক কষ্টে কথাটা শেষ করলো, ওঠা নামা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

—লেখকের কোন চরিত্র নেই, তপন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো, কিংবা আছে, সে তার নিজেরই গড়ে নেওয়া চরিত্র, অনিয়মের চরিত্র। সে যদি একই রকমের হবে তবে সকলের মনের ছবি আঁকবে কি করে?

—তবে আমি লেখক নই। জীবনে যদি একছত্রও লিখে থাকি কোনদিন তা আমি ভুলে যেতে চাই এই মুহূর্তে। আমার বাবাকে, আমার মাকে একজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা হিসেবে ভাবতে পারিনা আমি, অতটা মনের জোর আমার নেই, তাঁরা আমার কাছে মা আর বাবা হয়েই থাকুন চিরকাল।

—অন্য কথায় পালিয়ো না। তপন গম্ভীর গলায় বললো।

—আমাকে শেষ করতে দাও, আমি অন্য কোথাও যাই নি। একটি মেয়ের প্রেম আমার জীবনের ততটা সব, একটা গানের ধুয়ো একটা গানের পক্ষে যতটা হতে পারে।

—তাহলে আসল কথাটা তোমাকে খুলেই বলি, তপন হতাশ ভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, চিত্রলেখা অন্য একটি ছেলেকে ভালোবাসে, অন্তত: অন্য একটি ছেলে চিত্রলেখাকে গভীরভাবে ভালোবাসে।

—সেকি তুমি? হর্ষ চমকে তাকালো ওর আবছা মুখের দিকে।

—এতদিনে এই আমাকে চিনলি। না:, তুই সত্যিই ছেলেমানুষ।

—তবে কে? হর্ষ মোটা, অনুভূতিহীন গলায় কথা বললো।

—আমার চেনা একটি ছেলে, অন্য কলেজে পড়ে।

—ও।

—সুতরাং তোমার উচিত আর না এগোনো। ছেলেটি তোমাকে চেনে, মনে দু:খ পেয়েছে—

—বেশ। হর্ষ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো।

—কই তোমার ডিউ পার্ট কোথায়? আজ একা যে বড়ো—

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে হর্ষকে একা দেখে সুকোমলদা প্রশ্ন করলেন সহাস্যে।

—হ্যাঁ, তপনের সঙ্গে আজ দেখা হয়নি। বলতে বলতে হর্ষ সুকোমলদার ঘরে ঢুকলো গম্ভীর মুখে। তপনকে আজ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে এসেছে, দেখা করেনি, একথা বলতে পারলো না। মনটা তার আজ ভয়ানক খারাপ, কেমন একটা বিষণ্নতা ক্রমশ: পাকিয়ে ধরছে তাকে শীতের ধোঁয়াটে সন্ধ্যের মত। কাল রাত্রের ব্যাপারটার পর প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে বিলম্বিত আর অর্থহীন মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তার সমস্ত প্রাণশক্তির ওপরে, সমস্ত আনন্দময় অনুভূতির ওপরে একটি নির্মম হাতুড়ির ঘা এসে পড়েছে আচমকা। যে সেতারটা তার ছ-টা ঋতুর ছ-টা রাগের তার বুকে নিয়ে একসঙ্গে বেজে উঠেছিল, মুহূর্ত আগেও যে একটা গভীর আলাপ বাজিয়ে চলেছিল, তার সমস্ত তারগুলো একটিমাত্র আর্তনাদে ছিঁড়ে পড়েছে।

এবং সেই মুহূর্ত থেকেই সে বুঝলো সে কত অসহায়, যখন লেখার টেবিলে মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েও একটি ছত্র লেখা বেরোলো না। যখন মনে হলো লেখবার ক্ষমতা, নিজেকে ভুলে থাকবার ক্ষমতা সে চিরকালের মত হারিয়ে ফেলেছে। পদ্মার পাড়ের মত তার জীবনটা একটা অদৃশ্য আঘাতে আঘাতে তার অজ্ঞাতেই ক্ষয়ে এসেছে, এবার ভেঙে পড়বার সময় হলো।

মনে হলো এবার সে ভেঙে পড়বে। চিত্রালেখাকে সে কখন এতটা ভালোবেসে ফেলেছে, ঠিক কবে থেকে, কোন মুহূর্ত থেকে, ভাবতে পারলো না। আর চিত্রলেখাকে ছাড়া কিছু ভাবতেও পারলো না, মনে হলো অন্ধকার একটা যন্ত্রণা তার বুকের ভেতরটায় পীড়া খাচ্ছে।

মানুষ এতো আশ্চর্য জীব, একটা আনন্দ দিয়ে আর একটা আনন্দকে সে মুছে ফেলে, একটা দুঃখের অনুভূতি দিয়ে আর একটা দুঃখকে সে খর্ব করে। একটা সত্যকে দিয়ে আর একটা সত্যকে সে মিথ্যে প্রমাণ করে। তার বর্তমান তার অতীতকে বিসর্জন দিয়ে চরিতার্থ করে তোলে। মানুষ এতো আশ্চর্য!

তাই শিউলিকে মনে পড়লো না, শমিতাকে মনে পড়লো না, মনে হলো জীবনে এই প্রথম তার বুকের ভেতরটা হুহু করে কেঁদে উঠলো। এই প্রথম তার হৃদয়টা ব্যর্থ হলো, এবং এত বড় আঘাত এর আগে সে কখনো পায়নি। মণিকাকার মৃত্যুতে না, পারুল পিসীর বিয়েতে না, বাংলাদেশটা যখন দুখণ্ড হয়ে গিয়েছিল তখনো না। আর মন্দিরাকে হারানোর ব্যথা, সে আলাদা, তার সঙ্গে এর তুলনা কোথায়?

দুপুর বেলা চিলের ডাক কত গভীর, কত তীক্ষ্ণ, সকালবেলার রোদ্দুর কত উদাস, ভাবতে পারার ক্ষমতা কত বেদনাময় এবং কত নিষ্ঠুর এই প্রথম সঠিক করে উপলব্ধি করলো। চিত্রলেখাকে ফটোগ্রাফের মত হুবহু ভাবতে পেরে চমকে উঠলো। মনে হলো বাংলাদেশে তার চোখে এর চেয়ে স্পষ্ট করে কোন মুখ কখনো ধরা পড়েনি। এই চোখ, এই ঠোঁট, এই চিবুক, চলবার, কথা বলবার, হঠাৎ ফিরে দাঁড়াবার এমন একটা দোলা দেওয়া ভঙ্গি আর নেই।

কিন্তু তাতে হর্ষর কি? আর একজন কারো, যে তার চেয়ে যোগ্য, তার চেয়ে সুনিশ্চিত, তার অনুভূতি হর্ষ কেন চুরি করে ভাববে? তাকে সরে যেতে হবে, দূরে, অনেক দূরে, অস্পষ্ট হয়ে, ঝাপসা হয়ে; তা না হলেই তো হবে কাপুরুষতা।

সুকোমলদা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন, কি, আজ মুখ গম্ভীর কেন?

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে চুপিচুপি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো হর্ষ। আলো জ্বাললো না। শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিল, ক্ষিদে নেই, ঘুম নেই, ভাবনা নেই। কিছু ভাবতে না পারলে বুকের কাছটায় কি রকম জ্বালা করে, কিছু না ভাবতে পারার শূন্যতা এত ভারি যে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মনে হয় পাগল হয়ে যাবে হয় তো। মস্তিষ্কের কোষগুলো শুকিয়ে আসছে, এক একবার মনে হচ্ছে একটা বোলতা ঢুকেছে মাথার মধ্যে। তার পাখার শব্দ কানের পর্দায় বাজছে, সে ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছে।

কপালে একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগতেই চমকে উঠলো হর্ষ।

—চল, খাবি চল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বললেন।

—না, ক্ষিদে নেই। বালিশে মুখ গুজলো হর্ষ।

—ওরে, মেয়ে মানেই তো পরের জিনিস—মার কথাটা শুনে হর্ষ প্রথমটা ভীষণ চমকে উঠেছিল, শেষটুকু শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, ও তো আর ভাই নয় যে চিরদিন তোর পাশে পাশে থাকবে।

মার গলাটা ভারি হয়ে এলো, আমার কি কষ্ট হচ্ছে না ? হচ্ছে। খালি বিছানাটার দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা হুহু করে যাক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নিজের ঘরে গিয়ে এবার সুখী হোক ও। একটা নিশ্বাস ফেলে ভাঙাভাঙা গলায় মা বললেন, চল, খেতে চল।

আর একবার এমনি অসম্পূর্ণ আর অর্থহীন মনে হয়েছিল পৃথিবীর দিন আর রাত,—আলো আর অন্ধকারকে। মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল একটা চৈতন্যহীন অন্ধকারের মধ্যে—ঝরাপাতার মত, সাপের খোলসের মত, মরা প্রজাপতির পাখার মত। চির মাটির মধ্যে মাটি হয়ে যাবার একটা শীতল বাসনা পেঁচিয়ে ধরেছিল তার সমস্ত মনকে—একটা দীর্ঘরেখা ময়াল সাপের মত।

কৈশোর আর যৌবনের সেই নামহীন সন্ধিক্ষণে জীবনটাই স্পষ্ট ছিল না নিজের কাছে, মৃত্যু তো আরো, মৃত্যু মানে একটা রোমাণ্টিক উন্মাদনা, স্পর্শকাতর স্নায়ুর তারে তারে একটা নিষ্ঠুর আঙুলে টানা অন্ধমীড়, তরল খড়্গের মত কেঁপে যাওয়া একটা ঝংকার—মুহূর্ত কণিকার ওপর ঝলসে যাওয়া একটা অসহ্য বিদ্যুৎ-জ্বালা। অর্থাৎ স্পষ্ট করে কিছুই নয়, অস্পষ্ট করে অনেক কিছুই।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, হাওড়ার পুলের মাঝ বরাবর রেলিঙ্‌এর ওপর ঝুঁকে পড়ে মৃত্যুকে যেন অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হলো—একটা স্থূল রসিকতার মত, একেবারে নীরেট, অনড়, হাস্যলেশহীন।

হর্ষ বহু নিচে তাকিয়ে দেখলো গঙ্গার নেশাচ্ছন্ন ঘোলাটে জলে ঢেউয়ের বরফিগুলো পিছল আলোর ক্ষেপ জালের মধ্যে ঝিকিয়ে উঠেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলো বন্দরের অমাবস্যা আকাশ, শ্লেটের মত নিথর, নিকষ। সেই কালিগোলা পটের ওপর আতসবাজির উল্কানৃত্য চলেছে। শিস টেনে হাউই উঠছে, উড়োন তুবড়ির উজ্জ্বল রেখাগুলো বর্শা ফলকের মত জমাট অন্ধকারের বুকের মধ্যে বিঁধে যাচ্ছে। তারপরেই ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত, এক একটা গুলির আওয়াজ।

কালীপূজোর রাত। হর্ষ রেলিঙ্‌টাকে কাঁপা হাতে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা ঝাঁটার মত মুখের ওপর এসে পড়ছে। বুকের বাঁ পাশটায় আবার সেই তীক্ষ্ণ ব্যথাটা খোঁচা দিচ্ছে। পাজরগুলো হারমনিয়ামের রীডের মত চেপে ধরলো ডান হাতের আঙুল দিয়ে যন্ত্রণাটাকে একটুখানি সহজ করে আনবার জন্যে, হাঁপানো নিশ্বাসটাকে আরো আস্তে করলো। চোখ দুটো জ্বালা করছে, মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে। পেটের মধ্যে একটা আগুনের হলকা। সকাল থেকে চার পয়সার মুড়ি ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। পা দুখানা টন টন করছে, কপালের দুপাশের রগ দুটো মনে হচ্ছে দড়ির মত পাকিয়ে গেছে।

শরীরের কথা ভাবছিল না বেশ ছিল, এখন মনে করতেই সমস্ত যন্ত্রণা তিল-তিল করে অনুভব করলো। মনে হল সমস্ত দেহটাই বিষিয়ে গেছে। অবশ্য মনেও এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বিষক্রিয়া চলছিল এখন তা থেমে গিয়ে অগাধ শূণ্যতা নেমেছে, সব কিছুকে অর্থহীন মনে হচ্ছে।

আজ তিনদিন ধরে চাকরীর চেষ্টায়, আশ্রয়ের চেষ্টায় কেবল ঘুরেই বেড়িয়েছে। পকেটে কিছু বেশী পয়সা থাকলে হয়ত কলকাতার বাইরে চলে যেত, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে এক বস্ত্রেই বেরিয়ে এসেছে, কিছু নিয়ে আসতে পারেনি। পকেটে যা সামান্য ছিল তাতেই সকাল পর্যন্ত ছাতু আর মুড়ি খেয়ে কেটেছে। কিন্তু এইবার সব শেষ।

তিনদিন আগের রাত্রিটা মনে করবার চেষ্টা করলো, আজ তিনদিন ধরে ক্রমাগতই যা মনে করেছে এবং বেঁচে থাকলে যে দৃশ্যটা সহজে মুছবে না মন থেকে।

জনার্দনবাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন দোতলার সিঁড়ির মাথায়। তাঁর রক্তাভ চোখ দুটো জ্বলছে।

—অনেক সহ্য করেছি তোমার বেয়াদপি। কথাটা জনার্দনবাবু কিন্তু কানে কানে বলার মত আস্তে করে বললেন।

হর্ষর রক্তও অনেকদিন থেকেই ফুটছিল, চোখে চোখে তাকিয়ে চাপা ঠোঁটে জবাব দিল, ভালই করেছেন।

আপনি করে কথা বলেছিল ইচ্ছে করেই, জানতো জনার্দনবাবুর কাছে এই ভঙ্গিটা কতদূর অসহ্য হবে।

একটা চড় এসে পড়লো মুখের ওপর সশব্দে। হর্ষ এতটা আশা করে নি। জনার্দনবাবুর সহিষ্ণু হাতের ওপর এতদিন ঢের বেশী বিশ্বাস ছিল।

চিৎকার করে উঠলো পাগলের মত, আমায় মারলেন আপনি কোন অধিকারে—মনে মনে অনেককাল থেকেই পিতাপুত্রের সম্পর্কটা অস্বীকার করে আসছিল হর্ষ, আজ তাই সচিৎকারে জানতে চাইল ব্যাপারটা।

একটা চাপা কান্নার মত মা পিছন থেকে হর্ষকে জড়িয়ে ধরলেন দুহাতে, বাবা!

জনার্দনবাবু তখন থরথরিয়ে কাঁপছেন। হর্ষ মার হাতের মধ্য থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতে বলল, কই জবাব দিন?

বিজলি আলোয় একবারের জন্যে মনে হলো জনার্দনবাবু পাণ্ডুমূর্তি হয়ে গেলেন। তারপর আবার রঙ ফুটতে লাগলো, মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়বেন হর্ষর ওপর। কিন্তু কিছুই করলেন না, নড়লেন না পর্যন্ত একচুল। তারপর একটুও না কাঁপা গলায় ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক যে অধিকারে তুমি এ বাড়িতে থাক, খাও।

—ও! হর্ষ বিশ্রী স্বরে হাসলো একটুখানি, তারপরে শক্ত বাঁকা গলায় বললো, সে তো আপনিই ঋণ শোধ করছিলেন, আমার কোন দোষ ছিল না।

—ঋণ শোধ? বিমূঢ় ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জনার্দনবাবুর গলাটা এতক্ষণে কেঁপে গেল।

—হ্যাঁ ঋণ শোধ। হর্ষ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল, আমার ঠাকুর্দা শিবশঙ্কর চৌধুরীর অনুবস্ত্রের ঋণ, আশ্রয়ের ঋণ। সেই ঋণ শোধ করছিলেন আপনি এতদিন।

—আশা করি সে ঋণ এতদিনে শোধ হয়েছে? জনার্দনবাবুর গলাটা অত্যন্ত করুণ মনে হলো যেন।

—আমিও সেই রকমই অনুমান করছি। হর্ষ জলের মত ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল। একটু উত্তাপ ছিল না, স্রোত ছিল না তার কণ্ঠস্বরে।

—বেরিয়ে যাও! জনার্দনবাবু হঠাৎ বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও এক্ষুণি আমার বাড়ি থেকে—

ফিনকি দিয়ে কান্না বেরুলো মার গলা দিয়ে। দুজনই যেন তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবু হর্ষকে শেষ অবলম্বনের মত আঁকড়ে ধরতে গেলেন সাবিত্রীবালা। হর্ষর হাতের চাপ লেগে মট করে তাঁর হাতের একখানা শাঁখা ভেঙে গেল, সিঁড়িতে তার শব্দ বাজলো ঠুনঠুন।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করো মা! কান্না চাপতে গিয়ে হর্ষর গলাটা কঠিন আর রুক্ষ মনে হলো—এরপর আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়।

হর্ষ লাফিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমেছে, সাবিত্রীবালা অস্ফুট আর্তনাদ করে পিছু পিছু ছুটে গেলেন, তবে আমাকেও নিয়ে যা, বাবা! আমি আর পারছি না।

হর্ষ একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, দমকা বাতাসের মত একতাল কান্না গলার কাছে এসে আঁটকে গেল যেন। একবার মনে হলো মার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুর মত।

—ভেবে দেখো। জনার্দনবাবু সাবধান করে দিলেন তার হটকারিতা লক্ষ্য করে।

হর্ষ উত্তর দিল না, একবার শুধু সতেজ ভঙ্গিতে মাথা তুলে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা তার অস্পষ্ট মূর্তির দিকে তাকালো। তারপরই চোখের পলকে দরজা খুলে অন্ধকার গলির মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পিছনে একটা মূর্ছিত চিৎকার দরজার কপাটের নিচে থেঁতলে গেল, হর্ষ আর পিছন ফিরলো না।

মনের মধ্যে নাটকীয় দৃশ্যটার অভিনয় হয়ে গেল আর একবার, প্রতিটি চরিত্রকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, উত্তুঙ্গ আবেগে, উত্তেজিত আত্মবিস্ফোরণে।

তারপরেই ধূসর যবনিকা নেমে এসে একটা নিরবয়ব অন্ধকারকে আলিঙ্গন করে দাঁড়ালো।

হর্ষর হাতের মধ্যে সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা রেলিঙও কখন ঘেমে উঠলো ধীরে ধীরে। একটা নিরক্ষর শূন্যতা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে ততক্ষণে। আর তাই আত্মহত্যাকে হঠাৎ মনে হল অর্থহীন ছেলেমানুষী, হাস্যকর রসিকতা। মৃত্যুকে নাকচ করে, তার ক্লান্ত দেহটা আবার চলতে শুরু করল। আঁকা-বাঁকা পায়ে, অস্ফুট চেতনা নিয়ে, বুকের মধ্যে খাঁচার পাখির মত ছটফটে ব্যথাটাকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে করতে বাকি রাতটুকু চালিয়ে দিল। গঙ্গা ফুরিয়ে গেল, ব্রীজ পড়ে রইল বহু পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে পথের মাঝখানে কখন থমকে গেল ফোর্ট আর মনুমেণ্ট। অমাবস্যা রাতের বাজি আঁকা আকাশ মাথার ওপর মিলিয়ে গেল এক সময় তুলির রঙিন টানে ভরা সস্ কাগজের মত।

ঘষা কাঁচের মত ঝাপসা চোখে যখন ভোরের দেখা পেল তখন হর্ষর প্রায় সম্বিত নেই। ঠাণ্ডায় এবং শ্রান্তিতে মুমূর্ষু পাখির মত একটা বাড়ির রকের ওপর বসে বসে ধুঁকছে। গাড়ির শব্দ, মানুষের কথাবার্তা, রেডিওর বাঁশি, কাকের ডাক, সব মিশে গিয়ে একটা আবছা তরল শব্দের কম্পন, জলের নিচে কান পাতলে যেমন শোনা যায়, তারপর রোদ্দুর যেন চৈতন্যের পরপার থেকে একটা চেনা স্পর্শ তার সারা শরীরকে আর একবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু তবু কিছুই চিনতে পারলো না হর্ষ, কোন রাস্তা, কোন পাড়া, কোন বাড়ির রক, কিছুই না। শুধু লাল ঠাণ্ডা সিমেণ্ট, সবুজ দরজা, ফিকে নীল পর্দা, হলুদ রোদ্দুর। শুধু এই, শুধু এইটুকু। দেয়ালে ঠেঁস দিয়ে বসে ক্ষীণ দৃষ্টিতে শুধু এইটুকু বোঝা গেল। মাথার কোষগুলো যেন বালু দিয়ে ভরে দিয়েছে কেউ, একটা শুকনো নীরেট যন্ত্রণা, শিরা উপশিরাগুলো ধপ্‌ধপ্ করছে সেই মরুভূমির মধ্যে। যেন মুছে যাওয়া যন্ত্রণার নদী।

হর্ষর অদ্ভুত একটা ভয় হলো, মনে হলো আলো কমে আসছে। হাওয়া ভারি হয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটা নিশ্চিত পরিণতির দিকে সে এগোচ্ছে, এগিয়ে এসেছে, অনেকটা, আর বড় বেশী বাকি নেই। বুক পকেট হাতড়ে একটুকরো কাগজ বের করলো অনেক কষ্টে, ফাউণ্টেন পেন খুলে কি যেন লিখবারও চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি, হাত কেঁপে গেল। টলমল অক্ষরগুলো বাঁকাচোরা রেখার স্তূপ নিয়ে অর্ধেক ফুটলো অর্ধেক ফুটলো না। আবার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো, মাথা ঘুরে গেল।

প্রথমে ভেবেছিল ঘুম থেকে জেগেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। শরীরটাকে মনে হলো ভয়ানক হাল্কা, পল্কা

শোলার মত, কিন্তু তবু একচুল নড়তে পারলো না। নরম বিছানার মধ্যে শুয়ে শুয়েই মনে হলো এ কোথায় !

সময়টা সম্ভবত সকাল, সোনালী রোদ্দুর দেখে তাই মনে হলো। ঘরের জানালা, সিলিং এবং ফিকে সবুজ দেয়ালে আঁকা ছবিগুলো তার চোখে অচেনা রকম এবং অসম্ভব রকম ভালো লাগলো। আর সেই মুহূর্তেই শিয়রে একখানা সুন্দর জাপানী ছবির মত রঙচঙে পরিচ্ছন্ন মুখ উঁকি দিল, পারমিতা বৌদি ! কিন্তু হঠাৎ এই অপরিচিত ঘরে তিনি কেন এবং কেমন করে এলেন ভেবে পেল না হর্ষ। ভেবে পেল না তার কি হয়েছে, কেন সে শুয়ে আছে।

—কেমন লাগছে এখন ? মৃদু হেসে পারমিতা বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা নরম হাত নেমে এলো কপালের ওপর। একবিন্দু রোদ্দুরের মত সোনালী ঘড়িটা চিকচিক করে উঠলো হাতের গলায়।

—ভালো লাগছে। কিন্তু আমি কোথায়...কেন...নিজের গলা শুনে বিশ্রী লাগলো হর্ষর, মনে হলো সরু গলায় আর কেউ তাকে নকল করছে।

—তুমি আমাদের বাড়িতেই আছো, কোন ভাবনা নেই।

—আমার কি হয়েছে ? আবার সেই পাখির মত গলায় হর্ষ জানতে চাইল।

—তোমার শরীর অসুস্থ, কয়েকদিন চুপ করে শুয়ে থাক, সেরে যাবে। পারমিতা বৌদি অন্য হাতে দুধের গ্লাস উঁচু করে তুললেন, এটুকু খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।

কপালে রাখা হাতটা সাবধানে ঘাড়ের নিচে নেমে গেল।

সকাল বেলাটা এমনি কেটে গেল। একবার শুধু ডাক্তার এলেন, ইঞ্জেকশানে এবং প্রেসক্রিপসনে দ্বিবিধ ওষুধের ব্যবস্থা করে নির্লিপ্ত মুখে তিনি বিদায় নিলেন। দুপুরে পারমিতা বৌদি নিজে হাতে খাইয়ে জানালার পর্দা এবং গায়ের কাপড় টেনে দিয়ে চলে গেলেন। তারপর বিকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে হর্ষর মনে হল তার শরীরটা অনেকটা ঝরঝরে হয়ে গেছে, সমস্ত ক্লান্তি ঝরে গেছে। শরীরটা যদিও খুবই দুর্বল এবং বুকের সেই ব্যথাটা মাঝে মাঝেই জেগে উঠছে, তবু তার মনে হল আবার সে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েছে। একা একাই কথা বলে প্রমাণ নিতে ইচ্ছে হল কিন্তু ভারি লজ্জা করলো। কেউ যদি শুনে ফেলে কি ভাববে !

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠেই সব কথা মনে পড়েছিল এক এক করে। সেই ঠাণ্ডা রাত আর ঝাপসা সকালের শেষ মুহূর্তটা পর্যন্ত মনে পড়লো। কিন্তু তারপরে কি আশ্চর্য উপায়ে যে সে এখানে এসে পৌঁছে গেছে সে রহস্যের উদঘাটন হলো না। প্রতি মুহূর্তে পারমিতা বৌদিকে আশা করতে লাগলো কিন্তু তিনি এলেন না, এল একজন অপরিচিতা নার্স।

পরদিন সকালেই পারমিতা বৌদি আবার এলেন। বেশ বোঝা গেল নার্সের হাতে রুগ্ন হর্ষর সমস্ত ভার দিয়ে তিনি মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। শীতের বেলা সাতটা বাজতে না বাজতেই ছুটে এসেছেন তার ঘরে। এসেই প্রথমে দেয়ালে টাঙানো তাপপঞ্জী লক্ষ্য করলেন, একটু ঘুরে তারপর ওষুধের শিশি সাজানো ছোটো টেবিলটায় চোখ বোলালেন।

নার্স ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কাছে এসে বললেন, সকলের আগে তোমার মাকে খবর পাঠাতে হয়, তিনি ব্যস্ত হয়েছেন।

কী ব্যাপার, কী বিপর্যয় ঘটে গেছে হর্ষর জীবনে, কোন দুর্ঘটনার ধাক্কায় শয্যাগত হর্ষ এখানে ছিটকে এসেছে সে কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক, মুখে পলকের জন্যও কোন কৌতূহলের রেখা ফুটলো না পারমিতা বৌদির। এটা বড়ই আশ্চর্য লাগলো তার কাছে। অস্বস্তিও জাগালো।

—অলকদা কোথায় ?

—পাকীস্তানে। মায়ের অসুখের সংবাদে কদিন আগেই দেশে গেছেন, এখন পর্যন্ত কোন সংবাদ নেই। তোমাদের বাসার ঠিকানাটা আমি জানি না, নইলে কালকেই খবর পাঠিয়ে দিতুম।

—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, একখানা পোস্টকার্ড পেলে আমিই খবর পাঠাতে পারবো। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।

—আছে বৈ কি, তোমাব মা যা ব্যস্ত হয়েছেন।

হর্ষ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বললো, কিন্তু আপনি তো ঘটনা কিছুই জানেন না—

—জানি বৈ কি, প্রায় সবটাই জানি—সস্নেহে তাকালেন তার দিকে।

—কী করে ? প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলো হর্ষ।

খাটের এক প্রান্তে বিছানার ওপর বসে পড়ে পারমিতা বৌদি বললেন, তুমি বাড়ি থেকে চলে আসবার পরেই তোমার মা অত্যন্ত কাতর হয়ে তোমার অলকদাকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি সবই জানিয়েছিলেন, এমন কি তোমার বাবা যে একদম নির্বিকার রয়েছেন তাও।

জানালার দিকে তাকিয়ে তিনি চুপ করলেন।

হর্ষ জিজ্ঞাসা করলো, তারপর ?

—তারপর ?—পারমিতা বৌদি যেন মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তোমার দাদা তো এদিকে দেশে চলে গিয়েছেন, আমি একা, তোমাদের বাসা চিনিনে, বাসার কাউকেও না। এমন কি ঠিকানা পর্যন্ত আমার অজানা। পড়ে পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে থাকলো, একটু চিন্তিতও। কি হল ছেলেটার। কিছু একটা না করে বসে থাকে। থানায় এবং হাসপাতালে ফোন করা ছাড়া আমার করণীয় কিছুই ভেবে পেলুম না।

চুপ করলেন একটুখানি, টানটান ভুরুতে, চোখে একটুখানি আলো খেলা করে গেল। হয়ত একটুখানি করুণা। জানালা দিয়ে ইউক্যালিপটাসের রোদে ভেজা ছায়া মুখের ওপর এসে পড়লো আভার মত।

—তারপর পরশু দুপুরে—আবার তিনি হর্ষর দিকে তাকিয়ে বলে চললেন, হঠাৎ কালীঘাটের এক অপরিচিত ভদ্রলোক ফোনে তোমার অলকদাকে ডাকলেন। তাঁর কাছেই জানলাম অচেতন অবস্থায় তুমি তাঁদের বারান্দায় পড়েছিলে। তোমার হাতের মধ্যে একটুকরো কাগজ ধরা ছিল, তাতে জড়ানো অক্ষরে ছিল তোমার অলকদার নাম আর ঠিকানা। সম্ভবতঃ জ্ঞান হারাবার আগে তুমি নিজেই লিখেছিলে।

—হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলুম। মনে পড়েছে, আর কিছু বলতে হবে না। শুধু আর একটা কথা—

পারমিতা বৌদি ব্যস্ত হয়ে বললেন, জিজ্ঞাসা করো।

—সত্যি করে বলুন তো আমার কি হয়েছে?

কিছুক্ষণ কথা বললেন না, মনে মনে বিচলিত হয়েছেন বোধ হলো।

—বলুন, আমি ভয় পাবো না। হর্ষ অধৈর্য কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব সংযত করে বললো।

—ড্রাই প্লুরিসি। শুকনো গলায় পারমিতা বৌদি জানালেন।

একটি একটি করে পনের দিন পার হয়ে গেল। হর্ষর বুকের ছুঁচ ফোটানো ব্যথাটা একটুখানি কমলেও একেবারে সারলো না, মুখ বুজে দিন রাত বিছানায় পড়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। হাতের কাছে যথেষ্ট গল্পের বই থাকলেও পড়তে ইচ্ছে করে না, সারাদিন কি যে করে! একখানা এক্সারসাইজ খাতায় মাঝে মাঝে এক আধপাতা বড়ো জোর লেখে, তারপর ক্লান্তি বোধ করলেই খাতা কলম একপাশে সরিয়ে রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

এদিকে পারমিতা বৌদিরও অবকাশ ছোট হতে থাকে তিল তিল করে। আগের মত পুরো মনোযোগ আজকাল আর তিনি দিতে পারেন না। তাঁর নানা কাজ। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, কোথায় ছবির একজিবিশান হবে তার পরিকল্পনা, কোথায় কোন চিত্রশিল্পীকে তাঁদের শিল্পী গোষ্ঠির তরফ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে তার পরামর্শ। কিন্তু শতকাজে ব্যস্ত থাকলেও হর্ষর সুখ সুবিধার দিকে ঠিক নজর রেখেছেন, নেপথ্য থেকে হলেও হর্ষর সমস্ত প্রয়োজনের যোগাড় আসছে ঠিক মতই।

আর তাই এসেই হয়েছে যত মুস্কিল। প্রতিটি মুহূর্তে কারো অনুগ্রহ আর অনুকম্পা নিতে হচ্ছে দুহাত পেতে, এই অনুভূতিটাই তাকে বড়ো অস্বস্তিতে ফেলেছে। যদি অলকদা কাছে থাকতেন তাহলে হয়ত এতটা হতো না।

কিন্তু পারমিতা বৌদি নিতান্তই দূরের জন, প্রকৃতপক্ষে কোন সম্বন্ধই নেই তাঁর সঙ্গে। তিনি শুধু শুধু দুর্ভোগ ভুগতে যাবেন কোন দুঃখে। তিনি সৌখিন মানুষ। তুলি রঙ আর প্যালেট নিয়ে তাঁর কারবার। আয়না আর ইজেলের সামনে তাঁর মনোযোগ। কোন ছেলে বাড়িতে ঝগড়া করে এসেছে, তাকে পরিচর্যা করতে হবে এবং তাতেই আন্তরিক আনন্দ পেতে হবে, এটা মনস্তত্ত্ব সম্মত কথা নয়। বরং নতুন নতুন রং তৈরীতে তাঁর বেশী আনন্দ পাবার কথা। কিউবিজম্-ইম্প্রেশনিজম্-এর সিনসিয়ারিটি নিয়ে তুলি-কলম চক্রের সেক্রেটারীর সঙ্গে রবিবার সন্ধ্যায় ঘণ্টাদুই বিতর্ক বেশী জমবার কথা।

কিন্তু একেই হয়ত কোন বিশেষ কমপ্লেক্সে ভোগা বলে। অসুখ হলে এমনিতেই মনটা বড়ো বেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে, তার ওপর পরিবেশটা যখন ভাববার মত।

হর্ষ বালিশের ওপরে বুক রেখে শুয়ে লিখছিল। বেলা গোটা চারেক হবে। পর্দার ওপিঠে পারমিতা বৌদির গলা শোনা গেল।

—এসো, এই ঘরে এসো।

তারপর পর্দা তুলে একটি অপরিচিতা মেয়েকে পথ করে দিলেন। হর্ষ মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল, মেয়েটি ঘরের মধ্যে তিন চার পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো।

পারমিতা বৌদি হর্ষর খাটের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, হর্ষ, লতিকার সঙ্গে ততক্ষণ গল্প করো, আমি ডাক্তারবাবুকে একটা ফোন করেই ফিরে আসছি।

ঠিক এই ধরণের আদেশের জন্যে দুজনের কেউই প্রস্তুত ছিল না, পারমিতাদি অন্ততঃ আলাপ করিয়ে দেবেন তাদের, ঘরে ঢোকবার সময় লতিকা ভেবেছিল মনে মনে।

দুজনেই বোবার মত তাকিয়ে থাকলো দুজনের দিকে, কি ভাবে শুরু করবে ভেবে পেল না। লতিকা এগোবে না পেছুবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হাত তুলে নমস্কার করে ফেললো।

কোন রকমে বিছানার ওপরে উঠে বসে প্রতিনমস্কার করে হর্ষ, বললো, আপনি হয়ত পারমিতা বৌদির ব্যবহারে অবাক হয়েছেন, কিন্তু কি ব্যাপার হয়েছে এবারে আমি ধরতে পেরেছি...দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ওই চেয়ারটাতে বসে পড়ুন।

—হ্যাঁ। বোকার মত একটুখানি হেসে লতিকা বললো।

ছিপছিপে চেহারা এই লতিকাকে কলেজে কোন দিন দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না হর্ষ। ঈষৎ লম্বা গৌরবর্ণ মুখখানায় অসবর্ণ ঠোঁট দু-খানা

খুব মানায় নি, রং মাখলে কাউকেই মানায় না, একটা অস্বাভাবিক পুতুলের মত মুখশ্রী আসে মাত্র।

—পারমিতা বৌদিকে আমি একদিন বলেছিলাম যে আপনাকে আমি চিনি। অবশ্য ভুল করেই বলেছিলাম।

—হ্যাঁ, বোধহয় সেই জন্যেই, লতিকা এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে কথা বললো, ওঁর কি রকম ধারণা জন্মেছে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আলাপ আছে। আসল কথা আমি কিন্তু আপনাকে চিনতাম, অনেকদিন থেকেই আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। ওটা কি লিখছিলেন, কবিতা নাকি ?

—না, না, কবিতা নয়, হর্ষ লজ্জিত হয়ে খাতাটা আর একটু সরিয়ে রাখলো, এমনি যাচ্ছে তাই লিখছিলাম।

—আমাকে দেখান না ?

—না না , এ আপনি কি দেখবেন। আজে বাজে ব্যাপার।

—আপনার কাছে ওমনি মনে হচ্ছে অন্যের তা নাও হতে পারে।

—আচ্ছা, সবটা লেখা হলে দেখাবো।

—গল্প ?

—না উপন্যাসের খসড়া বলতে পারেন।

—আপনি এখন থেকে এখানেই থাকছেন বুঝি ? অলকবাবু নেই বলে ?

হর্ষ অপ্রিয় প্রসঙ্গটাকে কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্যে বললো, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তো আছিই।

—ভালোই হলো মাঝে মাঝে এসে বাংলাটা আপনাকে দিয়ে দেখিয়ে নোব। বাংলাটাকে বড্ড নেগ্‌লেক্ট করেছি এত দিন। আর চলবে না, টেস্ট এসে গেল তো।

তারপর আরো অনেকক্ষণ গল্প করে লতিকা বিদায় নেবার পর পারমিতা-বৌদি হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন তোমাকে টেস্ট পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু, মনে রেখ।

হর্ষ মনে মনে বললো, আগে একবার সেরে উঠতে দিন।

অলকদার খবর জানা গেছে।

তাঁর মা মারা গেছেন তাই ফিরতে প্রায় মাসখানেক দেরি হবে। চিঠিতে সেই কথাই লিখেছিলেন।

পারমিতা বৌদি লিখেছিলেন, শ্রাদ্ধ কলকাতার বাড়িতে হলে উপযুক্ত আয়োজন করা যেত, ওখানে জঙ্গলের মধ্যে কেই বা আছে।

উত্তরে অলকদা লিখেছিলেন, মার আত্মার শান্তি হয় সেই ব্যবস্থাই করছি। বেঁচে থাকতে যাঁকে ভুলে ছিলাম, আজকের দিনে অন্ততঃ তাকে স্মরণ করতে

দাও। আর জঙ্গলের কথা লিখেছ, সাগতা গ্রামে জঙ্গল আছে সত্যি কিন্তু সেই সঙ্গে দু চারজন মানুষও রয়েছেন। যাঁরা মাকে শেষ সময়ে দেখেছেন।

পারমিতা বৌদি অপমানিত হয়ে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন, কিন্তু তোমার ব্যবসা যে ডুবতে বসেছে। তারও জবাব এসেছে গতকাল, ডুবুক। চোখে চোখে না রাখলেই যে জিনিস ডুবতে বসে, তার ডোবাই ভালো।

পারমিতা বৌদি ঠিক বুঝতে পারলেন না, এই কথাটার অন্য কোন মানে আছে কি না।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েও অলকদার পোস্টকার্ডগুলির কথা মনে পড়লো হর্ষর। মনে হলো সাগতা গ্রামে ফিরে গিয়েই অলকদা প্রথম নিজেকে চিনতে পেরেছেন। এ আর অলি সেন নয়, ব্যবসায়ী মহলে যিনি লৌহ-ব্যবসায়ী হিসাবে আয়রণম্যান নাম পেয়েছেন তিনিও না, এ ছিটের হাফ-সার্ট পরা সেনেদের বাড়ির অলকা। বুড়ীমা যে ফটোটার দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতেন প্রতিদিন দুপুর বেলায়।

হর্ষর চোখের কোলে জল এলো। ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে জানালার শার্সির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারের মধ্যেই কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলো নিচের বাগানটার দিকে। পারমিতা বৌদির ঘরের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক ঝাঁক রাত জাগা আলোর রেখা লুটিয়ে পড়েছে সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারের বেডের ওপরে। এক ঝাঁক রঙিন পালক যেন কেউ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

হর্ষ মনে মনে বললো, আর নয়।

প্রথমে সদরে একটি মধ্যবয়সী কাঠের দরজা, সেটা পেরোলে কয়েক গজ উঠোন দেখা যায় এবং দেখা যায় তাতে আরো আশ্চর্যজনক ভাবে মানকচুর কয়েকটি ইতস্ততঃ উদাহরণ গ্রাহ্য হয়েছে।

আর আছে একটি বড়ো আম গাছ, মাটিতে অবিরাম পাতা ঝরিয়ে ছিটিয়ে সে খেলা করে। বিশেষ ঋতুতে কাকের বাসা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হাপুসনয়ন বৃষ্টিতে ভিজে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পীচের রাস্তার বেদের মত খেলা দেখায় মাথার রোদ্দুর ফুসমন্তরে পায়ের নিচে ছায়া করে দিয়ে।

এই যে বহুরূপী আমগাছটা, এটাই ক্রীকলেনের এই বাসার একমাত্র আকর্ষণ। অন্ততঃ হর্ষর তাই মনে হয়। তার একখানা মাত্র ঘরের সামনেকার সঙ্কীর্ণ, হ্রস্বাকৃতি, ঢাকাবারান্দাকে আমগাছের পল্লব বহুল মাথাটা যেন ঘেরটোপ পরিয়ে দিয়েছে। দিনের বেলায় আধছায়া, আর রাতের বেলায় সেখানে চাপ বাঁধে জমাট প্রগাঢ় ছায়া।

দোতলার এই বারান্দায় তখন দাঁড়ালে পাখির ডানা ঝটপটানি আর অস্ফুট মৃদু ডাক কানের কাছে বাজতে থাকে। কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ঘুম পেয়ে যায়।

বাড়িটার অ্যানাটমির জ্ঞান প্রথম দর্শনে কারোই আয়ত্তে আসে না। হর্ষরও কয়েকটা দিন সময় লেগেছিল ভালো করে বুঝতে। নিচতলায় একটি বাসের উপযোগী ঘর ছাড়াও কয়েকটি গম্ভীর গুদাম প্রকৃতির ঘর রয়েছে। প্যাকিং বাক্স, লোহা লক্করের টুকরো, কিছু বহু হাত ফেরা, রঙচটা, অঙ্গহানি-ঘটা ছড়ানো আসবাব ঠাশা রয়েছে ঘরগুলোয়। তারপর উঠোনের যে কোনটায় সার্বজনীন চৌবাচ্চাটাকে হাড়িকাঠের অজ মূর্তির মত করুগেটের টিন বসিয়ে আধখানা করা হয়েছে, অর্থাৎ কল এবং চৌবাচ্চার অর্ধেক অংশকে নেপথ্যে পাঠিয়ে স্পষ্টতই মহিলামহল বানানো হয়েছে সেই দিকের বারান্দার ওপরে একটা টেবিল আর চেয়ার বসানো। টেবিলটার ওপরে সর্বক্ষণ বসানো থাকে একটি হাড় জিরজিরে টাইপরাইটার, যখন চলে পাথরে টাট্টু ঘোড়ার মত, ধীর চাল, কিন্তু শব্দ প্রত্যয় বিস্তর। এবং তৎসহ টাকমাথা রোমকণ্টকিত এক ভদ্রলোক, স্যাণ্ডো গেঞ্জিতে আর সবুজ লুঙ্গিতে সমান্তরাল হয়ে দৃষ্ট হন।

সিঁড়ির ধাপ পৌনে একতলার নাক বরাবর উঠেই দুই তরঙ্গে বিলকুল ভাগ হয়ে যায়, অনেকটা সিঁথির ভঙ্গিতে, বামে শীর্ণ অস্তিত্ব, ডানদিকে পর্যাপ্ত

বিস্তার। তারপর বাঁ-হাতি সিঁড়ির ঢেউটা দোতলার এই বাম বারান্দার পদতলে এসেই নির্বাণ লাভ করেছে, আর এগোয় নি মাথা তুলে। তাই তিন তলার কৌতূহল এপথে মিটবে না, সে অন্য সিঁড়ি, অন্য পথ। বলতে গেলে গোটা বাড়িটা দোতলার এই পঙ্গু অংশটার দিকে একানুবর্তী পরিবারের মত ভেতরে ভেতরে পিঠ ফিরিয়ে আছে অদ্ভুত ঔদাস্যে।

বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। বাড়ির বাসিন্দারা আরও। এই ফিরিঙ্গী পাড়াটার চালচলনই বিচিত্র রকমের, বর্ণচোরা গিরগিটির মত, প্রহরে প্রহরে রঙ বদলায়। বানানো কথা নয়, সত্যিই বহুরূপী আছে দুচারজন। তাদের সোমবারে একরকম চেহারা, শনিবারে আর একরকম। তাদের সারা জীবনের স্বপ্ন এবং আকাঙক্ষা অশ্বারোহী হয়েই কাটালো। বংশ পরম্পরা ধরে রক্তে তাদের ঘোড়ার খুরের ধ্বনি মিশে গেছে। শুধু বার মিলিয়েই আশ্চর্য হবে তা নয়, ঘড়ি মিলিয়েও। সকালের চেহারার সঙ্গে সন্ধ্যার ক্রোশখানেক ফারাক।

যাই হোক পাড়ার লোকচরিত্র এই গল্পের এলেকাভুক্ত নয়, তাদের প্রসঙ্গ তোলাও নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই বাড়ির বাসিন্দাদেব কথাই একটু আধটু যা বলা যেতে পারে।

একতলার ভদ্রলোকের নাম বিলাস পবামাণিক। তাঁর চেহারার বর্ণনা একটু আগেই দেওয়া গেছে, এবার তাঁর স্বভাবের। শেয়ালদা স্টেশনের গায়ে, সার্কুলার রোডের ওপরে তাঁর ফার্ণিচারের দোকান। পুরনো আসবাব সংগ্রহ করে এনে মেজে ঘষে সারাই করে, রঙ বার্ণিশ লাগিয়ে প্রায়, নতুন আসবাবের মূল্যে বিক্রী করেন ভদ্রলোক। লেটার বক্স থেকে সুরু করে চেয়ার টেবিল মায় পালঙ্ক পর্যন্ত তাঁর পণ্য সামগ্রী। খুব অল্প সময়ই বাড়ি থাকেন তিনি। খুব সকালের দিকে কিছুক্ষণ তাঁকে উঠোনে বারান্দায় দেখা যায়। ভর দুপুরে এক ঝলক বাড়ি আসেন, সম্ভবত আহার ব্যাপারে। তারপরে সেই রাত সাড়ে দশটা এগারটায়। কোন কোন দিন গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন। সেদিন রিক্সার ঠুনঠুন আওয়াজ বাড়ির সদর ছুঁয়ে যায়। মসমসে জুতোর শব্দে টের পাওয়া যায় তাঁর পা ঈষৎ টলছে, গলার স্বর ঈষৎ উচ্চগ্রামে এবং জড়ানো।

হর্ষ তখন টেবিল ল্যাম্প জেলে লিখুক বা পড়ুক অথবা একেবারেই অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে শিয়রের জানালাটা দিয়ে বাইরের অনতিদূরের গীর্জার চূড়ার দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকুক, কিংবা নায়ক নায়িকার জীবনের কল্পিত জটিলতা দিয়ে আস্ত একখানা দ্বন্দ্ব সমাস জমিয়ে তুলবার চেষ্টায় থাকুক, ঈষৎ চমকে গিয়ে কান পেতে শুনবে।

কয়েকটা রাতপাখি ঝটপট করে উড়ে পালাবে পাখার শব্দ করে, প্যাঁচা কিংবা বাদুড়। বিলাসবাবুর জড়িত কণ্ঠের চিৎকারে এই ঘুমন্ত বাড়ির একটি আধ ঘুমন্ত বুক দুরুদুরু করে উঠবে।

—কমলা দরজা খুলে দে...আ-মি...মাতাল হইচি...ককখনো না... কোন্ শা—

কাটা কাটা টুকরো কথাগুলো যেন টলতে টলতে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়, তার ফাঁকে ফাঁকে আচমকা কমা সেমিকোলনের মত হেঁচকির বঁড়শি বেঁধে—ভরা বোতলের কর্ক খোলার মত আওয়াজ করে, বাক্য প্রান্তের তালব্য-শয়ে আকারটি শেষ পর্যন্ত একটা ঘড়ঘড় অর্থহীন দীর্ঘাকারে রূপ নিয়ে থেমে যায়। দরজা খোলার শব্দ হয়, কমলা হয়তো গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে ত্রস্ত পায়ে উঠে এসে খিল খুলে দিয়েছে, কিংবা বিলাসবাবুই কোন কৌশলে খুলে নিয়েছেন। এবাড়ির সদর দরজাটা বাইরে থেকে খোলা যায়।

তারপর দুচারটে ছোটখাট জিনিসপত্রের আছাড় খাওয়ার কিংবা গড়িয়ে পড়ার শব্দ হবে, খুট্ করে সুইচ জ্বালবে...বিলাসবাবুর দুর্বোধ্য কণ্ঠ আরো কিছুক্ষণ বক্তৃতা করে যাবে। একটু পরে আলো নিভবে, কথাও। কমলার একটিও কথা শোনা যাবে না কিন্তু, লজ্জায় ভয়ে বিবর্ণ হয়ে সে হয়ত জ্যাঠামশাইয়ের বিছানার মশারিটা ঠিক করে গুঁজে দিয়ে আবার শুতে যাবে। ব্যস্ সব শান্ত। হর্ষ আবার নিজের চিন্তায় ফিরে যাবে।

এবাড়ির তেতলায় যে সমস্ত নরনারী থাকে, তাদের বাড়ির বাইরে যাবার এবং ফেরবার পথ যদিও ছক বাঁধা, তবু এই উঠোন আর তাদের মনে ধরে না, মাটিতে পা পড়ে কি না পড়ে, সামনে চেয়ে এগিয়ে যায়। পুরুষরা কখন সখন যেতে যেতে জলের শব্দ পেলে পার্টিশানের ওপিঠে তাকাতে চেষ্টা করে, কমলার ডাগর আঁটসাট চেহারা এক ঝলক দেখে নিতে চায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, উঠোনের ছকবাঁধা রাস্তার বাইরে তাদের পা তো পড়েই না, বরং সেই পথটুকুও যেন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যায়, দাবার ব'রে যেমন ছক ডিঙিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য ওদিককার দোতলার বিষ্ণু বাবুদের কথা স্বতন্ত্র।

প্রথম যেদিন অলকদার বাড়ি থেকে সোজা এবাড়িতে চলে আসে হর্ষ, সেদিন তখনও কিছুই ঠাহর করতে পারেনি। ঘরখানা পেয়েছে পঁচিশ টাকা ভাড়ায়। তা সস্তাই বলতে হবে। এই পাড়ায় এমন একটা বাড়ির মধ্যে থেকে এক খাব্‌লা মেরে ঘর বের করা গজেন ছাড়া আর কেউ পারতো না। ওদেরই একটা কানে শোনা সম্পর্ক ছিল বাড়িওলার সঙ্গে, ঠিক সুলুক সন্ধান রেখে ঘর-খানা আদায় করে দিয়েছে। আর ঠিক এই রকম একটা আশ্রয়ই হর্ষ মনে মনে খুঁজছিল অনেক দিন ধরে। বিরাট পুরীর মধ্যে প্রায় অজ্ঞাতবাস। না হবে কেউ তার সম্বন্ধে কৌতূহলী, না হবে সে। একটিমাত্র দরজা বন্ধ করে দিলেই তুমি ভিতরে, পৃথিবী বাইরে। এইভাবে বাস করে সুখ আছে, যেমন সুখ আছে আয়নার সামনে একলা দাঁড়িয়ে। নিজেকে দেখা, নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা মুহূর্তে মুহূর্তে, প্রহরে প্রহরে। শুধু মুগ্ধতা নেই, আছে আত্মবিশ্লেষণ।

প্রথম দিনের কথা মনে পড়লো। হাতে কি একটা কাজ ছিল লেখার। সারতে সারতে যখন খেয়াল হল তখন খিদে চড়েছে। বেলাও। তাড়াতাড়ি গজেনের কাছ থেকে ধার করা স্টোভটা ধরিয়ে সে ঘরের এক কোণের ঠোঙা-গুলো ঘেঁটে চাল আর ডাল আবিষ্কার করলো। গজেনটা এবিষয়ে খুব তুখোড়, অতি সামান্য করে হলেও খুঁটিনাটি দরকারী জিনিসগুলোর কিছুই প্রায় বাদ দেয়নি। কাল সারা বিকেল বেলাটা হর্ষ যখন ক্লান্ত হয়ে মেঝেয় মাদুর পেতে লম্বা হয়েছিল, ও তখন অক্লান্তভাবে বন্ধুর নতুন পাতা ঘর গুছিয়ে দিয়েছে। আসবাব কিছুই যদিও নেই, তবু হাঙ্গামা কি অল্প। একেবারে স্টেজ রিহার্শাল দিচ্ছিল মনে হয়, শুধু মুখে নয়, হাতে কলমে।

—বিছানাটা যখন করবি, এই জানালাটার সামনাসামনি, বুঝলি? তারপর গুটিয়ে ওই কোণে। বইগুলো ওই দেয়ালের গায়ে শেল্‌ফের মত করে রাখা থাকলো, পড়া হয়ে গেলে আবার ঠিক মত রেখে দিবি। তুই যা অগোছালো, বাব্বা:। রান্নার চালডাল আপাতত কাগজের ঠোঙায় থাক, পরে মনে করে মাটির হাঁড়ি আর মশলা পাতির জন্যে ভাঁড় কিনে আনতে হবে। আর এই রইল সাবান, এই গামছা দড়ির এককোণে, কি ঘুমোলি নাকি...

প্রথমটা গজেনের নির্দেশগুলো শুয়ে শুয়েই দুচোখে অনুসরণ করছিল, পরে একটা হাই তুলে চোখ বন্ধ করবার পর থেকে, গল্পের শ্রোতার মত এক আধটা হুঁ দিয়ে চলছিল আর কি। এই সব নিছক ব্যাপারে অতখানি মনোযোগ ব্যয় করা তার কাছে অপব্যয়ের সামিল, কারণ নিশ্চিত্ত জানে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে বড় জোর দিন দুয়েক চলবে, তারপর যে কে সেই। সূচীপত্র ছেঁড়া বইয়ের মত তাকে হাতড়ে হাতড়েই সব খুঁজে বের করতে হবে।

আরো মিনিট কয়েক এক নাগাড়ে বকে গজেন তার বিবরণী শেষ করলো। তারপর চলে যাবার মুখে বলে গেল, দুপা এগিয়ে গেলেই হোটেল পাবি। দোকানপত্রও হাতের কাছে। যখন হাত পোড়াতে ইচ্ছে যাবে না, তখন গিয়ে হাত পাতবি। শুধু একটা কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখে চলবি সব সময়, এবাড়ির কারো উপচিকীর্ষা গায়ে মাখবি না, এড়িয়ে চলবি যথাসম্ভব।

গজেনের উপদেশের ভঙ্গি এবং ভাষায় হর্ষর এমন মুহূর্তেও হাসি পেল, ইস্কুল জীবনে এই উপচিকীর্ষা শব্দটা দিয়ে বোধহয় বার তিনেক বাক্য রচনা করেছিল, এইবার নিয়ে চারবার হলো। সত্যি গজেনের কথা আর কাহিনী মন দিয়ে লক্ষ্য করলে কার না হাসি পাবে। অথচ ছেলেটা সেণ্ট পারসেণ্ট সিরিয়াস এসব ব্যাপারে।

তারপর সেই সকালে চালডাল আবিষ্কার করে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার হল, শুধু চাল, ডাল, তেল, আর মশলায় রান্না হয় না, হোক না কেন সাদাসিদে খিচুড়ী সেটা। জল চাই। অথচ জলের কথা একবারও মনে

পড়েনি এর আগে। বালতিটা ঠন্ ঠন্। কুঁজোতে যে পরিমাণ জল রয়েছে, বড়োজোর এক পেয়ালা চা হতে পারে তাতে।

তাড়াতাড়ি কলতলা ছুটলো বালতি হাতে করে। কিন্তু বেলা দশটার সময় সে যাত্রাও নিষ্ফল হলো, কলটি ততক্ষণে একেবারে চুপ মেরে গেছে। খোলা চৌবাচ্চাটার জল দিয়ে তো আর রান্না করা যাবে না। মনটা খিঁচড়ে গেল।

ঘরে ফিরে গিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে এমন সময় দরজার বাইরে জলের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ কুঁজো থেকে জল ঢালছে মনে হল। চমকে তাকিয়ে হর্ষ কাউকে দেখতে পেল না, শুধু টের পেল তার বালতি উধাও হয়েছে। দরজার পাশটিতে ছিল একটু আগেও, একমুহূর্তে অদৃশ্য হয়েছে। তক্ষুণি ছুটে বেরুতে পারলে কাজ হতো, কিন্তু কাপড়টা ভাল করে না পরে তা কি করে সম্ভব।

যখন বেরোলো তখন বারান্দা খালি, কেউ এসেছিল বলে মনে হয় না। শুধু প্রমাণটুকু রয়েছে। তার বালতিতে কে জল ঢেলে রেখে গেছে, জলটা তখনও কাঁপছে। হর্ষ একমুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর জানালায় বসে গির্জার পিছন দিককার বাগানটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। প্রখর রৌদ্রে গাছগুলো যেন মাঝে মাঝে কোমল দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে, থেকে থেকে খেয়ালী হাওয়া। একটা নির্জন নিশুতি ভাব। রোদ্দুর ছায়ার রেখা টেনে টেনে ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। একটা পাখির ডাক কানে আসছে, কলকাতাব বুকে হঠাৎ উড়ে আসা কোন পাখি হবে বোধহয়। নইলে এমন সতেজ কণ্ঠ পাবে কোথায়।

মাকে মনে পড়লো। সেই অব্যক্ত কান্নার মত মা, যাঁকে মাস পাঁচেক আগের রাত্রে ছেড়ে আসতে হয়েছে। মণিরাকেও মনে পড়লো। বাবার কথা মনে হলো। কোন রাগ নেই তাঁর ওপর কিন্তু একটা গভীর অনুরাগহীন ঔদাস্য জাগে মনে মধ্যে কেন জানি।

দরজা খুলতেই একটি ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, সকাল বেলায়ই একটু বিরক্ত করতে এলুম, মশাই নিশ্চয়ই খুব খুশী হতে পারলেন না?

—না না, সে কি কথা—হর্ষ অখুশী ভাবটা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেতে দিল না।

দাঁতনটা ঠোঁটের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে লোকটি এবার দু-পা এগিয়ে এলেন খুশীতে ডগমগ হয়ে, জানতুম মশাই, এ আমার জানাই ছিল—তারপর হর্ষকে প্রায় ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে হেসে বললেন, মানুষ চিনতে এই বিষ্ণু মিত্তিরের ভুল হয়না, প্রথমে যেদিন এ বাসায় এলেন...আহা একি করেছেন

এ যে দেখছি সবই বাংলা উপন্যাস...একেবারে কোরা নতুন মনে হচ্ছে। আপনি গুণী লোক মশাই, তবে হ্যাঁ, একটু ইয়ে আছেন তাও বলবো, মানে, খামখেয়ালী উদাসীন আরকি। নইলে—

হর্ষকে একটি কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে ভদ্রলোক প্রায় বাৎসল্য স্নেহে ঘরের কোণের বাংলা উপন্যাসের স্তূপটিকে আলিঙ্গন করতে ছুটলেন।

বইগুলোর বেশীর ভাগই সমালোচনার জন্যে পাওয়া, দু-চারখানা পরিচিত লেখকদের দেওয়া উপহার। ভদ্রলোক ততক্ষণে দাঁতনটি কামড়ে ধরে একের পর এক বইগুলির মলাটে হাত বুলোচ্ছেন।

ভদ্রলোকের পরিচয় হর্ষ তখনো জানে না, তবে এ বাড়িরই কোন অংশের যে বাসিন্দা তাতে ভুল নেই। আসতে যেতে বহুবার উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে দেখেছে, পরনে একখানা ছাপা শাড়ি লুঙ্গির মত করে পরা। চৌবাচ্চার কাছ দিয়ে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে একতলার ঘরগুলোর দিকে মধ্যে মধ্যে নজর রাখছেন। দাড়ি গোঁফ নির্মূল করে কামানো, বেশ কবিৎকর্মা গোছের লোক বলে মনে হয়েছে।

—কিছু না।—ভদ্রলোক হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে মুখ তুললেন, স্রেপ একটু খবর দেওয়া, তাহলেই সব ম্যানেজ হয়ে যাবে, বুঝলেন?

হর্ষ কিছুই বুঝলো না, একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

—অ্যাই দেখুন, আসল কাজটাই বাকি রয়েছে, নিজের পরিচয়টিই বাকি রেখেছি, আর ওমনি আপনারটাও এতক্ষণ কোন্ না জেনে নেওয়া উচিত ছিল—এতদিন তো রোজই মশাই ভাবতুম, যাই, মশাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ সালাপ করে আসি—কিন্তু আপনার বৌদি বুঝলেন কিনা, যার তার সঙ্গে অমন ধাঁ করে আলাপ করা পছন্দ করেন না। তা বলে একটি গুণ অস্বীকার করবো না মশাই, স্রেপ একটু খবর দেওয়ার যা বিলম্ব—দেন্ শি উইল কাম হিয়ার উইদিন থ্রি মিনিটস্—বই পত্রকে অমন প্রাণ ঢেলে ভালোবাসা, মশাই, অনেক মেয়ে মানুষ আপন স্বামীকেও বাসেনা—

কথার ধরণ দেখে হর্ষ একবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আচ্ছা লোকের খপ্পরে পড়েছে যা হোক।

—তা তো বটেই।—হর্ষ মরিয়া হয়ে বললো, কিন্তু আপনি এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—এই দেখুন, আপনি অমন পর পর ভাবে কথা বলেন কেন, এগুলো কি আমি বিক্রমপুর পাঠাচ্ছি না ঝাড়গ্রামে, যে ব্যস্ত হচ্ছেন। আসলে এ মশাই আপনার নিজের ঘরেই রইল মনে করুন, যেমনটি নিচ্ছি অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, দেখবেন।

—অ্যাজ ইট ইজ না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনি দয়া করে ওগুলো আবার ফেরত দেবেন।

ভদ্রলোক বই সুদ্ধু ব্যাজার মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হর্ষ সশব্দে দরজাটায় খিল তুলে দিয়ে আবার সতরঞ্চির ওপর গিয়ে বসলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা ফিচার শেষ করে বেরুতে হবে।

ফিচারের বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্যে হর্ষকে ঘাট-আঘাটায় ঘুরতে হয়। কখনো খিদিরপুর ডকে গিয়ে বসে থাকে, কখনো বা শ্মশানের আশে পাশে। গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে কারখানা, বস্তী কিছুই বাদ যায় না। বেশ লাগে। এও প্রায় ফাঁকি দিয়েই জানা, তবু অসমতল জীবনের প্রায় মুখোমুখি গিয়ে তো দাঁড়াতে হয়। দু চারটে স্ন্যাপ শট্ নিলেও তা সামনে থেকেই নিতে হয়। অগণিত তুচ্ছ মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে মনে হয় এই কাঁটাতারে জড়ানো ছন্দ-পতনে ভরা জীবনই বোধ হয় সত্যি, পিছনে ফেলে আসা ফাঁপা মানুষের রঙিন বুদ্বুদ সে ডাহা মিথ্যে।

আগে নিজের নামে যে একখানা উপন্যাস লিখেছিল, সম্প্রতি যা ছাপাও হয়েছে, তার জন্যে লজ্জা হয়। একটা রোমাণ্টিক ভাবালুতায় তখন চোখ নেশাচ্ছন্ন, বাইরের কিছু দেখবার প্রয়োজন হয় নি। পাত্রপাত্রীকে আবিষ্কার করে নিতে হয়নি, সেই অনাদিকালের হৃদয় উৎস থেকেই তারা বেরিয়ে এসেছে। প্রেমের সেই অটোমেটিক রথযাত্রায় সুভদ্রাকে যুবতী হলেই মানিয়ে গেছে, অর্জুন বড়ো জোর দু চারটে শিভ্যালরির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে। আর, সেই উপন্যাসে ড্রইংরুম থেকে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত সুন্দর অভিরুচিতে সাজানো।

জীবনকে তখনো স্পর্শের ভেতর দিয়ে জানা হয় নি, আঘাতে আঘাতে অনুভব করা হয়নি, কেবল গানের ভেতর দিয়ে দেখা হয়েছে মাত্র। আজ সেই বাক সর্বস্ব রচনা নিজেরই দৈন্য প্রকাশ করে। আজ ছদ্মনামে লেখা শুরু করলেও জীবনের ছদ্মবেশ এইবার খুলে গেছে।

মৃতকে নগ্ন করে এবং নগ্নকে নিষ্ঠুর করে জানা বাকি ছিল। বুঝতে পারা গেছে, সরু গলির আকাশে গগন ঠাকুর মহাকাব্যের খসড়া আঁকেন নি, দিয়েছেন দু চারটে জল রঙের ছবি।

একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, বিগত কান্না সুন্দরীর চোখের পাতার মত, পথের মাত্রাটানা গাছগুলোর ভিজে পাতা তার প্রমাণ দিচ্ছে এখনো। ভিজে শ্লেটের মত চৌরঙ্গী রোডের চওড়া কালো বুকখানায় বিকেল চারটের রোদ্দুরের শান পড়েছে। তির্যক রোদ্দুর চোখে এসে বেঁধে, বৃষ্টির পর রোদের তেজ যেন অসম্ভব বেড়ে যায়। তবু ভালো লাগে এই সময়টা, স্কুল

কলেজ ছুটির গন্ধ জড়ানো, মন ভরানো আসন্ন বিকাল। অনেক ছোটবেলায় যেমন গলিতে বাসনওয়ালার ঘণ্টা বুকে এসে বিঁধতো, আর তার একটু পরেই কলে জল আসতো, মা উনুন ধরাতে ঢুকতেন রান্না ঘরে।

বাস স্টপের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে হর্ষ ভাবছিল একবার শ্যামবাজারে গেলে কেমন হয়। বাড়ি ছেড়ে আসবার পর থেকে তপনের সঙ্গে আর দেখা হয় নি, অথচ রোজ মনে পড়ে ওর কথা। বাসের দেখা নেই, হর্ষ তাকিয়ে ছিল দূরের ট্রাফিক সিগন্যালটার দিকে, এমন সময় সামনে থেকে একটি মেয়েলি গলা শোনা গেল।

—হ্যালো, আপনি এখানে কার প্রতীক্ষায়?

গলাটা চেনা চেনা মনে হতেই চোখ ফেরালো হর্ষ, লতিকা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

দীর্ঘ ছিপছিপে গড়ন লতিকাকে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু। সবুজ শাড়ি-খানা একটা মনোরম তুলির টানের মত কাঁধ অবধি উঠে গেছে, নারকেলী কুলের মত লম্বাটে মুখখানা তার ওপরে অদ্ভুত মানিয়ে গেছে। একটু কবি দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় রজনীগন্ধার একটি সবুজ সতেজ ডাঁটার ওপরে একটি মাত্র কুঁড়ি।

কাছে এগিয়ে আসতে কিন্তু অতটা ভালো লাগে না, চোখ-নাক-চিবুক খুব নিখুঁত মনে হয় না, গালের লালিত্যটুকু অমসৃণ ব্রণের দাগে বিদায় নিতে বসেছে। চোখের গগ্‌লসটা ততক্ষণে খুলে হাতে নিয়েছে লতিকা, একখানা নীল মলাটের খাতার সঙ্গে কায়দা করে ধরে রয়েছে। অপর হাতে শাড়িটা এক ইঞ্চি উঁচু করে ধরেছে, মণিবন্ধে সোনালী রাখীর মত ঘড়ির চেনটা চিকচিক করছে।

হর্ষ হেসে ফেলে বললো, ঠিক ধরে ফেলেছেন কিন্তু, মিছে বলে লাভ নেই। তবে নায়িকাটি নিতান্তই অমানুষ।

—রীয়্যালি?—লতিকা চঞ্চল গলায় বললে, কে সেই সৌভাগ্যবতী যাকে এত বড়ো সার্টিফিকেটটা দিয়ে ফেললেন?

—তিনি অনেকদিন বাঁচবেন, ঐ যে তিনি আসচেন?

হর্ষ দূরের একখানা দোতলা বাসকে আঙুল দিয়ে দেখালো।

লতিকা ঠিক বুঝতে পারলো না, সেইদিকে তাকিয়ে বললো, অর্থাৎ?

—অর্থাৎ টু-বি বাস এতক্ষণে দেখা দিয়েছে, আমি একবার শ্যামবাজার যাবো ভাবছি।

—ওটা যে ডবল ডেকার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা যে টু-বি তার প্রমাণ কি? এখনো অন্ততঃ বাজী রাখবার মত দূরত্বে রয়েছে।—লতিকা হাল্কা গলায় হাসলো, আসলে এখনো টু-বি অর নট টু-বি দ্যাট্ ইজ দি কোশ্চেন।

লাইনটা আবৃত্তি করে থেমে গিয়ে লতিকা ঝট্ করে বললো, কোন কি জরুরী দরকার আছে শ্যামবাজারে ?

—কেন বলুন তো ?

—জরুরী কাজ না থাকলে, জীবনে একটা অন্ততঃ সত্যরক্ষা করতে পারতেন আজ। কথা দিতেই শুধু শিখেছেন, রাখতে তো আর শেখেন নি।

—কেন কি করেছি বলুন তো, এরকম নিদারুণ অভিযোগের কারণ কি ?

—কারণ অবশ্য অনেকগুলিই আছে কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলা শাস্ত্রের নিষেধ। তবু জিজ্ঞাসা করেছেন যখন একটি কারণ নিবেদন করবো, অনেকবার আমাদের বাড়িতে যাবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মনে পড়ে ?

—পড়ে। হর্ষ নিরীহ মুখে স্বীকার করলো, বেশ তো, আজকেই সত্য রক্ষা করতে হবে নাকি ?

—ক্ষতি কি ?

—কিন্তু সে তো টালিগঞ্জে।

—যে গঞ্জেই হোক সেখানে তো আপনাকে পদাতিক হয়ে যেতে হচ্ছে না, গাড়ি তো যায় ?

—এমন অকাট্য যুক্তির পরে আর কথা বাড়ানো বৃথা, থাকলো শ্যামবাজার। কিন্তু আপনি এসময়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, যাওয়া তো আর হলো না ?

—কোথায় আবার যাবো, ইউনিভার্সিটি থেকে সোজা বাড়িতেই ফিরছিলাম, চলুন।

ইউনিভার্সিটির কথায় হর্ষর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তারও আজকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হবার কথা, সেখানে কিনা বি.এ পরীক্ষাই দেওয়া হলো না। অথচ কত ইচ্ছে ছিল এম.এটা পড়ে বরং শেষ পর্যন্ত একটা প্রফেসারী জুটিয়ে নেবে—সসম্মানে দিনগুলো কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে অন্ততঃ।

অন্যমনস্কভাবে লতিকার পাশে পাশে হেঁটে চলছিল হর্ষ। পুরোনো কথা মনে পড়লে মনটা বড়ো উদাস হয়ে যায়।

—বাসে যাবেন তো ?—হর্ষ এ কসময় সমস্ত এলোমেলো চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কথা বলে।

—না ট্র্যামেই চলুন, ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে।

টালিগঞ্জের ব্রীজ পেরিয়েই বাঁ-হাতি রাস্তা। ট্র্যাম থেকে নেমে হেঁটে চললো দুজনে। গোটা পাঁচেক বাড়ির পরেই একটি লাল রঙের তেতলা বাড়ি, নিচতলার জানালাগুলিতে ফিকে হলুদ রঙের পর্দা।

লতিকা দরজার বোতাম টিপতেই সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। চোখ থেকে আবার কালো চশমাটা খুলতে খুলতে হর্ষকে ডাকলো, আসুন।

ভেতরে ঢোকবার সময় হর্ষ লক্ষ্য করলো দরজার ছিটকিনি থেকে একটি লম্বা প্যারাসুটের দড়ি সোজা ওপরে চলে গেছে। সুতরাং দরজা খুলতে কাউকে নেমে আসতে হয় নি।

দরজা ফের বন্ধ করে লতিকা হর্ষকে সঙ্গে করে দোতলার বসবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরখানা সম্ভবত লতিকার পড়বার ঘর, সুন্দর করে সাজানো। চার দেয়াল এক রকমের সবুজ সবুজ রেখা টানা ঘন বুনোন মাদুর জাতীয় জিনিস দিয়ে ঢাকা। ঘরের ভেতরের যাবতীয় আসবাব বেতের তৈরি। খান পাঁচেক চেয়ার, একটি টেবিল, দুটি টিপয়, বাজে কাগজের টুকরি, বুকশেলফ্, গোটা তিনেক বাহারী গাছের টব সমস্তই পরিষ্কার বেতের কাজ করা। দরজার একপাশে খুব ফিকে গেরুয়া রঙের একটি প্লাস্টিকের আবক্ষ মূর্তি, বেতের মূর্তি-দানের ওপরে দাঁড় করানো রয়েছে। ভালো করে তাকাতেই চিনতে পারলো, সেটি লতিকার প্রতিকৃতি।

—আপনি একটু বসুন, আমি জামা কাপড় ছেড়েই আসচি।

লতিকা চলে যেতেই হর্ষর মনে পড়লো ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটির কথা। তখন যেন বেশী ছটফটে ছিল, বেশী চঞ্চল, ভয়ানক তাড়াতাড়ি কথা বলতো, প্রায় দৌড়ানো গলায়। আজকাল একটু শান্ত হয়েছে যেন, ডিগ্রীর জন্যে এই গম্ভীর্যটুকু এসেছে কিনা কে জানে!

একটু পরেই একেবারে রক্তকরবী সেজে লতিকা হাজির। লাল রঙটা সত্যিই খুব স্মার্ট, সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্ন আসে না।

—তারপর, কতদূর প্রোগ্রেস করলেন?—মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ে লতিকা জিজ্ঞাসা করে।

লতিকার হাতের ডিমাই সাইজের নতুন খাতাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হর্ষ বলে, কি ব্যাপারে?

—আপনার সেই উপন্যাসখানার কথা বলছি, দিদির বাড়িতে যেটা শুরু করেছিলেন।

—ও, সেটা আধখানা বরাবর হয়ে পড়ে রয়েছে, আর লেখা হয়নি।

—কিন্তু তাড়াতাড়ি না লিখে ফেললে আমি পড়বো কবে?

হর্ষ হেসে ফেলে বললো, আপনাকে কথা দিয়েছি যখন, পড়াবোই। তা ছাড়া ও লেখাটা ছাপাবার ইচ্ছে নেই, আপনাকে পড়ালে তাও পাণ্ডুলিপিটা একেবারে ব্যর্থ যাবে না, কি বলেন?

—ঠাট্টা করছেন জেনেও বলছি, সূক্ষ্ম রসবোধ আমার নেই, তবে যথাসম্ভব বুঝতে চেষ্টা করবো।

—এটা সম্ভবত আপনার অভিমানের কথা হলো।

—না না, অভিমান কেন হবে, সত্যি কথা।

—তা তো মনে হয় না, হর্ষ হেসে আঙুল বাড়িয়ে দেখালো, এই ঘরখানার মধ্যেও আপনার কবিমন বারকতক উঁকি মেরেছে মনে হয়। আর আপনি বলছেন আপনার রসবোধ নেই ?

একটু লালচে হেসে লতিকা বললে, ও, ঘরের ডিসপ্লের কথা বলছেন ? একটুক্ষণ বিনয়ে চুপ করে থেকে বললো, আচ্ছা আপনি এখন কোথায় আছেন বলুন তো ? মিতাদিকে পর্যন্ত জানান নি ঠিকানাটা, আশ্চর্য। সেই যে অসুখ সারতে না সারতে উধাও হলেন—

—অসুখ কি আর সারলো—খুব অস্পষ্ট গলায় হর্ষ নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো।

—কি বললেন, শুনতে পেলুম না ?

—না বলছিলুম কি, আমার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে যে আপনাদের জানাবো ? তাছাড়া যেখানে থাকি—

—সেটা কি খুব খারাপ জায়গা ?

—না, খারাপ হতে যাবে কেন, তবে আপনাদের সেখানে যাওয়া চলতে পারে না।

—মানলুম। কিন্তু আমাদের চিঠিরও কি সেই একই ব্যবস্থা ?

হর্ষ কোন কথা না বলে শব্দ করে হাসলো শুধু। কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত: করে লতিকাও হেসে ফেললো।

লতিকাদের বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে যখন বেরুলো হর্ষ, তখন রাস্তার সমস্ত আলো জ্বালা হয়ে গেছে। বহুদিন পরে একটি বিকেল কাটলো সুন্দরভাবে, হাল্কা কথায়, গল্পে, কবিতা পড়ে। কবিতা অবশ্য লতিকার, এতদিন ধরে যা লিখেছিল, তারই ভেতর থেকে বেছে বেছে কিছু একটি খাতায় যত্ন করে তুলে রেখেছে। দু চারটে হয়ত ছাপাও হয়েছে, কলেজ ম্যাগাজিনে কিংবা মাঝারি ধরণের দুচারটে পত্রিকায়। খুব প্রশংসা করবার মত না হলেও প্রশংসা করেছে অকুণ্ঠভাবে, বলেছে, বা: সুন্দর লিখেছেন, আরো লিখুন। আরো দেখতে চাই।

লতিকা খুশী হয়েছে। হর্ষও একেবারে বানিয়ে বলেনি কথাগুলো, মনের কথাই একটু বেশী গাঢ় করে বলেছে আর কি। সত্যিই তো আজকাল মেয়েদের লেখা একদম কমে গেছে। ভাবপ্রবণতার মাত্রা ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে মেয়েদের মধ্যে থেকে। যা কিছু লেখা এখন পুরুষরাই লিখছে। দেখা যাচ্ছে কবির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে উত্তরোত্তর, লেখকের সংখ্যাও। রোমাণ্টিক গল্প কবিতারও আবার যেন নতুন বন্যা এসেছে, কিছুদিন আগে যেমন রিয়্যালিজম্‌-এর ফ্যাশান এসেছিল। কিন্তু মহিলা কবি

কিংবা লেখিকা কই? যে কজন আছেন তাঁদের আঙুলে গোণা যায়। তাঁরা সাহিত্যের পুরনো ভিঁটে আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। নতুন উত্তাপ, নতুন একস্‌পেরিমেণ্ট নিয়ে আর কেউ আসছেন না। স্কুল কলেজের ছাত্রীদের অন্তত বারো আনা ক্ষুন্নিবৃত্তি সিনেমা ম্যাগাজিনে মেটে, মানুষের জীবন সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ তাদের ঐ পর্যন্ত পৌঁছেচে। বাকি সংখ্যকদের মধ্যে কেউ কেউ কলেজ জীবনে দু চারটি লেখা লেখে, দু চারটে উল্লেখযোগ্য লেখাও দেখা যায় কখনো কখনো। কিন্তু তারপর মেয়েদের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় যেই আরম্ভ হয়, তখন থেকে না লেখা, না লেখিকা কারো যদি দেখা পাওয়া যায়। সুতরাং এটা তাদের কাছে একটা সাময়িক বিলাস হয়ত, একটা ক্ষণিক প্রসাধন। অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও ছেলেরা যেমন ছাত্রজীবনে টিউশনীর দিকে ঝোঁকে, একটা অস্পষ্ট রোমান্স অনুভব করবার জন্যে। লতিকার লেখাগুলো একটু পুরুষালী ঢঙের, কিন্তু তবু তার কাছে কিছু আশা করা যায় না, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেই এ খেলা ভুলে যাবে সে, পুতুলের বানানো সংসারে মন বসাবার আর কোন প্রয়োজন হবে না নিশ্চয়।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে হর্ষ একটা অচেনা রাস্তায় এসে পড়েছিল, রাস্তাটা বেশ নির্জন। দুপাশে বড়ো বড়ো বাড়ি, আলোর সাইনবোর্ড মাথায় নিয়ে গোটা তিনেক দোকানও রয়েছে সব সুদ্ধু। সাইন বোর্ডে রাস্তার নামটা পড়লো হর্ষ, চারু এভিনিউ।

কয়েক সেকেণ্ড নামটা মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে থাকলো, কিছু বুঝতে পারলো না। তারপর হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল। মন্দিরার শ্বশুরবাড়ি এই চারু এভিনিউয়েই! নম্বরটা মনে নেই, কিন্তু খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না, বাড়ির চেহারাটা অনেকদিন হলেও স্পষ্ট মনে আছে তার।

মনের মধ্যে একবার ইতস্তত: করলো হর্ষ, যাবে কি যাবে না। তারপর পা বাড়ালো। প্রায় তিন বছর মন্দিরার সঙ্গে দেখা হয় না তার। কথাটা ভাবতেই বুকেব ভেতরটা কেমন করে উঠলো, আশায় আনন্দে এবং অদ্ভুত ধরণের একটা আশঙ্কায়। জেল থেকে বাড়ি ফেরবার সময় যেমন ভয় করেছিল, কড়া নাড়তে গিয়ে হাত ভারি হয়ে গিয়েছিল, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, ডাকতে পারেনি কাউকে।

·

ক্রীকলেনে যখন পৌঁছালো হর্ষ রাত তখন সাড়ে বারোটা। মন্দিরাদের বাড়ি থেকে ইচ্ছে করেই হাঁটতে হাঁটতে এসেছে, বাসে ওঠে নি, কোথাও বসেও নি। শরীরটা এত ক্লান্ত হয়েছে যে একটা ওভার কোটের মতই সেটাকে এক টানে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে বিছানার ওপর। পা দুটো টনটন করছে, ঘষা লেগে লেগে পায়ের আঙুলগুলোর তলায় ফোস্কা পড়েছে মনে হচ্ছে, জুতো খুলতে পারলে

যেন বেঁচে যায়। তার ওপর আবার সেই পুরনো প্রেমের মত ব্যথাটা বুকের একপাশে খচখচ করতে শুরু করে দিয়েছে। শরীরটা বেশী ক্লান্ত হলেই ব্যথাটা মেজাজ দেখিয়ে নেয়।

হর্ষকে অনুসরণ করে হর্ষর অপ্রকৃতিস্থ পায়ের শব্দও সদরে এসে থামলো। একটা ভরাট দেশলাইয়ের বাক্সের মত বাড়িটা অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো, একটু শব্দ নেই, সূচ্যগ্র পরিমাণ আলোর রেখাও দোতলা তিন-তলার কোন জানালা থেকে উঁকি মারছে না। অথচ বারুদ ঠাসা কাঠির মত একগাদা লোক রয়েছে ঘরে ঘরে ঠাণ্ডা হয়ে।

কাউকে ডাকবার প্রয়োজন নেই, হর্ষ কৌশলে বন্ধ দরজাটা খুলে ফেললো। ভেতরে ঢুকে দরজাটা ফের বন্ধ করে মুখস্থ বিদ্যায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো, ডানদিকে বারোয়ারী চৌবাচ্চা, বারান্দা, টেবিলে বসানো টাইপরাইটার, কমলার ঘরের জানালা, মনে মনে অনুমান করে নিয়ে সিঁড়িতে পা বাড়ালো। কমলা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমোয় নি, নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে হয়ত নিজের ভবিষ্যতের একটা অবিশ্বাস্য গল্প ভাবছে। যেটা, যতই লোভনীয় হোক, কখনো ঘটবার সম্ভাবনা নেই, কমলা নিজেও জানে সে কথা। তবু রাতের অন্ধকার বিছানায় আত্মসমর্পন করে এই ধরণের বয়স্ক রূপকথা ভাবতে ভালো লাগে বৈকি। সারা দিনের চড়কিপাক কাজের ঘূর্ণীতে যে মুখ বুজে খেটে যায়, একটি কথাও বলে না, তার মনের কথা কি সহজে ফুরোয়।

আর সত্যি বলতে কি এই আত্মকাহিনীই ব্রোমাইডের কাজ করবে একটু পরে। একটি পাখির বাসা নাগালে আসতে না আসতেই হয়তো কমলা ঘুমিয়ে পড়বে অঘোরে। তারপর কিছুই জানবে না, শুধু ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে একটা বিকৃত চিৎকার করে জেগে উঠবে। তখন ঘড়িতে রাত একটাও হতে পারে, দুটোও হতে পারে, কোন ঠিক নেই। কিন্তু সেই চিৎকার বহুক্ষণ পর্যন্ত হর্ষর মস্তিষ্কের কোষে কোষে পাক খেয়ে বেড়াবে একটা সোনালী সাপের মত।

অন্ধকারেই পকেট থেকে চাবি বের করে নিজের ঘরের তালা খুললো হর্ষ। তারপর স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললো। নিজের হতশ্রী ঘরখানাকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বিছানার বাণ্ডিলটা বিছিয়ে নিল একটানে। জুতো জোড়া তখনো পা থেকে খোলা হয় নি খেয়াল হতেই বলে শট করার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে। একটু জোরে শব্দ হলো, তা হোক। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়লো। গায়ের জামাটা ধীরে ধীরে খুলে ফেলেই শুয়ে পড়তে এক সেকেণ্ডও বিলম্ব করলো না।

কিন্তু ক্লান্তি মানেই ঘুম নয়, বিছানায় বহুক্ষণ চুপকরে শুয়ে থেকেও ঘুমের সাক্ষাৎ পেল না হর্ষ। হয়ত বুকের সেই অল্প অল্প ব্যথাটার জন্যে, হয়ত

আজ বিকাল এবং সন্ধ্যার অনেকগুলো কথা তার মাথার মধ্যে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছে বলেই। সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলো বারবার, কিন্তু পারলো না।

শান্তিপিসী গড়িয়ার হাসপাতালে নার্সের কাজ করছেন, স্বামী রায়টে মারা গেছেন। মন্দিরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মন্দিরাই চিনতে পেরেছিল প্রথমে। অনেক অনেক করে হর্ষকে দেখা করতে বলেছে। কিন্তু হর্ষর ঠিকানা মন্দিরা জানতো না, তাই কোন কথা দিতে পারে নি। সত্যি বড়ো নাকি কষ্টে আছে, আর্থিক নয় মানসিক। যাওয়া উচিত তার একবার। সে গিয়ে কি করবে?

শান্তিপিসীকে নতুন পরিবেশে ভাবতে চেষ্টা করে হর্ষ, ছোট্ট একটি বাসা, কে কে যেন থাকে। তবু তো শান্তিপিসী একটা বাসা পেয়েছে, কাঁটা ডাল হলেও একটা ডালের আশ্রয়। কিন্তু আরো কত শান্তিপিসীরা যে ভেসে গেল, স্রোতের মুখে কুটো গাছটাও তাদের হাতে ঠেকলো না!

ভেবে কোন লাভ নেই, হর্ষ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। আলো জ্বাললো না, অন্ধকাবের ভেতরেই হাতড়ে হাতড়ে তাক থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আর দেশলাই খুঁজে নিল। বুকের ব্যথাটাকে বরদাস্ত হচ্ছে না, আর একটু উস্কে দেওয়া যাক।

সিগারেট ধরিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ঝুপসী আমের গাছটার বুকের গহনেও আলো পৌঁছে গেছে কখন, চাঁদের আলো। বাড়িটার একটা বাঁকা ছায়া পড়েছে উঠোনে। রাত এখন হয়ত দেড়টা দুটো হবে। গভীর রাত। রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে তাকালো। চাঁদটাকে দেখা যাচ্ছে। সামনের দোতলা বাড়িটার শিয়রে, নতুন একটা রূপোর টাকার মত। কোন ট্যাঁকশাল থেকে বেরিয়েছে যেন।

চিত্রলেখা কি তাকে ভালোবাসতো? কাল ট্র্যামের জানালায় চকিতের জন্যে যেন তার মুখ দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু মনে হয় ভুল দেখেছে। চিত্রলেখাকে যতটুকু জানে, বাস ছাড়া তার দ্বিতীয় বাহন নেই। ট্র্যামে সে কখনই চড়ে নি, চড়বেও না হয়তো। মানুষের মনের মধ্যে কত আশ্চর্য রকমের ফ্যাসিনেশন থাকে, যুক্তি দিয়ে যার কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

সে নিজেই বা এই বাড়িতে একা একা পড়ে রইল কেন শেষ পর্যন্ত? মার অবস্থা খুব ভালো নয়, মন্দিরার কাছে শুনে এসেছে। মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে আজ। কিন্তু কাল দিনের আলোতেই আবার মন পাল্টে যাবে, খুব ভালো করে জানে সে কথা!

—মশাই, ও মশাই হর্ষবাবু, কোথায় ছিলেন দাদা কাল সারাদিন?

হর্ষ বিরক্ত হয়ে চোখ খুলতেই বিষ্ণু মিত্তিরকে দেখতে পেল, তার বিছানার ওপরেই জাঁকিয়ে বসে পড়েছেন। নাঃ, লোকটার সাহস দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। রাতে দরজা বন্ধ করে শুতে ভুলেছে কি ঘরে ঢুকে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাতেও ইতস্ততঃ করেন নি!

—দাদা সিগারেট খান নাকি?—মুখে একটা মধুর ভঙ্গি ফোটাবার চেষ্টা করে বিষ্ণুবাবু সাগ্রহে হর্ষর বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলেন। তারপর বলা বাহুল্য মনে করে কিছু না বলেই প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে ঠোঁটে গুঁজলেন।

—দাদা!—প্রায়বন্ধ মুখ থেকে সম্বোধনটা গলিয়ে দিয়ে খস করে একটা কাঠি ধরিয়ে অগ্নি সংযোগ করলেন বিষ্ণুবাবু।

শূন্যে দক্ষিণ হস্তের একটি অদ্ভুত মুদ্রা দুলিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটিকে নিভিয়ে ফেলে সবে দেশলাইটা রাখতে যাবেন, এমন সময় হর্ষ প্রায় মুখিয়ে উঠলো।

—আজ্ঞা করুন?

কাঁচা ঘুম ভাঙায় এমনিতেই মেজাজটা খাপ্পা হয়েছিল, তার ওপরে সেই একই ছাপা শাড়ি পরা বিষ্ণুমিত্তিরের অসভ্যতা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো।

ভদ্রলোক মুখ কাঁচুমাচু করে করুণ গলায় বললেন, দাদা যে সকাল বেলায়ই একেবারে ফায়ার হয়ে গেলেন, ব্যাপার কি?

—ব্যাপার আপনি!

—আমি? ভদ্রলোক সিগারেট হাতে নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—তাছাড়া আবার কি, ঈষৎ ঠাণ্ডা হয়ে বললো হর্ষ, আমি কাল কোথায় ছিলাম সে কথা আমাকে ডেকে তুলে আপনার জানবার কি হয়েছিল? দ্বিতীয়ত সকালবেলায় আপনার শরীরে এই শাড়িটি জড়ানো দেখলে আমার মাথায় খুন চেপে যায়। আপনাকে ভালো কথা বলছি হয় শাড়িটির রঙ পাল্টান, নয় আপনার স্বভাব পাল্টান।

—তাই বলুন, ভদ্রলোক হাসির দমকে ভরা কলসীর মত কাত হয়ে গড়িয়ে পড়লেন, হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ—তাই বলুন, আমি ভাবি কি না জানি অপরাধ করলুম আবার। তা মশাই কড়া বলেছেন, শাড়ির রং, হেঃ-হেঃ-হেঃ আমারও অমন হতো প্রথম বয়সে, কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে পারতুম না! শাড়ি যে কি বস্তু আপনিও বুঝতে পারবেন দাদা আগে একটা বে করুন।

—বিষ্ণুবাবু!—হর্ষ গম্ভীর মুখে উঠে বসলো।

ভদ্রলোক এবার একটু নার্ভাস হয়ে সরে বসে বললেন, আহা উঠছেন কেন, শুয়ে শুয়েই বলুন না—

—আপনি কি কখনো অপেরায় কাজ করেছেন?

—আজ্ঞে কখনো না—নেভার !

—তা হলে আপনি দয়া করে আর ভাঁড়ুদত্ত সাজবেন না, হাসি বন্ধ করুন।

—করেছি স্যার ।

ভদ্রলোক একেবারে মিইয়ে গেলেন ।

হর্ষ এবার হেসে ফেললো, বাঃ এইত দেখছি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়েছে মুখ দিয়ে। যাক, হ্যাঁ আপনি কি যেন বলতে এসেছিলেন ?

—বলতে এসেছিলাম ? হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন !

—কথা না বাড়িয়ে বলুন দেখি ব্যাপারটা ।

—ব্যাপারটা ভেবেছিলাম আপনি জানেন, কিন্তু এখন দেখছি আপনি নিতান্তই ঘুমিয়ে ছিলেন। তা বলতে গেলে আপনার জোর ভাগ্যি মশাই যে কাল বাড়ি ছিলেন না—আমি পড়ে গেলাম মাঝ থেকে জাঁতা কলে। কালকে ওয়াইফের একটু ইয়ে হওয়ায় আর অফিস বেরুই নি, এখন তার ফল ভুগতে হচ্চে। পুলিশের সঙ্গে কোর্টশিপ চালানো মশাই—আঠারো ঘায়ের ধাক্কা !

—এখনো ভূমিকা চালাচ্ছেন, বলি, আজকেও কি আপনার অফিস নেই বিষ্ণু বাবু ?

—এই যে হয়ে এলো, হ্যাঁ, কালকে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ মশাই সে এক ইলাহী কাণ্ড এই বাড়িতে। নিচের তলার কমলা ? ছুঁড়ি গায়ে আগুন ঢেলে মরবার আর যেন সময় পেল না ! কম্বল জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে কখন আগুন দিয়ে বসে ছিল কে জানে, ধোঁয়া আব চিৎকার শুনে ছুটে নিচে নেমে গিয়ে দেখি আর এক ফ্যাচাং, দরজায় তালা দেওয়া !

—কার দরজায় তালা দেওয়া ? হর্ষ আঁতকে উঠলো, কমলার ?

—তবে আর বলছি কি !

—সে কি করে সম্ভব, তালা দিল কে ?

—বিলাস বাবু ছাড়া আর কে দেবে !

—সে কি! কমলার বাবা তালা দিয়েছিলেন ? তিনি তখন কোথায় ?

—কমলার বাবা কাকে বলছেন, উনি তো কমলার বাবার বন্ধু, সেই সঙ্গে কারবারের পার্টনার । কমলার বাবা মারা যাবার সময় বোবা মেয়েকে বন্ধুর আশ্রয়ে রেখে যান। তা বন্ধু বন্ধুর কাজই করেছেন বটে ! তালা খুলে যখন ঢুকলাম তখন সব শেষ হয়ে এসেছে। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখা যায় না মশাই। পোড়া বেগুনের মত রঙ হয়েছে দেহের, একটুকরো আবরণ নেই কোথাও ।

অনড় শরীরটা মেঝের ওপর পড়ে আছে, শুধু পা দুটো একটু একটু কাঁপছে তখনো।

—কমলা বোবা ছিল? হর্ষ নিজেও বোবা হয়ে গেল কথাটা বলে।

—হ্যাঁ—ভদ্রলোক সক্রোধে বললেন, কমলার মুখটাই বোবা ছিল, শরীরটা বোবা ছিল না, তাই এত কাণ্ড।

হর্ষ কথা বললো না। সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে ধরালো।

বিষ্ণুবাবু ফিসফিস করে বললেন, বিলাস বাবু আমাকে কাল সন্ধ্যে বেলায়ই ধরেছিলেন। পুলিশের কাছে তালার কথাটা আমি যেন না বলি।

হর্ষ কথা বললো না। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, গির্জার চূড়াটার দিকে চোখ রেখে।

—আমাকে টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছেন। বলুন, কি করি?

হর্ষ হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, বেড়িয়ে যান।

আমি যদি ঘরের মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেয়ে যেতুম তাহলে বিস্মিত হতাম হয়ত, কিন্তু এর সিকির সিকিও খুশী হতাম না। কালরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে, আজকাল মাঝে মাঝেই এমন হয়, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। কারণ বাকি রাতটা শত চেষ্টা করলেও আর আমার ঘুম হবে না, তার চেয়ে পুরনো, বহুপুরনো কোন বই নিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিলে অনেক আরাম পাবো। তারপর যখন বাইরের অন্ধকারটা জ্যালজেলে পাতলা হয়ে আসবে, ভোরেব উদাস আবছা আকাশটার বুক মাড়িয়ে দিয়ে বাদুড়গুলো কোণাকুণি পাড়ি জমাবে, তখন ভোরের সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমি আবার ঘুমিয়ে পড়বো। তার আগে নয়।

কালরাতেও বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বাললাম, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলাম, তারপর আলমারী খুললাম। এবং তারপরেই বহুকালের উপেক্ষিত একখানা বইয়ের পিছন থেকে পেয়ে গেলাম এই পাণ্ডুলিপিটি, যেটা একটু আগেই পড়ে শেষ করেছি। আমি যদি গুপ্তধন পেয়ে যেতাম তাতে কি এত খুশী হতাম, এত আশ্চর্য? এক্সারসাইজ খাতার লাইনটানা পাতাগুলোর ঠাশ বুনোনি ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ভরা এই ধূসর পাণ্ডুলিপিটা আমারই জীবনের ছায়াচ্ছন্ন ইতিহাস ধরে রেখেছে। ভাবতে আশ্চর্য লেগেছে আমি নিজেই লিখেছিলাম আমার এই অন্য জন্মের ইতিহাস, অনেক অনেককাল আগের কোন এক স্বপ্নে পাওয়া দিনগুলি রাতগুলি ভরে।

এই উচ্ছ্বাসময় কাঁচা হাতের লেখাও আজ আমার এত ভালো লাগলো তার কারণ এর এককণাও অতিরঞ্জিত নয়, এব প্রতিটি অক্ষর অতীত লেখকের বুকের দরদ দিয়ে আঁকা। কত মুখ, কত মুহূর্ত এর আঁচড়ে আঁচড়ে ধরা রয়েছে, তারা সকলেই সুখের নয়, সুন্দর নয়, কিন্তু তারা আমার জীবনে কত সত্যি ছিল একদিন। আর দেখবো না কোনদিন তাদের, কিশোর বয়সের সেই আবোল তাবোল আকাশ, সেও ফিরবে না এজীবনে আর একবার।

চোখে জল এসে গিয়েছিল পড়তে পড়তে, হাত দিয়ে মুছলাম না। আসুক, জল আসুক আমার দু চোখ বেয়ে, কতদিন কাঁদি না, কতদিন এই চোখে এঁকে বেঁকে নোনা-মিঠে জলের ধারা নামে নি। ঘুমুতে না পারার মত, কাঁদতে না পারারও যে অসহায় যন্ত্রণাকর অনুভূতি আছে, আমার মত অনেকেই হয়ত তা জানেনা।

কতদিন পরে আবার যেন ছেলেবেলাকে, আমার মায়ের গলার ছোঁয়া ভরা দিনগুলোকে আবার ছুঁতে পারলুম এই কান্নার ভেতর দিয়ে। ফুঁপিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটা, কণ্ঠনালীর মধ্যে পাক খেয়ে উঠলো একটা অদম্য বাষ্প, কোন গভীর দুঃখে নয়, শোকের পীড়নে নয়, একটা কোন প্রবল সুখের ধাক্কা লেগেও নয়। মন কেমন করা, অস্পষ্ট, অতি অস্পষ্ট, একটা স্মৃতিময় মনে পড়ার আনন্দে আমি কেঁদে ফেললুম। ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এই সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ, আধময়লা পাণ্ডুলিপিটি উপলক্ষ মাত্র; পুরনো রোদ্দুরের মত, চেনা আকাশের মত, শ্রাবণের বৃষ্টির তানপুরোর মত। এদের ছাপিয়ে কোন স্বপ্ন, কোন গল্প মনে পড়ে যায়। আমারও মনে পড়লো সেই দেশের কথা, যে দেশ সত্যিই কোনদিন ছিল বলে বিশ্বাস করা শক্ত। মানচিত্র থেকে বাদ পড়েছে মন থেকেও কাটা পড়ে গেছে অনেক দিন তার নাম।

আমি একদিন লিখতুম, লেখবার প্রতিভা নাকি একদিন আমাব ছিল; কবিতা, গল্প, উপন্যাস যা ছুঁয়েছি তাই সোনা হয়ে উঠেছে, এ কথাটাও ভারি আশ্চর্য লাগে আমার কাছে। আমি আজ লিখি না, লিখতে ভুলে গেছি তা নয়, কোন দিন লিখতুম, কোন দিন লিখেছি এই কথাটাই ভুলে গেছি। এত তাড়াতাড়ি আমি সাহিত্য জগৎ থেকে বিদায় নেব, মুছে যাবো, আমার অতিবড় শত্রুও কোনদিন ভাবতে পারেন নি। আমিই কি পেরেছিলাম ?

ভাবলে হাসি পায় আজ আমার জন্যে যাঁরা দুঃখ করেন তাঁরাই একদিন আমার গায়ে থুথু ছিটিয়েছেন, পাগলের মত দাঁতে নখে আক্রমণ করেছেন। অনেকে আমাকে না জেনে, না চিনে, না দেখেই, শুধু আমার লেখা পড়েই আমাকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাউরেছেন, ঈর্ষায় জ্বলেছেন। একজন সাহিত্যিকের নাম বলতে চাই নে, যিনি বাংলার বাইরের কোন সাহিত্য সভায় আমাকে দেখে এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে সেদিন বক্তৃতা দিতে পারেন নি ভালো করে। সভার শেষে যখন প্রধান অতিথির সঙ্গে সভাপতির সর্বসমক্ষে আলাপ হলো তখন সভাপতি এই কথাই প্রথমে বলেছিলেন যে আমাকে তিনি অন্ততঃ পনের বছরের ছোট দেখছেন। অর্থাৎ আমি যে বয়সে এখনো এতটা ছেলেমানুষ একথা এতদিন তিনি অনুমান পর্যন্ত করতে পারেন নি।

নিন্দাই বোধ করি আমাকে প্রখ্যাত করে তুলেছিল অতটা, কারণ নিন্দা জিনিসটা অত্যন্ত সংক্রামক, একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে ছড়ায়। নৈতিক অভিযোগ, কিছু হচ্ছে না, এসব টিকবে না, পাগলামো করছি, ইত্যাদি নানা কথাই কানে আসতো। কোন কোন বই বেরোলে কেউ গায়ে পড়ে এত খারাপ সমালোচনা বের করেছেন যে আমার চেয়ে আমার প্রকাশকের মন খারাপ হয়ে গেছে চতুর্গুণ।

তিনি ব্যবসায়ী, তাঁর হতেই পারে, পাঁচজনের ভালমন্দ লাগার ওজন করেই তাঁকে চলতে হয়, কিন্তু আমি করো মুখ চেয়ে তো লিখিনি কখনো। একজন পাঠকের মুখ চেয়েই আমার সমস্ত রচনা জন্ম নিয়েছে, তাকে খুশী করবার জন্যেই আমি রাতের পর রাত জেগে কি না পরিশ্রম করেছি! কারণ সে আমার লেখা বোঝে, তাই আমাকেও বোঝে এবং পৃথিবীতে সে একজনই আছে। সেই একজন পাঠক যে কখনো আমার লেখাকে খারাপ বলে নি, বাইরে থেকে যখন আঘাত এসেছে সে মুচকি হেসে বলেছে, হচ্ছে, তুমি লিখে যাও, আরো জোরে লিখে যাও।

তার কথা আমি বিশ্বাস করেছি, অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছি, কারণ সে আমি নিজে। পৃথিবীতে এই একজন পাঠককেই আমি গ্রাহ্য করি, যে নিন্দা করে না, প্রশংসাও না, শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত পেতে নেয়। কিন্তু তাকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো কঠিন।

আমার লেখার কথা, লেখক জীবনের কথা থাক। কি লাভ সে সব বাজে কথায়। শুধু আজ মাকে মনে পড়ছে বড় বেশী। মার কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে বারবার।

মাকে শেষ বার মেণ্টাল হসপিটালে দেখে এসেছি গত পূজোর ছুটিতে। একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মা শুয়ে ছিলেন। খুব বেশী ক্লান্ত মনে হচ্ছিল এবার। কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন। আমিও মার চোখের দিকে তাকালাম। বুকের ভেতরটা আনন্দে শিউরে উঠলো, সেই চেনা চোখ, মনে হলো, আমাকে চিনতে পেরেছেন। অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখলেন তারপর করুণভাবে মাথাটা বার দুই নেড়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

—মাগো! আমি কান্না-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে ডাকলাম।

—কে তুমি? এতক্ষণ পরে মা কথা বললেন, ভারি ভারি গলায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে।

—আমায় চিনতে পারলে না মা? আমি হর্ষ।—আমার আশা হলো।

কিন্তু মা আর কোন কথা না বলে চোখ বুজলেন। তারপর ছোট ছেলের মত দুটো হাতের পাতা দিয়ে চোখ ঢাকলেন; যেন চোখে আলো লাগছে।

আমি মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। কতক্ষণ পরে চোখের ওপর হাত রেখেই চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, আসে নি, সে আর ফিরে আসে নি।

রোদ্দুর এসে মার হাতের চুড়িগুলোয় ঝিকমিক করে উঠলো। বাবার কথা মনে পড়ে গেল আমার, বুকের মধ্যে শিউরে উঠলো একটা রক্তাক্ত দৃশ্য। ট্রেণ দুর্ঘটনা, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা ছবি, একটা

অধৈর্য দিন আর রাত, ছুটে চলে এলাম অলকদার বাড়ি থেকে, খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিলুম না, আজো পারি না। দুমড়ে মুচড়ে তাল গোল পাকিয়ে গেছে বাবার শরীরটা, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে দাঁতগুলো, চোয়ালের হাড়। চেনা যায় না মুখ দেখে, কিন্তু অন্য প্রমাণ দেখে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। সেই নিষ্ঠুর, নির্মম ছবিটা চোখ বুজে ভাবতে আমার শরীর অস্থির করে ওঠে, ভয় করে।

—পা ছাড়ো, পা ছাড়ো আমার। ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ গলায় মা চেঁচিয়ে উঠতেই আমার চেতনা ফিরে এলো। দেখি মা পা সরিয়ে নিয়েছেন।

—মা আমি হর্ষ। আমি হর্ষ মা। আমি এসেছি তোমার কাছে।

ইজিচেয়ারের পিঠে নেতিয়ে পড়লো আবার মাথাটা, ধূসর গলায় আস্তে আস্তে বললেন, কি চাও তুমি ?

—পুওর বয়। বৃদ্ধ ডাক্তার সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বুঝলাম সময় হয়েছে সেটা তিনি বলতে পারছেন না। উঠে দাঁড়ালাম। মা আবার চোখ বুজলেন। ডান হাতটা আড়াআড়ি রাখলেন চোখের ওপর। মা আমাকে চিনতে পারলেন না।

ভেবেছিলুম আর লিখব না, ঢের লিখেছি, অর্থ না পেলেও নাম পেয়েছি যশ পেয়েছি একদিন, একদিন, যখন তা আমার কাছে আজকের মত অর্থহীন লাগতো না। কিন্তু জীবন এবং শিল্পীর জীবন দুটো আলাদা জগৎ, দুটো আলাদা ব্যাপার। দূরবীক্ষণের ভুল, না ভুল বলবো না, উল্টো-সোজা দুটো দিকের নিরীক্ষণ এক হতে পারে না। আমারও তাই হয়েছে, দুটো আলাদা পথ আর সমস্যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, একটাকে, হ্যাঁ শুধুমাত্র একটাকেই বেছে নিতে হবে।

তপনের কথাই আজ আমি স্বীকার করি, জীবন অনেক বড়ো, তার চাওয়া, তার না পাওয়া সব মিলে, উঁচু, নিচু, স্থূল, সূক্ষ্ম, সব দাবীকে মেনে নিয়ে সে বড়ো, শিল্পীর জীবন আর শিল্পকাল তার একটা অংশমাত্র, তার বহুমনস্ক মুহূর্ত-গুলির একটি কণিকা, একটি তান, একটি রেখা এবং একটি অসুস্থ অস্থায়ী মেজাজ মাত্র, তার বেশী নয়। শমের বিন্দু সেখানে নেই, যন্ত্রণা আছে, মুক্তি নেই, হয়ত সৌভাগ্য আছে কিন্তু স্বস্তি নেই সেখানে।

কিন্তু আমি দোষে গুণে মানুষ, হাসি কান্নার বাইরের পাথর নই। আমি দুঃখকে চেয়ে দুঃখকে পাই নি, দুঃখ আমার সুখকে না পাওয়ার অক্ষমতা। আমার চারপাশে, যারা আমার আত্মীয়, আমার পরমাত্মীয়, আমার মা-বাবা, আমার বোন, আমার গোপনে ভাবা কেউ, আমার রক্তে যার পায়ের শব্দ এখনো থেমে যায় নি, যার আসবার কথা এখনো ছটা ঋতুর সকাল সন্ধ্যেয় ছড়িয়ে আছে, সে এবং তারা

আমার কাছ থেকে আমার অক্ষমতা আশা করে না, আমার কর্তব্য এবং আমার প্রেমে তাদের দাবী সর্বাগ্রগণ্য। সুতরাং লেখা আমার নিজের আনন্দ, নিজের বিলাস; এই আত্মরতিতে নিমজ্জিত হয়ে যদি আমি সকলকে অসুখী করে তুলতে পারি, বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবেই আমার মেজাজ, আমার শিল্পকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু তা আমি পারবো না। যাদের জন্যে পেয়েছি, যাদের সঙ্গে একসঙ্গে হেসে কেঁদে পেয়েছি, এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই রোদ্দুর, তাদেরকে, সেই বাবা মাকে আমি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ভাবতে পারবো না, পারা উচিত নয় অন্ততঃ ; সেই আমার একজন কেউ যাকে আমি আগামী জন্মের পূর্বরাগ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না। যেহেতু কৃত্রিমতা আমি পছন্দ করিনে, সেহেতু লেখা আমাকে ছাড়তেই হবে, পথে আমাকে বেরোতেই হবে, নিজেকে যোগ্যতর করে তুলতেই হবে যোগ্যতম হবার জন্য।

বাবার দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে তাই আমাকে জীবিকার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। টাকা আনা পাইয়ের সন্ধানে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়েছে।

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে আবার লিখতে হবে, অন্ততঃ এই লেখাটি, যে লেখাটি অসম্পূর্ণ হয়ে আলমারীর একটা বইয়ের পিছনে পড়েছিল এবং সেদিন চিত্রলেখার কাছ থেকে না পেলে আর হয়ত কোনদিনই খুঁজে পেতুম না। অন্ততঃ আমার প্রথম বয়সের এই লেখাটি আমাকে শেষ করতে হবে কারণ এটা কোন একটি বিশেষ মুডের কথা নয়, আমার সারাজীবনের একটি সংক্ষিপ্তসার। এটা কোন একটি মুহূর্তের খেয়াল নয়।

কিন্তু আমার জীবনের গল্পটা, যদিও আমার জীবনের মাত্র মধ্য তিরিশে আমি সবে পোঁছতে যাচ্ছি, ঢের বাকি আছে এখনো, ঢের বাকি না-জানা দিন তাই ঢাকা রয়েছে সামনের অন্ধকারে, কি ভাবে বলবো এবং কোন জায়গা থেকে শুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না। আচ্ছা, একমাস আগের এক সকাল থেকেই আরম্ভ করি।

প্রথমে একটা তাসের উপমাই মাথায় এসেছিল আমার। কারণ খুঁজলে হয়ত পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই বেদনাময় রূপকটা আমার জীবনকে অনেকবার অনেক দৃশ্যে চমকে দিয়ে গেছে। আজও দিল।

আয়তাকার দরজার ফ্রেমের মধ্যে, পাতলা সেলফেন-পেপারের মত স্বচ্ছ রোদ্দুরের পটে হলুদ-লালের হ্রস্বদীর্ঘল দুটো রেখা কোন নাচের মুদ্রায় যেন আচমকা থেমে গেছে। শাড়ি-ব্লাউজের সেই রঙিন কোলাহলকে একটি মনোরম বিস্তার দিয়েছে আরো কতকগুলো শিথিল প্রায় রেখা। ভিজে কালো চুলের ঢল, পান রাঙা ঠোঁট,—নিটোল দুটি বাহু এবং তা থেকে ঠিকরে আসা কগাছা ধারালো রোদ্দুর। কয়েকটা রঙের ব্যঞ্জনা, আর রেখার আলস্য। সব মিলে যেন ইশকাপনের বিবি। অচেনা মেয়ের একটা চেনা ভঙ্গি।

মাইনাস-সেভেন পাওয়ারের পরকলা দুটোয় এর চেয়ে বেশী করে অন্ততঃ কিছুই ধরা পড়ে নি প্রথমটায়। তারপরে আর কয়েক পা এগোতেই বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি এখানে ?

ততক্ষণে তাসের উপমা মুছে গেছে।

চিত্রলেখাও বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলো, আরে, আপনি এখানে ? আচ্ছা তার আগে—তাড়াতাড়ি আর একটুকরো কথা জুড়ে দিল সে।

—কি ?

—ভেতরে আসুন, রাস্তায় অমন বিস্ময় সূচক চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাতে বেলাও বাড়বে, আমার প্রশ্নও কমবে না। ভেতরে আসুন।

—আবার ভেতরে যাবো...

আমার গলার স্বরে ইতস্ততঃ ভাব ফুটলো।

—নিশ্চয়। অনেক কথা আছে।

—কথারা নিশ্চয়ই আছে—আমি হাল্কা হবার চেষ্টা করে বললাম, এবং চিরকাল থাকবে। ওদের অপেক্ষা করে থাকাই রীতি। কি বলেন ?

পাঠ্যপুস্তকের মত গম্ভীর মুখ করে চিত্রলেখা সাধুভাষায় জবাব দিল, বলাই বাহুল্য। হুঁ, এই পথে...ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন—পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে রহস্য করে বললো, একটু পেছল।

—বলাই বাহুল্য। আমি তারই কথার প্রতিধ্বনি করে হেসে ফেললাম, তারপর উঠোনের পেছল জায়গাটা একটু সাবধানে পার হলাম।

যে ঘরটায় এনে আমাকে বসালো, এক নজরে দেখেই বুঝতে পারলাম সেটা তার বসবার, শোবার এবং পড়বার ঘর।

দুটি জানালা এবং দুটি দরজাকে এড়িয়ে চার দেয়ালের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে তাতে তিনটি জিনিস নজরে পড়লো। উর্বশীর ছবি আঁকা একখানা পরিচ্ছন্ন ক্যালেণ্ডার, একখানা ঝকঝকে আয়না, আর রবীন্দ্রনাথের বাদামী রঙের একখানা প্লাস্টার মূর্তি।

যেটার ওপরে আমি বসেছিলাম, সেই সিঙ্গলবেড চাইনিজ খাটখানাকে বাদ দিলে মেঝেয় দুটি আসবাব মাত্র অবশিষ্ট থাকে একটি বেতের চেয়ার, একটি ফিকে সবুজ বুক শেল্ফ্। তৃতীয় আসবাবটি স্থাবর পর্যায়ে পড়ে না, সেটি চিত্রলেখা নিজে; চিত্রার্পিতের মত একা বসে যখন পড়াশোনা করে কিংবা শুয়ে থাকে।

—এটা আমার বাপের বাড়ি, জানেন না বোধহয়, আর এই ঘরটাও আমার রোজকার ঘর নয়।

—তাহলে সেটা আবার কোথায়? আমি হাসিমুখে বলি।

—যেখানে রোজগার করি।—কলকাতার একটা উইমেন্স কলেজ হোস্টেলের নাম করে চিত্রলেখা জানালো, তবে ছুটি ছাটার দিনগুলো এখানেই কাটাই।

—আপনি প্রফেসারি করছেন? আমি সবিস্ময়ে বলি, আপনাকে এখনো দেখলে কই ছাত্রী বলেই তো মনে হয়। ফস করে কথাটা বলে ফেলে নিজেই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লুম। তাড়াতাড়ি কথার পিঠে কথা পাড়লুম, কি পড়ান আপনি? ইংরেজি! ওঃ কতোকাল দেখা সাক্ষাৎ নেই, খবরাখবর জানি না।

—সেইজন্যেই তো আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক অনেক অভিযোগ আছে, ধীরে ধীরে সব জানাচ্ছি। তা আপনি অচমকা আজ এদিকে কোথায় এসেছিলেন? নাকি মাঝে মাঝে মধ্যমগ্রামে আসেন?

—আরে না। কলকাতায় এসেছি এই সামান্য ক-দিন আগে। আজ আমার এক বাল্যবন্ধুর ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে আপনার রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছিলুম। আপনার লক্ষ্য অব্যর্থ!

—তাহলে এবেলা আর রেহাই পাচ্ছেন না। জেনে রাখুন মোগল এবং মহিলা উভয়েই খানা খাওয়াতে সমান তৎপর।

—তবে সুখের বিষয় পদ্ধতিটা উভয়ের নিশ্চয়ই বিভিন্ন?

—পরীক্ষা প্রার্থনীয়। চান করেই বেরিয়েছেন মনে হচ্ছে?

—নিশ্চয়, ব্রাহ্মণের ছেলে যখন। ভোজনং যত্রতত্র এ শ্লোকটা এযুগেও মাঝে মাঝে ফলবান হয়ে ওঠে।

—ঢের হয়েছে। চিত্রলেখা সুশ্রী দাঁতে হাসলো এক ঝলক, এক মিনিট বসুন দয়া করে। আসছি।

দরজার বাদামী পর্দা সরিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

আমি ভাবলাম একেই বলে নিয়তি। এলাম গজেনকে দেখবো বলে, দেখা হয়ে গেল এমন একজনের সঙ্গে যার কথা শেষ পর্যন্ত প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। না দেখলে হয়ত সহজে আর মনে পড়তো না। কিন্তু চিনতে পেরেছি ঠিক, চিনতে পেরেছি সঙ্গে সঙ্গেই। চেহারা প্রায় কিছুই পাল্টায় নি, পরিণত হয়েছে শুধু। শরীরটা রেখায় রেখায় আর একটু সুন্দর হয়েছে, আর একটু গভীর। গলার স্বর এক থাকলেও, কথাব সুর যেন একটুখানি পাল্টেছে মনে হয়। ছ-সাত বছর পরের কথা। আমিই কি কম বদলেছি নাকি! নিজের চোখে তো ধরা পড়ে না, তাই। যাক, চিনতে পেরেছে এবং চিনতে পেরে যে খাতির যত্ন করছে এই যথেষ্ট।

ধীরে ধীরে পুরনো দিনের কথায় মন ভরে উঠলো। বনেদী দেওয়ালের দামী অয়েলপেণ্টিংগুলোর মত সেদিনের অনেক অনেক স্মৃতি আজো মনের মধ্যে মূল্যবান ছবি হয়ে আছে। বহু সুখদুঃখের সন্ধ্যা সকালের আলো আর অন্ধকার এখন তার চারপাশে নিবিড় আবহসঙ্গীতের মত জমে উঠেছে। সেই স্কটিশের রাঙামাটির উঠোনের জুলাইমাস, দেবদারুপল্লবের ঘনসবুজ চিবুক বেয়ে থিরথিরিয়ে নেমেছে গলিত অভ্রের ধারা, ওপাশে সবুজ টেনিস লন একটা পানাপুকুরের মত টলটল করছে। তার সোঁদা গন্ধ ইংরেজি ক্লাসের জানালা টপ্‌কে ঘরে ঢুকছে দমকা বাতাসের বুক ছুঁয়ে। আমি বসে আছি, তপন বসে আছে। আরো অগণিত মুখের স্কেচ। তারা আজ কে যে কোথায় রয়েছে জানবার উপায় নেই।

শুধু তপনের কথা জানি। কলেজ স্কোয়ারে সে বইয়ের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে। লেখক থেকে প্রকাশক। প্রমোশনটা হযত সামান্য নয়, ঠিক বুঝতে পারি না এই যা দুঃখ। তবে বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে পড়বার পর থেকে গজেনের মত সেও প্রায় নিয়মিতই পত্র যোগাযোগ রেখে চলেছে। তপনের চিঠিগুলো যেদিন যেদিন হাতে পেয়েছি, মনে হয়েছে আমাদের বয়স বাড়ে নি, সেই কলেজ জীবনের কেন্দ্রচ্যুত হয়ে আমরা কোথাও ভেসে যাই নি। আমরা সবাই আছি, এবং ঠিক আছি। কাঁচা ছাঁদের সেই অকালপক্ক অক্ষরগুলোকে দেখে এক একবার চমকে গিয়েছি। অতীত তো বেশী দূরে সরে যায় নি, মনে হয়েছে এক্ষুণি এগুলিকে কপি করতে হবে। দীর্ঘ চার বছর ধরে যা করেছি। তপনের প্রতিটি গল্প, উপন্যাসের টুকরো এবং দরকারী অদরকারী চিঠি সব আমি একদিন কপি করে দিয়েছি। এমনকি তার পাঠ্য বইয়ের পাতায় তার নিজের নামটিও আমার হস্তাক্ষরে লেখা, মার্জিনে মার্জিনে যে নোট তাও।

এমনি করে জড়িয়ে গিয়েছিলাম আমরা একদিন, প্রতি কথায়, প্রতিটি অক্ষরে।

তারপর আমার নিয়তি আমাকে তাড়া করে নিয়ে গেল অনেক দূরে, সে যে বাংলাদেশ ছাড়া করলো তা নয়, আমাকে বন্ধু ছাড়া করে ছাড়লো।

গজেনও অবশ্য চিঠি লেখে মাঝে মাঝে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়ের মত তার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে উপদেশ উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা সব কিছুই মিলতো, শুধু মিলতো না তার কোন উন্নতির খবর। না মানসিক, না আর্থিক। শহরের বাড়ির যেসব দেয়াল বিজ্ঞাপনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে যেমন দৃষ্টিগোচর-যোগ্য সব কিছুই থাকে একমাত্র জানালা ছাড়া, গজনের চিঠিগুলো তেমনি। তার মানে এই নয় যে তাতে আন্তরিকতার অভাব থাকতো। বরং তার কিছু বিপরীত। তবে গজেনের চিরকেলে স্বভাব অনুযায়ী, ঘষা পিঠটাকে আড়ালে রাখার তৎপরতা প্রকাশ পেত। অনেক বাছাই করে যে খবরটুকু উদ্ধার করতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে মধ্যমগ্রামে গজেন সম্প্রতি ছোট একখানা বাড়ি করেছে এবং বছরখানেক হলো বিয়ে করেছে।

দীর্ঘ কয়েক বছর পরে বাংলা দেশে ফিরে আসবার পর একে একে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা হলো। মাত্র দেড় মাসের ছুটি, কিন্তু দেড় মাসকে এখন আর মাত্র মনে হয় না। শূন্যতায় যে কোন মরুভূমির চেয়ে বড় মনে হয়। অলকদার ওখানেই উঠেছি, ওই বিরাট বাড়িতে আমরা অন্তরঙ্গ তিনটি প্রাণী। আমি, অলকদা, আর তাঁর বিরাট অ্যালসেসিয়ানটা। রোজ ভোর বেলা তার ডাকে অলকদার এখন ঘুম ভাঙে, টুসীটার খানার ছুটন্ত জানালায় যার দীর্ঘ সজাগ মুখখানা পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক পারমিতা বৌদি না থেকেই পর্ণ কুটি; নিশুতি রাত্রির মত একা হয়ে গেছে। তাই আমাকে দেখে অলকদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও তাঁর অন্তরের অপরিসীম ক্লান্তি গোপন করতে পারেন নি। কবে যে আবার পারমিতা বৌদি দেশে ফিরবেন, কবে যে তাঁদের চিত্রীসংঘের কণ্টিনেণ্টাল টুর শেষ হবে সঠিক করে অলকদা নিজেও জানেন না।

সুতরাং বাড়িতে এই অবস্থা, আবার বাইরেও সেই চিরায়ু আডডার দিন শেষ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর রোজই প্রায় তপনের দোকানে গিয়ে বসি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব হয়। দুচারজন পূর্ব পরিচিত লেখক আসেন, সৌজন্য বিনিময় হয়।

মন্দিরার ওখানেও গেছি বার দুই। সে এখন বহুবচনে ছড়িয়ে গেছে। একটা বিরাট সংসারের সুখী চালচিত্র এখন তার চারপাশে বৃত্ত রচনা করেছে। সে

তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এক একবার মনে হয়েছে এও বুঝিবা আত্মহত্যা। আমি যেমন অন্ধ বেগে বাইরে ছুটে গেছি, ধূ ধূ শূন্যের মধ্যে, অবলম্বনহীন উদ্দাম বাতাসের দমবন্ধ আশ্লেষের মধ্যে। এও বুঝি সেই একই আত্মহত্যার অন্যদিক।

চিত্রলেখা চায়ের ট্রে হাতে করে ফিরে এলো। আলগোছে মাটিতে নামিয়ে চায়ে দুধ, চিনি মেশাতে লাগলো। তার পানপাতার মত মুখখানাকে গুচ্ছগুচ্ছ কালো চুল পল্লবের মত নিবিড় করে ঘিরে ধরেছে, তার ফাঁকে শঙ্খবর্ণ মুখখানাকে ম্যাগনোলিয়ার কলির মত মনে হচ্ছে। নিটোল।

পেয়ালায় চামচ বাজছে, চুড়ি বাজছে, সব মিলে মনে হচ্ছে জলতরঙ্গের একটা ক্ষীণ ধ্বনি। হাত দুটোর এবং চিবুকের দোল খাওয়া লাবণ্যময় ভঙ্গি চিত্রলেখাকে সুন্দর করে তুলেছে আরো। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, একটু আগের চঞ্চলতা কোথায় চলে গিয়েছে। আলুতো হাসির রেখার মত ঠোঁটের প্রান্ত দুটি স্থির।

—আগের মত চিনি খান তো ?

—মনে নেই। আমি সহজ করে সত্যি কথাটাই বললাম।

চিত্রলেখা কথা বললো না, মাথা নিচু করে আবার হাতের কাজে মন দিল।

—আপনার বন্ধু কত দূরে থাকেন ?

—মিত্তির পাড়া।

—তবে তো কাছেই, একেবারে বিকেলে দেখা করবেন।

—আপনার কি সব প্রশ্ন ছিল, বলছিলেন যেন ?

—প্রশ্ন নয়, অভিযোগ।

—প্রশ্ন থেকে একেবারে অভিযোগ ?

একটা প্লেটে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা আমার দুটি হাতে গছিয়ে দিতে দিতে চিত্রলেখা বললো, কিংবা অভিযোগের প্রশ্ন।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে আমি বললাম, তথাস্তু। আসামী হাজির।

চিত্রলেখা একটু হেসে বললো, এই কবছর কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন তো ? কলেজ থেকে শুরু করে কম খুঁজিনি আজ পর্যন্ত।

—কলকাতায় ছিলাম বছর দুই, সেটাকে অজ্ঞাতবাস ধরতে পারেন। তারপর বনবাস। সটান বম্বেতে। এই দিন পনের হল কলকাতায় ফিরেছি।

—কলকাতায় ছিলেন অথচ কলেজে দেখা পেলুম না একদিনও, পথেও না। কি হয়েছিল আপনার ?

—অনেক কিছু। এবং সেগুলো ব্যক্তিগত। কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলুম বলেই কলেজে দেখেন নি আমাকে, আর শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাও দিই নি।

—আর লেখা ? লেখাও ছেড়ে দিলেন নাকি ?

—লিখে কি হয় ?

—সেটা আমার জানবার কথা নয়। যা-যা হয়, সেগুলিকে আপনি অস্বীকার করতে শিখেছেন বুঝতে পারছি।

চিত্রলেখার মুখ দেখে মনে হল সে একটুখানি আঘাত পেয়েছে। কি বলবো ভাবছি এমন সময় সে-ই আবার কথা বললো, আপনার অনেক কথাই আমি জানতে পেরেছি, আর সেই জন্যেই আপনাকে এতকরে খুঁজে বেড়িয়েছি।

—সেইজন্যে, অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ অনেককিছু জানতে পারলেও অনেককিছু বুঝতে পারি নি।

—আমার সঙ্গে দেখা হলে সেইসব বুঝে নেবেন, এই তো ?

—ঠিক তাও নয়। তবে আপনাকে দেখে অনেকটা বুঝে নেব...... ওকি চা-খাবার সবই যে পড়ে রইল, খান।

চিত্রলেখা নিজের পেয়ালায় চুমুক দিল।

—আমাকে শুধু দেখেই অনেকটা বুঝে নিতে পারলেন ?

আমি কেকের টুকরো ভাঙতে ভাঙতে বিস্ময়ের ভান করি।

একটু বিনীত হাসি হেসে চিত্রলেখা বললো, মেয়েরা পেরে থাকে। তা-ছাড়া আপনাকে খোঁজবার দ্বিতীয় একটা কারণও আছে।

—যথা ?

—আপনাকে একটি জিনিস ফিরিয়ে দেব। অনেকদিন থেকে সেটিকে বয়ে বেড়াচ্ছি......

এবার আমি সত্যিই বিস্মিত হলাম। আমার কোন জিনিস জ্ঞানতঃ চিত্রলেখার কাছে নেই। ফিরিয়ে দেবার মত মূল্যবান জিনিস আমার নিজের কাছেই নেই, অন্যকে দেব কি। চায়ের পেয়ালা তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে নামিয়ে জোর দিয়ে উচ্চারণ করলাম, আমার জিনিস। কি সেটা ?

একটা চটুল আলো চিত্রলেখার দুচোখে খেলা করে গেল; উহুঁ আগে থেকে বলে দেব না। যাবার আগ পর্যন্ত যত খুশী আকাশ-পাতাল ভাবুন, আমি ঠোঁট খুলছি নে।

—সে তো বুঝতেই পারছি—আমি ঠাট্টা করে বললাম, যাক, চায়ের পেয়ালাটাকে অন্ততঃ অতটা বঞ্চিত করবেন না।

হেসে চায়ের পেয়ালাটা কাছে টেনে নিল চিত্রলেখা। তারপর মিনিট দুয়েক আমরা চুপচাপ চা খেলাম বসে বসে।

পাশের ছোট ফালি বাগানটা নজরে পড়ে খাটের ওপর থেকে। মাধবী লতার মাচাটার ওপরে রোদ্দুর আর ছায়ার জ্যামিতি ফুটে উঠেছে। থোকা

থোকা ঝুমকো লতা। পাখি নেই। পাখি থাকলে বেশ হতো। অন্তত: একটি কি দুটি টুনটুনি।

—এবার ওপরে চলুন। বাবার সঙ্গে দেখা করবেন, বৌদির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দোব।

মাধবীলতা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললুম, নিশ্চয়ই। চলুন। আগেই যাওয়া উচিত ছিল।

আহারান্তে বিশ্রাম করছিলাম চিত্রলেখার ঘরে। বাইরে থেকে কপাটবন্ধ করে গেছে বোধহয়, মোট কথা বিকেল পর্যন্ত আমাকে এখানে আটক থাকতে হবে, যাওয়া চলবে না।

দুপুরে আমার শোয়ার অভ্যেস কোন কালেই ছিল না, তায় পরের বিছানা। বাগানের দিকের নির্জন জানালাটার মুখোমুখি বেতের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে ছিলাম। জামার বোতামগুলো খুলে দিয়ে হাত ঘড়িটা পকেটে রেখে বেশ আরাম করেই বসেছিলাম। গরমের দুপুর। মাধবী লতার ঝাড় কাঁপিয়ে ঝুরু ঝুরু হাওয়া আসছে থেকে থেকে। দূরে পথের ওপরে নীরেট রোদ্দুর। একটা চিলের ডাক আসছে অন্যমনস্ক আকাশের বুক থেকে।

একটা ঘুমঘুম ভাব আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। অলস চিন্তায় ভরে উঠেছে মনটা। একটা ছোট ছেলেকে মনে পড়েছে, সে এমনি দুপুরে সাগতার ঝুপসি তেঁতুল গাছের ছায়ায় ছমছমে মন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। তার চেহারাটা মুছে গেছে অস্পষ্ট শ্লেটের রেখার মত, মুখখানাকে মনে করা যায় না। কিন্তু তার অনুভূতিগুলো, বহু বহু বছর আগের কোন একটি বিশেষ মুহূর্তের স্পন্দনটুকু যেন আমার শিরায়, রক্তে, জাগর-অজাগর সমস্ত চৈতন্যের মর্মে মর্মে চমক দিয়ে যায়। কস্তুরী মৃগর মত দূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় কোন একটি গন্ধে আমি যেন আত্মহারা হয়ে যাই। আমি বারবার চেষ্টা করলেও এই অনুভূতি প্রবণ অভিজ্ঞতাকে ফোটাতে পারবো না। পৃথিবীতে আমার মত আর একটি স্পর্শকাতর হৃদয় যদি থাকে, তবে সে বুঝবে আমার এই শিহরণ।

দালানে বিন্তীর আডডাটা একটা রূপকথার রঙ্‌চটা ছবির মত, তাস খেলুনী মেয়েরা আজ কোন ঘুমের রাজ্যের পুতুল হয়ে গেছে সব। শান্তি পিসী, পারুল পিসী, শীতের ভোর, পাছ দুয়োরের উঠোনের জলের ছড়া দেওয়ার শব্দ, ধানের মড়াই, ভিঁটে কুমোরের শোলোক, পরাণপুরের ইস্কুল। আমার বুকের মধ্যে তাদের জন্যে বিন্দু বিন্দু জায়গা আছে এখনো, এক একটা আলপিন বেঁধাবার মতন জায়গা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকালুম। রং বদলে গেছে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর গলে ছায়া হয়ে গেছে কখন। আকাশের এক কোণ থেকে

আর এক কোন পর্যন্ত কে যেন কাজল পরিয়ে দিয়েছে। এই মেঘ দেখলে বুকের ভেতরটা স্তব্ধ আকাশের মতই গুড় গুড় করে ওঠে।

বাতাস পড়ে গেছে একেবারে। গাছের পাতাটি নড়ছে না, মাধবীলতা নিস্পন্দ। পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলাম, তিনটে বাজে।

দেখতে দেখতে বাতাস আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

উঠে জানালাগুলো বন্ধ করা উচিত। কিন্তু ওঠা হচ্ছে না। জলের ছাটে ভিজে যেতে বেশ লাগছে। চোখের সামনে খুব কবিত্বময় কিছু নেই অবশ্য। বেণুবনের শাখায় শাখায় ঝড়ের বাঁশী বাজে নি, জম্বুবন ঝাপসা করেও আসে নি উতরোল বৃষ্টির প্লাবন। ছোট্ট একফালি বাগানে গুটি কতক গন্ধরাজ আর হাস্নুহানার ঝোপ একটা গন্ধলেবুর ডাগর চারাকে সঙ্গে নিয়ে ভিজছে, মাধবীলতা ভিজে শাড়ির মত লেপ্‌টে গেছে মাচার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা পীচের। বৃষ্টির বিন্দুগুলো সাবুর দানার মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সেই মসৃণ কালো পথের ওপরে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার চাবুক বৃষ্টির কুয়াশাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে পথের ওপর দিয়ে। কিছু দেবদারুর ঝরা পাতা ঘুরে ঘুরে নামছে পথের ওপর। আকাশ অস্পষ্ট। দূরে দুটো নারকেলের দোদুল্যমান মাথা দেখা যাচ্ছে, দুরন্ত বাতাসে প্রাণপণে পতন সামলানো চিলের মত।

—ওকি, এই অবেলায় স্নান করছেন কেন?

চিত্রলেখা আমাকে পিছন থেকে নাড়া দিল।

চমকে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি আমিই শুধু ভিজিনি, চিত্রলেখাও ভিজে গেছে। ঘরের অন্য দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে সে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—হাসছেন কেন? নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে বললাম।

—ভাবছি লোকটা জেগে থাকলেই বা কি, যা ঘটবার তা ঘটবেই। জানালা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন ভয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম। এসে দেখি—

চিত্রলেখার কথা আমার ভালো করে কানে পৌঁছল না। আমি শুধু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

ঘরের একটিমাত্র জানালার আলোয় চিত্রলেখাকে দেখে আশ্চর্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল আবার তাকে খুঁজে পেয়েছি, যাকে ভুলে গিয়েছিলাম, যাকে দেখলে একদিন বুকের রক্ত হোঁচট খেত।

সাদা শিফনের শাড়ি, আর একটা রেশমি ব্লাউজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা রূপোলী প্রজাপতি। জলের ছাট লেগে আঁচলটা জায়গায় জায়গায় ভিজে গেছে। একটা দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ লতার মত চিবুকের কাছ পর্যন্ত এসে লেপ্‌টে রয়েছে।

আর একটা দিনের কথা মনে পড়িয়ে দিল, আর একটি বিকেল। এবং সেই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা।

দিনটা রবিবার মনে হচ্ছে। দুপুরে ওর কাঞ্চিলাল মামার ফ্ল্যাটে সাহিত্যচক্রের ছোট ঘরোয়া আসরে সেদিনও আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। চক্রের সভ্য সভ্যা সংখ্যা বেশ। ছিল না। কাঞ্চিলালবাবুর এক বোন অর্থাৎ চিত্রলেখার এক মাসী, এবং তাঁর এক বান্ধবী, পাশের ফ্ল্যাটের প্রৌঢ় রসিকবাবু, সাহিত্যে তাঁর অগাধ অনুরাগ এবং কাঞ্চিলালবাবুর এক কবি বন্ধু। এক সঙ্গেই কাজ করেন। চিত্রলেখার মামাও খান দুই বই লিখেছিলেন। সুতরাং ঘরোয়া হলেও রচনা পাঠ এবং সমালোচনায় দুপুরগুলো বেশ কেটে যেত।

সেদিন বিকেলে ওঁদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আমাদের একবার ইচ্ছে হল ফোর্টের মধ্যেকার সিনেমাহলে ছবি দেখবো। কিন্তু বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে ভেবে আমরা ধীরে ধীরে পলাশী গেট দিয়ে গঙ্গার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। আউটরাম ঘাটের ওপাশটায় কোন ভিড় নেই। কিন্তু তবু বেড়ানো হলো না, বসাও না। আকাশের দিকে লক্ষ্য করি নি, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মশগুল ছিলাম। হঠাৎ মুসল ধারায় বৃষ্টি নেমে পড়তেই খেয়াল হলো। কিন্তু তখন আর আত্মরক্ষার উপায় নেই।

চারপাশ খোলা। মাথা বাঁচাবার কোন উপায় নেই। আমরা ছুটতে ছুটতে একটা গাছ তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ততক্ষণে জামা কাপড় প্রায় সপ্ সপ্ করছে, জুতোর ভেতর এক নৌকো জল ঢুকেছে।

পকেট থেকে রুমালটা বের করে দিয়ে বললুম মাথাটা মুছে ফেলুন।

গাছতলায় দাঁড়ালেও গায়ে জল পড়ছিল ঠিকই, তবে অল্প।

চিত্রলেখা আমার হাত থেকে রুমালটা নিতে নিতে একটু হাসলো। লজ্জিত, সঙ্কুচিত হাসি। এর আগে কখনো তাকে এমন অপ্রতিভ, আড়ষ্ট দেখি নি। প্রথমে কারণটা বুঝি নি, পরে বুঝলাম। বৃষ্টি বড় বেশী স্পষ্ট করে দেয়।

আমি কোন কথা বলতে না পেরে লজ্জা পাচ্ছিলাম। এই সময় নিস্তব্ধতা বড়ো অসহ্য লাগে। অথচ কোন কথাই নেই। যা বলতে যাবো মনে হবে জোর করে বলছি। সেইটিই হবে আরো লজ্জার।

দূরে গঙ্গার বুক ঝাপসা করে বৃষ্টি নেমেছে। প্রান্তর জুড়ে বৃষ্টির একটানা সর সর শব্দ। তারই রোমাঞ্চ জাগছে আমাদের মাথার ওপরে বটের পাতায়। চোখাচোখি হতে চিত্রলেখা আবার হাসলো একটুখানি।

আমিও হাসলাম, এ বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। বড় বেকায়দায় ফেলে দিল দেখছি।

—একটু একটু শীত করছে আমার। কখন যে বাড়ি যাবো। চিত্রলেখা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো।

—ট্র্যাম-বাস কোনটাই কাছাকাছি নেই, এই জল ভেঙে আবার অতটা যেতে হবে।

রুমালটা আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে চিত্রলেখা আপশোষ জানালো, ইস্ একেবারে যাচ্ছেতাই ভিজে গেলাম, ছি, ছি। এই চেহারা নিয়ে আমি ট্র্যামে বাসে উঠতে পারবো না—

আমি চুপ করে বটের পাতায় জল পড়া লক্ষ্য করতে লাগলাম একমনে।

অবিচ্ছেদ জল পড়ছে, বিরামহীন বৃষ্টি। কাছে দূরে মানুষের চিহ্ন নেই। শুধু দূরে আর একটা গাছের নিচে এক হিন্দুস্থানীর ছোলা ছাতুর দোকান ত্রিপল মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে। আমরা মিনিটের পর মিনিট গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম পাশাপাশি। দুজনে দুজনের দেহের উত্তাপ অনুভব করলাম মনে মনে। একটিও কথা না বলে হয়ত একই কথা ভেবেছিলাম সেদিন।

—জানালাটা বন্ধ করে দিন, আমি আলো জ্বালছি। আমাকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে চিত্রলেখা তাড়াতাড়ি কথা বললো।

জানালা বন্ধ করে দিলাম। চিত্রলেখা আলো জ্বাললো। একটা শুকনো তোয়ালে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম।

—আজকের বৃষ্টিটা দেখে আমার ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আবছা গলায় চিত্রলেখা এক সময় বললো।

—আমারও যে হচ্ছিল তার প্রমাণ নিশ্চয়ই দিতে পেরেছি? কি ভাবছেন?

তাড়াতাড়ি একটা নিশ্বাস ফেলেও বললো, চা খাবেন?

—না কফি?

দুজনেই চমকে গেলাম। পর্দা সরিয়ে চিত্রলেখার বৌদি ঘরে ঢুকলেন। হাতে ট্রে।

—কি, কফিতে আপনার আপত্তি নেই তো?—বৌদি হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে।

—এমন একটা আবহাওয়ায়—আমি মৃদু হেসে জানালাম, আমার বরং লোভই হচ্ছে।

তিন পেয়ালা কফি নিয়ে আমরা মুখোমুখি বসলাম। ওরা দুজন খাটের ওপরে, আমি চেয়ারে।

—আর কতদিন আছেন কলকাতায়? বৌদি জিজ্ঞেস করলেন।

—মাস খানেক অন্তত।

—একেবারে কলকাতাতেই চলে আসুন না, খুব কি অসম্ভব হবে?

—চাকরি; বুঝতেই পারছেন।

মিনিটখানেক নিঃশব্দে কাটলো।

—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালুম।

—আবার লেখা সুরু করে দিন।

চিত্রলেখা উঠে গেল জানালা খুলে বৃষ্টির অবস্থা দেখতে। শেষ পর্যন্ত খুলেই দিল বাগানের দিকের জানালাটা। বৃষ্টি ধরে এসেছে। দমকা বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে এলো ঘরের মধ্যে।

আমি একটু হাসলাম স্পষ্ট উত্তর এড়াবার জন্যে।

—আবার কবে আমাদের বাড়ি আসছেন বলুন?

—আজই কি করে বলি, বলছেন যখন, চেষ্টা করবো যাবার আগে একবার।

—চেষ্টা নয়, একেবারে এসে পড়বেন। বলা রইল কিন্তু।

—আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।—চিত্রলেখা এতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কথা কইল।

পকেট থেকে হাতঘড়ি বের করে হাতে পড়লাম। সাড়ে চারটে বাজে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, এবার উঠি। চিত্রলেখা, আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই—আমি বললাম।

বৌদি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমাদের দিকে।

চিত্রলেখা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

শেল্‌ফের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, জীবনটা মাঝে মাঝে নাটকীয় হয়ে উঠে, না?

—হ্যাঁ, তবে তার দৌড় বড়ো জোর একাঙ্কিকা পর্যন্ত। তার বেশী নয়—আমি উত্তর দিলাম।

একমুহূর্তের জন্যে চিত্রলেখা আমার দিকে থমকে তাকিয়ে থেকে শেল্‌ফে হাত বাড়ালো।

—সারা দিন অনেক কষ্ট পেয়ে গেলেন...অন্তত: সেইজন্যেও অনেক দিন মনে থাকবে, বৌদি আবার কথা বললেন।

—সারাটা দিন কিভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলুম না, তবে মনে থাকবে নিশ্চয়ই। কিছুই সহজে আমি ভুলতে চাই নে, দোষ বলুন আর গুণ বলুন এটা আমার স্বভাব। আচ্ছা বৌদি—

চিত্রলেখা এগিয়ে গিয়েছিল, আমি দরজার কাছ বরাবর এসে নমস্কার জানিয়ে, তাকে অনুসরণ করলাম। বৌদিও হাসি মুখে মাথা নোয়ালেন।

পথে নেমে চিত্রলেখা কিছুটা এলো সঙ্গে সঙ্গে। খালি পায়ে উদাসভাবে সে হাঁটছিল, হঠাৎ থেমে পড়ে বললো আচ্ছা, আর এগুবো না।

—আজকের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, বৌদিকে জানাবেন।

—বৌদিকে জানাবো। চিত্রলেখা আরো কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—আপনার কলেজ খুলবে কবে?

আমি তাকে আর একটু সময় দিলাম; একেবারে বিদায় নিতে কেমন লাগছিল।

—জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই নিন।

একটা খাতা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

আমি সাগ্রহে তার হাত থেকে সেটা নিতে নিতে বললুম, কি এটা?

—সম্ভবতঃ আপনার আত্মজীবনের খসড়া—অদ্ভুত আস্তে গলায় কথা বললো, কোনদিন সম্ভব হলে এটা অন্ততঃ শেষ করবেন।

চিত্রলেখা দাঁড়ালো না। দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে ফিরে চললো। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এ খাতা চিত্রলেখার হাতে এলো কোত্থেকে, আমার এই পুরনো দিনের ডায়েরি! চেঁচিয়ে আর সে কথা জিজ্ঞেস করা গেল না।

লোকটা জেগে থাকলেই বা কি, যা ঘটবার তা তো ঘটবেই!